দয়ালবন্ধুর ইউরোপ ভ্রমণ-২০২৫
Vatican City
Pisa
Munich
Top of Europe
Hegue
madurodam
Thems of London
Engleberg
Venice
On INN River
Rhine Falls, Germany
Doha Airport
Village
Village of France
Rome
Insbruk, Austria
ARNO River - Fluorence

কিছু কথা বলতে চাই

জীবনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ করে স্বাভাবিক ভাবেই বেশ নতুন একটা অভিজ্ঞতা হল। এই এগারো-বারো দিনের ইউরোপ ভ্রমণ -এর জন্য প্রায় দুই বছর আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। ঠিক মত সিদ্ধান্ত নিয়ে, সরাসরি ট্যুর কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ শুরু করতে হয়েছে, প্রায় পাঁচ মাস আগে। এর পর নানান কাগজপত্র সংগ্রহ করা, ভিসা আপিসে, ট্যুর কোম্পানীর আপিসে কয়েকবার যাওয়া, ইত্যাদি তো আছেই। টাকা পয়সা একটা বড় ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত আমার মত ভেতো বাঙালী, একটা সাধারণ সরকারী চাকরী করা লোকও যে এইরকম একটা বড় বিদেশ ভ্রমণ করে ফেলল, সেটাই কিন্তু একটা "বাংলা সিনেমার মত" ব্যাপার।

ভ্রমণের খুঁটিনাটি তো আছেই। তার সাথে আমার নিজের অনুভূতি, সবই লেখার চেষ্টা করেছি। ছবি আর ভিডিও তুলে এনেছি হাজার খানেক। এখন তো একটা মোবাইল ফোন থাকলেই ছবি তোলা যায়। কিন্তু বই ছাপানোর জন্য যদি রঙ্গিন ছবি দিতে হয়, ছাপানোর খরচ এত বেশী হবে যে, সে বই আর কেউ কিনবে না।

ইন্টারনেটের এই যুগে, বাড়ী বসেই সব রকম তথ্য পেয়ে যাবেন, নিখুঁত ভাবে। তাই তথ্যের জন্য এই বই লেখার ইচ্ছা ছিল না। আমার অনুভূতি যা লেখার অক্ষরে বেরিয়েছে, সেটা সবার মনের মত হবে, এমন তো কোন নিয়ম নেই। যেটুকু তথ্য লিখেছি তাও ধারাবাহিক লেখার সময় , আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকা যা যা জানতে চেয়েছেন, তাই লেখার চেষ্টা করেছি।

প্রতিটা পর্বের শেষে, ভ্রমণের বাইরে দুই -চার লাইন লিখেছি। ঐ যে বললাম, আমার অনুভূতি লিখে রাখতে চেয়েছি। কয়েকটা ঝকঝকে দেশ ঘুরে এসে তার সোনালী বর্ণনা লেখার জন্য এগুলি লিখিনি। ফিরে আসার দুই মাস পরও কয়েকটি পর্ব লিখতে হয়েছে। সেই সময় মনের যা অবস্থা ছিল, তার প্রতিফলন লেখাতেও এসেছে।

পৃষ্ঠা নম্বর দেখার সময় দেখলাম, কয়েকটি ছবি দু'বার দেওয়া হয়েছে। পি ডি এফ হয়ে যাওয়ায় ওগুলি আর সরানো হল না।

আপনারা অনেকেই এই লেখাগুলি আগে পড়েছেন। কিছু ছবি যোগ করার জন্য তো বটেই, লেখাগুলোকে এক জায়গায় গুছিয়ে রাখার জন্যও এই ই-বুক। আপনাদের পরিচিতদের এই লেখাগুলি পড়তে দেবেন, এটা একটা অতিরিক্ত বাসনা। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। ১৪ই আগষ্ট, ২০২৫। দয়াল বন্ধু মজুমদার
dayalbm@gmail.com

কোন পাতায় কি আছে

প্রস্তুতি পর্ব -১ নং পৃষ্ঠা
বিমান যাত্রা - ৩ নং
লন্ডনে নেমে - ৪ নং
কি কি দেশ- ৮
প্রথম দোহা বিভ্রাট -১০
সিম কার্ড ও মুদ্রা বিনিময় -১১
ম্যানেজার পবন -১৩
প্রথম বাস বিভ্রাট -১৬
ইউরোপের বাস -১৮
প্রথম লণ্ডন দেখা -২১
টেমস ও লণ্ডন ব্রীজ -২৩
লণ্ডন আই , মাদাম তুসো -২৫
প্রথম হোটেল -২৬
পানীয় জল -২৭
চা কফি -২৯
প্রাতরাশ -৩২
ফলের রস-৩৪
ডিম, মাংস -৩৭
লণ্ডন শহর -৪০
বিগ বেন -৪৬
লণ্ডন আই এর ভেতর -৪৮
মাদাম তুসোর ভেতরে -৫০
জাহাজ বন্দরে -৫৩
স্টেনালাইন জাহাজে -৫৬
নর্থ সী -৫৮
হল্যান্ডের অভিবাসনে -৬০
হেগ শহরের ট্রাম - ৬৩
মাদুরাদম - ৬৫
ব্রাসেলস - ৬৮
পাসপোর্টের ব্যাগ -৭১
ব্রাসেলস শহরে - ৭৪
চকলেট কেনা - ৭৬
এটোমিয়াম -৭৮
প্যারিসের হোটেলে - ৮০
প্যারিস শহরে -৮৫
ল্যুভ মিউজিয়াম - ৮৭
মোনালিসা - ৯০
প্যারিস দর্শন -৯২
রাতের আইফেল - ৯৪
আইফেলের উপর - ৯৬
ফ্রান্সের হাই ওয়ে - ৯৯
এঙ্গেলব্যার্গ - ১০৩
সুইজারল্যান্ড এর রূপ - ১০৭
টপ অফ ইউরোপ -১০৮
ইন্টার্লেকেন - ১১৪
টিটলিস পাহাড়ে -১১৭
চ্যাপেল ব্রীজ - ১২১
লুসার্ন - ১২৩
রাইন ফলস -১২৫
জুরিখে - ১২৮
জার্মান পরিবার - ১৩০
মিউনিখ শহরে - ১৩১
নিমফেনবার্গ প্যালেস - ১৩৬
ইনসব্রুক -১৩৮
বেহালা বাদক - ১৩৯
স্বরভস্কি ক্রিস্টাল - ১৪৪
আঙুরের প্রান্তর - ১৫২
ভেনিসে -১৫৩
গন্ডোলা রাইড -১৫৬
কালো কোট এর অসভ্যতা -১৫৮
পাদুয়া -১৫৯
পিসার হেলানো টাওয়ার -১৬০
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি - ১৬৩
ফ্লোরেন্স শহরে -১৬৬
পন্টি ভ্যাচ্চিও -১৬৯
ভ্যাটিকান -১৭২
কলোসিয়াম -১৭৮
ট্রেভি ফাউন্টেন -১৮১
স্প্যানিশ স্টেপস -১৮২
শেষ হোটেল -১৮৪
ফেরার বিমান -১৮৫

বিদেশে প্রথম

জীবনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণ এর জন্য রওনা দিয়ে, কোলকাতা বিমান বন্দরে রাত পৌনে এগারোটায় পৌঁছে গেলাম। আমাদের ট্যুর কোম্পানী অবশ্য বলে দিয়েছিল, সাড়ে এগারোটায় পৌঁছতে। সন্ধ্যা থেকে কেন জানিনা, শীর্ষেন্দু বাবুর লেখা, " বাঙ্গালের আমেরিকা যাত্রা" কথাটা মনে হচ্ছে। উনি অবশ্য আমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছিলেন। আর আমার মত ছাপোষা, ঘেউ ঘেউ করা সরকারী কর্মচারী, ছেষট্টি বছর বয়সে প্রথম বিদেশ যাত্রা করছি। নিন্দুকেরা অনেক কিছু ভাবতে পারে; লোকের ভাবনার উপর তো আমার হাত নেই। আমি আমার সন্তান সম ডাক্তারদের পড়ানোর সময় বারবারই বলেছি, শুধু ভদ্রভাবে চাকরী করে, জেলায় জেলায় সাপ পড়িয়ে ঘুরে বেড়িয়েও, গাড়ী বাড়ী সবকিছু করা যায়। আজ একথাও বলতে পারি, সৎ ভাবে রোজগার করেও বিদেশ ভ্রমণ করা যায়।

সব ভ্রমণের মতোই এই বিদেশ ভ্রমণ এর জন্য কয়েকমাস আগে থেকেই সলতে পাকানো শুরু হয়েছে। আসলে কয়েক মাস নয়, দু'বছর মত আগে আমার এক স্কুলের বন্ধু এই এগারো দিনের ইউরোপ ভ্রমণ করে কিছু ছবি আমাদের স্কুলের বন্ধুদের গ্রুপে দিয়েছিল। তাই দেখে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, এই ভ্রমণের খরচ কত? বাজেট শুনে মনে হল, আমিও যেতে পারব। কিন্তু দুই বছর পর কেন? টাকা জমাতে শুরু করলাম? না, টাকা তো লাগবেই, কিন্তু তার থেকে বড় বাধা ছিল, পায়ের বেড়ি! রাজ্য সরকারী কর্মচারি বিদেশ ভ্রমণ করবে! সেই দুঃস্বপ্ন না দেখাই ভালো। সোজা কথা, আমি আমার রোজগারের টাকায় বিদেশ ভ্রমণ করব, সেটা কিছু ঈর্ষা কাতর লোকের সহ্য হবে না। সোজা পথে অনুমতি হবে না। চোরা গোপ্তা কেউ কেউ যায় শুনতাম, আমার সেই সাহস ছিল না। তাই দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হল। তাও অবশ্য তের মাস পার করে আজকের দিনটা এল। আমার মনোবাঞ্ছা জেনে, বন্ধুবর যোগেশও বলল, ওরও যাওয়ার ইচ্ছা আছে। ওর মুক্তি পেতে আরও নয় মাস দেরী হল। তারপর শালা -ভগ্নীপতি দুই বন্ধু, গত ডিসেম্বরে কিছু টাকা জমা দিয়ে, এই মে মাসের ভ্রমণের জন্য নাম লেখালাম। এর পর ধাপে ধাপে শুধু টাকা জমা দিয়েই কাজ মেটে না। দুই রকমের ভিসা করার জন্য দুই বার সপরিবারে, ডজন তিনেক কাগজ পত্র জমা দিয়ে , কোম্পানির লোকেদের উপর মোটামুটি নির্ভর করে, শেষ পর্যন্ত হল। আমরা কোলকাতার গো এভরি হোয়ার (Go Every where) কোম্পানির সাথে

চললাম। আমার সেই বন্ধু দুই বছর আগে এদের সাথেই ঘুরে এসেছে। ওর কথা শুনেই এদের ওপর ভরসা হল। আরও অনেক কোম্পানী আছে। এই আজ রাত্রেই, একই ফ্লাইটে আরও একটি দল কোলকাতা থেকে চলেছে।

আমাদের দলটি তিরিশ জনের। সাথে পবনদীপ কাউর নামে এক মহিলা, ট্যুর ম্যানেজার হিসেবে আমাদের নিয়ে চলেছেন। আমাদের সাথে আমাদের কন্যাও চলেছে। সে মেট্রো রেলের ইঞ্জিনিয়ার। ওদের আপিস থেকে ছুটি আর অনুমতি পেতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। আমরা তিনজন, বোন ভগ্নীপতি, এরা ছাড়াও আমাদের এক প্রফেসর মামা আর মামীও চলেছেন। ভিসা আপিসে দু'দিন, আর ট্যুর কোম্পানির আপিসে দু'দিন যেতে হয়েছে। দিন পনের আগে সব ভিসা ইত্যাদি হয়ে গেলে, একদিন সকলকে ডেকে, একটা ছোট হোটেলে একটা চায়ের আসর করে, সবার পাসপোর্ট, ভিসা, প্লেনের টিকিট, ট্র্যাভেল ইন্সুরেন্স এর কাগজ ইত্যাদী দিয়ে দিয়েছে। ঐ দিনই আমাদের সাথে আমাদের ট্যুর ম্যানেজার ভদ্রমহিলার আলাপ হল। ওনারা খুঁটি নাটি সব বুঝিয়ে দিলেন। এছাড়া ঐ দিন বিদেশী মুদ্রা বিনিময় কোম্পানির লোকও উপস্থিত হয়ে, আমাদের যার যেমন দরকার, পাউন্ড আর ইউরো দিয়ে দিলেন। এটাকে ট্যুর এর বাঁধা প্যাকেজ এর বাইরে, নিজের নিজের পকেট মানি বলতে পারেন। এটা যার যেমন ইচ্ছা নিয়েছি। ঐ দিনই আমরা একটা করে ইউরোপ এর সীম কার্ডও কিনেছি। এটা কেমন কাজ করে, ওখানে না পৌঁছে বুঝতে পারব না।

লন্ডন আর সুইজারল্যান্ডে ঠাণ্ডা থাকবে, তাই শীতের পোশাকের জন্য বড় ট্রলি ব্যাগ নিতে হল। এছাড়া এগারো দিনের জন্য জামা কাপড়, কিছু শুকনো খাওয়ার, জরুরী ওষুধপত্র এসবও নিতে হয়েছে। সাড়ে এগারোটায় চেক ইন শুরু হবে। এই সময়টায়, এই ভ্রমণ নিয়ে লেখাটা শুরু করলাম। (লন্ডনের গ্যাট উইক এয়ারপোর্ট এ নামতে আধ ঘন্টা মত বাকি। এই পর্ব এখানেই শেষ করছি। এখানে এখন সময় দুপুর একটা হয়নি। আমার ঘড়িতে ভারতীয় সময় পাঁচটা বেজে গেছে।) ১৯.৫.২০২৫.

বিদেশে ভ্রমণ-২

ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায় কাতার এয়ার ওয়েস এর চেক্ ইন শুরু হল। আমরা দলের সাথে যাচ্ছি তাই ওয়েব চেক্ ইন হল না, এখানে এসেই করতে হল। সবারই বেশ বড় বড় ব্যাগ। ওজন করে, পাসপোর্ট দেখে দেখে বোর্ডিং পাস দিতে বেশ সময় লাগল। তারপর তো আসল বিদেশ। এই প্রথমবার ইমিগ্রেশন এর লাইনে দাঁড়িয়ে কত কত সাহিত্যিকের লেখার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সেই নবনীতা দেব সেন মহাশয়ার " হাওয়া ই হিন্দ!" বাপরে, শ্যুটকেশ অন্য দেশে চলে গিয়ে সে এক কাণ্ড। আমাদের পাসপোর্ট দেখে, মুখের ছবি তুলে পাসপোর্টে ছাপ দিতে সবমিলে মিনিট দশেক লাগল। পাসপোর্টে ছাপ পড়ল মানে আসল বিদেশ যাত্রা এবার অগ্নিশুদ্ধ করে দিল। তারপর সিকিউরিটি চেক করে, বোর্ডিং গেটের কাছে গিয়ে বসলাম প্রায় দেড়টা নাগাদ। আমাদের ফ্লাইট তিনটে পঞ্চাশে , বোর্ডিং শুরু হল তিনটে পনের নাগাদ।

কাতার এয়ারওয়েজ এর প্লেনে আমাদের ইকোনমি ক্লাশ এর টিকিট। এরা প্লেনেই খাওয়ার দেয়। কোলকাতা থেকে দোহা পাঁচ ঘন্টার উপর প্লেনে। আমাদের ভোর রাত্রে উঠেছি। ঘুমিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও টানা ঘুমাতে পারলাম না। ওরা ভোর পাঁচটায় প্রাতরাশ দিয়ে দিল। আমরা ক্রমশ পশ্চিম দিকে উড়ে চলেছি, তাই দোহায় নামলাম আমাদের সময় সাড়ে আটটা নাগাদ। কিন্তু ওদের ওখানে ছটা দশ।

এই শুরু হল সময়ের হেরফের। লন্ডনে আমাদের কলকাতার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা পরে সময়। আমরা লন্ডনের গ্যাট উইক বিমান বন্দরে নামলাম ওখানকার দুপুর একটা নাগাদ। এখানে আমরা মার্কা মারা বিদেশি, বেশ লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ইমিগ্রেশন হল। মোদ্দা কথা ওদের দেশে ঢোকার জন্য পাসপোর্ট ভিসা ভালো মত পরীক্ষা করে, আমাদের আঙুলের ছাপ নিয়ে ভেতরে ঢুকতে দিল। এই সময় প্রথম দেখলাম, আমাদের ট্যুর ম্যানেজার পবনদীপ কাউর মেয়েটি বেশ চটপট আগে গিয়ে, আমার দলে মোট একত্রিশ জন, আমাদের একসাথে ইমিগ্রেশন হলে ভালো হয়, এরকম কিছু বলে, আমাদের বেশ তাড়াতাড়ি ইমিগ্রেশন করিয়ে নিল। ইমিগ্রেশন এর পর আর একটা জরুরী কাজের জন্য সবাই ব্যস্ত হলাম। গোটা ভ্রমণেই

এটি একটি বেশ বড় ব্যাপার। এটা আমাদের দেশের মধ্যে নয় যে, গাড়ি থামিয়ে রাস্তার পাশে কাজ সেরে নিলাম। এই বিমান বন্দর এর মত জায়গায় বিনা পয়সার শৌচালয় পাওয়া যায়। কয়েকটি জায়গায় এক ইউরো (২০২৫ সালের মে মাসের শেষে এই এক ইউরো প্রায় ৯৮ টাকা) দিয়ে প্রস্রাব করতে হয়েছে।

ট্যুর শুরু করতে গিয়েই একটা বিপত্তি হল। দারুন একটা ভলভো বাসে আমাদের সব বড় ট্রলি ব্যাগ ইত্যাদি তুলে দিয়ে আমরা বসে আছি; বাস আর ছাড়ে না। মিনিট পনের পর জানা গেল, বাসে একটা যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় ছাড়তে পারছে না। নিচে নেমে দেখি কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে।

রোদ ঝলমলে লণ্ডন, দুপুর দেড়টা মাত্র। শেষ পর্যন্ত অন্য একটা বাস এল। ড্রাইভারই সব জায়গায় বড় ব্যাগ তোলে নামায়। আমাদের এগারো দিনের ভ্রমণে, প্রায় মিনিট ধরে ধরে ছোটা। শুরুতেই চার ঘন্টা নষ্ট হল। লন্ডনে প্রথম দিন বিকেলে, টেমস নদীতে ক্রুজে ভ্রমণ দিয়ে ঠিক ঠাক ভ্রমণ শুরু হল। এই একটি

মাত্র রাত আমরা লন্ডনে থেকেছি। পরদিন রাত্রে Stenaline (স্টেনা লাইন) নামের একটা জাহাজে নর্থ সী সমুদ্রে ভেসেছি। এরপর হল্যান্ড, বেলজিয়াম, হয়ে প্যারিস-এ দুই রাত। তারপর সুইজারল্যান্ডের দুটি শহরে তিন রাত থেকে, গত রাত্রে পৌঁছেছিলাম অস্ট্রিয়ার ইন্সব্রুক শহরে। আজ সকালে চললাম ভেনিস এর উদ্দেশ্যে। মাঝের কদিনের কথা লিখতে অনেক সময় লাগবে। আজ এখানে শেষ করছি। আজ ২৭ মে, ২০২৫.

ইউরোপ ভ্রমন - পর্ব-৩

লন্ডনে দেড় দিনের জন্য বেড়াতে আসার জন্য আমাদের অনেক বেশী খরচ করতে হয়েছে। শুধু খরচই নয়, এখানকার ভিসা পাওয়াটাও বেশ ঝঞ্ঝাট এর ব্যাপার। আমার মেয়ের বান্ধবী একটি মেয়ে একই ট্যুর কোম্পানির সাথে ইউরোপে এসেছে; ওর UK ভিসা হবেনা, তাই ওদের ভ্রমণ শুরু করলো প্যারিস থেকে। ভিসা আপিসে বসে মেয়েটি যখন এই কথা বলেছিল তখন ব্যাপারটি ঠিক বলছে কিনা বুঝতে পারি নি। কিন্তু দুই- তিন দিন পর দেখলাম, বিখ্যাত ভ্রমণ চ্যানেল এর শিবাজীবাবু একাই লন্ডনে চলেছেন, বন্ধু পৃথ্বীকে ছাড়াই; কারণ ঐ লন্ডনের ভিসা সমস্যা। লন্ডনে আমার বন্ধুর কন্যা মেঘা থাকে। সে কিন্তু, "ভিসা কোন সমস্যা নয়", এরকমই বলেছে কয়েকবার।

আমার এই প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণ নিয়ে লেখা শুরু করেছি, ১৮ ই মে কোলকাতা বিমান বন্দরে বসে। লন্ডনে নেমে থেকে দৌড় আর দৌড়। দ্বিতীয় পর্ব লিখতে পেরেছিলাম বোধহয় দিন চার পাঁচ ভ্রমণের পর। আজ ৩০ তারিখ ভোরে উঠে রোম এর বিমান বন্দরে ফেরার প্লেন ধরতে ছুটেছি। আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রা করতে হলে বেশ কিছু সময় নানান কাজে কেটে যায়, প্রথম পর্বে লিখে রেখেছি। আজও সেসব তো ছিলই, সাথে আর একটা নতুন কাজ যোগ হয়েছিল অনেকের জন্য। বিদেশ থেকে দামি দামি জিনিস কিনে ফিরতে হলে, তার কিছু কাগজ পত্র, টাকা পয়সা ইত্যাদির কাজ থাকে। আমাদের দলের তিরিশ জনের মধ্যে পাঁচ- ছয় জন ঐ সব কাজও

রোম বিমান বন্দরে সেরে নিয়েছে। সবাইকে একসাথে নিয়ে একই বিমানে ওঠার ঝক্কি আছে। তারপর তো হারাধনের দশটির জায়গায় তিরিশটি ছেলে (ধেড়ে খোকা, এবং খুকু) নিয়ে গোটা দশেক দেশ ঘুরে, আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে আনা। আমরা শুধু নিজের নিজের পরিবারের দুই বা তিন জনের ঝক্কি সামলাতে হরবর (মেদিনীপুরের গ্রামের কথায় নাজেহাল) হয়ে যাচ্ছিলাম। ট্যুর ম্যানেজার পবনদীপ কাউর মেয়েটি প্রায় ৯৯% নিখুঁত ভাবে সেই সব হুজ্জতি সামলে নিয়ে চলেছে। রোমের বিমান বন্দরে বসে একটু সময় পেয়েছিলাম, তাই তৃতীয় পর্ব লিখতে শুরু করলাম।

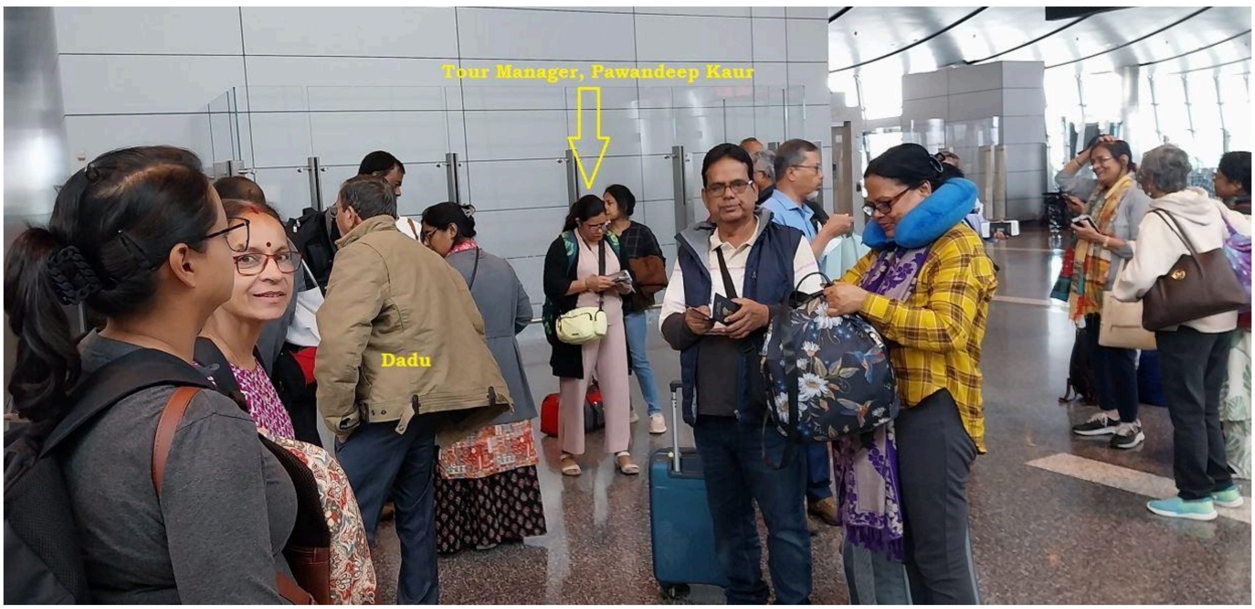

লেখা শুরু করেছি একেবারেই নতুন একটা অভিজ্ঞতার কথা লিখব বলে। মাঝে বারো দিনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি , তাই লিখতে পনের দিন তো বটেই, একমাসও লাগতে পারে। এবার তো আর শুধু একটা ভ্রমণ কাহিনী নয়; এই ছেষট্টি বছর বয়সে এসে, মাএ বারো দিনে কত বিচিত্র দিকের অভিজ্ঞতা হল, এখন ভাবলে অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভ্রমণে বেরিয়ে কি কি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি তার একটা আভাস দিতেই বোধহয় আজকের পর্ব শেষ হবে। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের থেকে পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশ দেখতে যাওয়ার বিশাল অভিঘাত সহ্য করতে করতেই গোটা দুই- তিন দেশ দেখে নিলাম। এক একটি দেশের এক দুই ,তিন, এমনকি চার পাঁচ রকমের ভ্রমণ আকর্ষণ আছে। লন্ডনের ‘লন্ডন আই’ কি বস্তু, আমি আগে কোথাও পড়িনি বা ইউটিউবে দেখিনি। আবার আইফেল টাওয়ার বা পিসার হেলানো

টাওয়ার এর কথা অসংখ্যবার শুনেছি। প্যারিসের ল্যুভ মিউজিয়াম এর সবকটা ঘরের মধ্যে দিয়ে একবার হেঁটে ঘুরে আসতেই ঘন্টা পাঁচ-সাত লাগবে। সেখানের মোনালিসা ছবির কথা নিয়েই শ্রদ্ধেয় সহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল মশাই একটি উপন্যাস লিখে গিয়েছেন। ফ্রান্সের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সুইজারল্যান্ডের দিকে যাওয়ার সময় কেউ কেউ বলেছিলেন, সুইজারল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আরও বেশী। সেই দেশেই নিজে যাচ্ছি, ভাবতে ভাবতে কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না। সে দেশের দুটি বিখ্যাত পাহাড় এর উপর উঠে , আক্ষরিক অর্থে চোখ ধাঁধানো সাদা বরফে হেঁটে ঘুরে এলাম। কদিন পরেই সে অভিজ্ঞতা স্বপ্নে দেখা, কিংবা অন্য কোন জন্মের স্মৃতি মনে হবে।

মাইনাস এগারো তাপমাত্রায়

জার্মানির মিউনিখ শহরটা মাএ কয়েক ঘন্টার জন্য ছুঁয়ে এলাম। সেখানকার গাড়ী দেখানোর বিপুল আয়োজন; আবার মিউনিখ নামটা উচ্চারণের সাথে সাথে মনে এল, " ট্র্যাজেডি ইন মিউনিখ!" আমাদের দলের দাসবাবু মনে করতে পারলেন, ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক -এ সন্ত্রাসবাদী হানায় ১৪ জন প্রতিযোগীর হত্যার ঘটনা। ৭২ সাল মানে আমি ক্লাশ ফাইবে পড়ি। খবরের কাগজে ঐ শিরোনাম দেখে ট্র্যাজেডি কথাটার মানে শিখেছিলাম। সেই অলিম্পিক স্টেডিয়াম বাইরে থেকে দেখলাম।

মিউনিখে দারুন পিজা খেলাম; ইতালিতে বাজে, অখাদ্য। রোমে খেলাম, জিলাটিনো আইস ক্রিম। বেলজিয়ামের ওয়াফেল খেতে ভুলে গেছলাম, সুইজার ল্যান্ডের হোটেলে পেয়ে গেলাম; সেরকম ভালো কিছু না। লন্ডনে আমার কন্যা হঠাৎ পেয়ে গেল, চকোলেট কোটেড স্ট্রবেরি। ভালো, কিন্তু দাম শুনলে পিলে চমকে যাবে। সুইজারল্যান্ডে অনেক চকলেট কিনে নিল, আমার কন্যা আর বোন। গোটা ট্যুর ধরেই সকলে চকলেট কিনে চলল। সুইজারল্যান্ডে অনেকেই ঘড়ি কিনেছে। আইফেল টাওয়ারের কাছে বিক্রী হচ্ছিল, স্ট্রীট ফুড,"ক্রেপ"; আমরা খেলাম, আর্ক ডে ট্রাম্প এর কাছে। এরকম , বিদেশের খাবার দাবার নিয়েই একটি পুরো পর্ব লিখতে হবে হয়তো।

উন্নত দেশের মানুষ আমাদের মত বিশৃঙ্খল লোকের সাথে কেমন ব্যবহার করল। ভেনিসে আর পিসায় বাংলাদেশী হকারদের রমরমা। ভ্যাটিকান সিটির দুটি ভিখারিনী। নর্থ সীতে জাহাজে চড়ে ইংল্যান্ড থেকে নেদারল্যান্ডে যাওয়া। এরকম হাজারো অভিজ্ঞতা এই মাত্র বারো দিনে। খুঁটিনাটি লিখতে হবে! একটা পাঁচ সাতশ পাতার বই হয়ে যাবে। আমার পরিচিত, সহৃদয় পাঠকেরা অনেকেই এখন, দুটি পর্ব পড়ে, পরের পর্বগুলোর অপেক্ষায় আছেন, জানিয়েছেন। সবার কথা মাথায় রেখেই লিখছি। আমাদের এই ১২ দিনের ভ্রমণ দলের কেউ কেউ আগের পর্ব দুটি পড়েছেন। তাঁরা হয়তো আমার লেখার সময় ভুলে যাওয়া ঘটনাগুলি মনে করিয়ে দেবেন। আবার যারা আমার লেখা পড়ে ভবিষ্যতে এইরকম একটা বিদেশ ভ্রমণ করার উৎসাহ পাবেন তাঁদের কথাও মাথায় রেখে লেখার চেষ্টা করছি।

দোহা থেকে কাতার এয়ারওয়েজ এর প্লেনে কোলকাতা যাওয়ার সময় এই পর্বটা শেষ করার চেষ্টা করছি। কলকাতায় নেমে আমার নিজের মোবাইলের নেটওয়ার্ক পেয়ে এই পর্ব আপনাদের পাঠিয়ে দেব।

দোহা বিমান বন্দর বিশাল। ঝকঝকে সব দোকানপাট এর মধ্যে দিয়ে এক জায়গায় নেমে আর আর এক জায়গায় পরের বিমান ধরার জন্য অনেক হাটা হাটি করতে হয়। মাঝে আবার প্রায় হাফ কিমি মেট্রো চড়ে গেলাম। ফেরার সময় মেট্রো নেই, চলমান পথ আছে। আমরা ইউরোপের অনেক শহরে ট্রাম চলতে দেখলাম, চাপা হয়নি।

যাওয়ার সময় দোহাতে নেমে একটা সমস্যা হল; আমরা সবাই ইউরোপের জন্য নতুন সিম কার্ড নিয়েছি, বা নিজের সিমে ইন্টারন্যাশনাল রোমিং করিয়ে নিয়ে গেছলাম। কিন্তু দোহাতে সেসব কাজ করে না। আমাদের দলের সব থেকে বয়স্ক দুই সহযাত্রী দোহাতে নেমে হারিয়ে গেলেন। আমরা লন্ডনের ফ্লাইটের গেট নম্বর জেনে দলবদ্ধ ভাবে এগোচ্ছিলাম। বিমান

বন্দরের মেট্রোতে ওঠার আগে, ম্যানেজার পবন সকলকে একসাথে দাঁড়াতে বলল। দেখা গেল দু'জন কম পড়ছে।

পবন ছাড়া আমরা আর প্রায় কেউ তখন ওনাদের চিনি না। পবন ওনাদের খুঁজতে পিছন দিকে দৌড় দিল; হাতে 'গো এভরি হোয়ার' এর কমলা পতাকা। মিনিট দশেক খুঁজে, ওনাদের না পেয়, আমাদের নিয়ে পবন এগিয়ে চলল। আমরা সবাই ততক্ষণে পরের প্লেনের গেট নম্বর জেনে গেছি। তাই আন্দাজ করা যাচ্ছিল, ওনারা দুইজন গেটে পৌঁছে যাবেন। গিয়ে দেখি ঠিক তাই। দুই দাদু সবার আগে পৌঁছে, বোর্ডিং এর চেষ্টা করছেন। আমরা প্রায় সবাই বলছিলাম, 'আপনারা কোথায় হারিয়ে গেছলেন!' দুই দাদুর মধ্যে যিনি চটপটে, তিনি বললেন, "আমরা হারাইনি, আপনারাই হারিয়ে গেছলেন।" গোটা সফরে, বিশেষ করে শান্ত দাদুকে নিয়ে পবন হিমশিম খেয়েছে। কিন্তু ফেরার সময়, আজ সকালে , রোম বিমান বন্দরে চটপটে দাদু এমন জিনিস হারিয়ে বসলেন যে, পবনের হাড় কালী করে ছেড়েছেন। সেসব কথা পরে হবে। এখন এদের হিসেবে রাত পৌনে নটা, কলকাতায় সোয়া এগারোটা। রাতের খাওয়ার দেওয়া শুরু হয়েছে। এই পর্ব এখানেই শেষ করছি। আজ ৩০.৫.২০২৫.

বিদেশে ভ্রমণ- 4

মোবাইলের সিম দিয়ে আগের পর্ব শেষ করেছি। আমাদের এই ইউরোপ ভ্রমণ এর কদিনের জন্য আমরা মোবাইল কি করে ব্যবহার করতে পেরেছি সে কথা বলে নিই। ট্যুর কোম্পানী মে মাসের ছয় তারিখ আমাদের সকলকে কোলকাতার একটি হোটেলে ডেকে, পাসপোর্ট, ট্র্যাভেল ইন্সুরেন্স ইত্যাদী জরুরী কাজের জিনিস আমাদের হাতে হাতে তুলে দেন। ঐ দিনই আমাদের দরকার মত বিদেশী মুদ্রা আর সীম কার্ড নেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যেতে বলে দিয়েছিল। যদিও তার আগেই আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি যে, ইন্টারন্যাশনাল ক্রেডিট কার্ড, ফরেক্স কার্ড , এমনকি আমাদের মত ভাতখেকো ভিতু বাঙালির স্টেটব্যাংক এর ডেবিট কার্ড নিয়েই বিদেশে চলে যাওয়া যায়। তবুও কিছু ক্যাশ টাকা (পাউন্ড আর ইউরো) তো নিতেই হয়। সেদিন যেমন ট্যুর ম্যানেজার পবনদীপ কাউর একটি মজার খবর দিয়ে আমাদের পিলে চমকে দিয়েছিল। ঐ সকল উন্নত দেশের সব জায়গায় ফ্রী শৌচালয় নাও মিলতে পারে। আমাদের দলের কেউ একজন জানতে চান, কত টাকা দিয়ে প্রস্রাব করতে হতে পারে? পবন বলেছিল, এক ইউরো! অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় সাতানব্বই টাকা। আমাদের বারো দিনের, কয়েক হাজার মাইল বাস যাত্রায় কয়েকটি জায়গায় ঐ এক ইউরো দিয়ে, কেউ কেউ জরুরী " মূত্র বিসর্জন" করেছেন। এরকম একটি অত্যাধুনিক শৌচালয় এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গেট, ইউরো দিয়ে, এমনকি কার্ড দিয়ে খুলে লোকে ঢুকছে, এমন ছবি আমার ইউরোপ ভ্রমণ প্রথম পর্ব ইউটিউব ভিডিও তে দেখতে পারেন।

ভেনিসে একটি বাংলাদেশী হকারদের বাজারের পিছনে একটি পেইড টয়লেট -এ, পাঁচ ইউরো দিয়ে ঢুকতে হবে, এমন লেখাও আছে। সে যাই হোক, আমরা সকলেই দুই -তিন 'শ করে ইউরো নিয়েছিলাম,

ঐ কলকাতার হোটেলে আসা একটি বিদেশী মুদ্রা বিনিময় কোম্পানির লোকের কাছে। আমরা তিনজন তো লন্ডনে খরচ করতে মাত্র পঞ্চাশ পাউন্ড নিয়ে গেছলাম। আমার কন্যা ঐ একটি নোট ভাঙ্গিয়ে সাত পাউন্ড খরচ করতে পেরেছিল। বাকিটা কলকাতায় ফেরৎ এসেছে। আমি পায়ে প্লাস্টার নিয়ে ঘরে বসে গেছি, তাই কন্যাই সেই ফেরৎ আসা পাউন্ড আর ইউরো, কলকাতার একটি সংস্থা থেকে টাকায় পাল্টে আনবে। একই ভাবে , আমার একটি স্টেট ব্যাংকের ডেবিট কার্ড কাজ করে কিনা দেখার জন্য ইতালির রাস্তার পাশের একটি মলে, সতের ইউরো খরচ করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে। কার্ডের ব্যাপারে Go কোম্পানির একজন সাবধান করে দিয়েছে, ওসব দেশে কার্ড ক্লোন করে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তাই বাড়ী ফিরে যত দ্রুত সম্ভব, ইন্টারন্যাশনাল ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে। আর একটা জরুরী কাজের কথা হল, আমার স্টেট ব্যাংক এর একটি ডেবিট কার্ড, প্রথম থেকেই ইন্টারন্যাশনাল ব্যবহার চালু করাই ছিল। নেট ব্যাঙ্কিং-এ ওটা করতে গিয়েই দেখি বিদেশে ব্যবহার চালু করাই আছে I এটা বিপজ্জনক। আপনার ডেবিট কার্ড, অর্থাৎ এটিএম কার্ড একবার Yono বা ঐ রকম কিছু দিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। আর একটি খুব বাজে ব্যাপারও আমার কার্ডে প্রথম থেকেই করে পাঠিয়েছে। আমি ভ্রমণ শেষে বাড়ী ফিরেই সেটা বন্ধ করছি। ব্যাপারটা হল " Debit card এর No Touch Option" চালু করে রাখা। অর্থাৎ কোন PIN ছাড়াই যে কেউ কার্ডটি ব্যবহার করতে পারবে। এখনই এটা বন্ধ করে দিন।

ঐ বিদেশি মুদ্রা বিনিময় কোম্পানির লোকের মত, একটি সিম কার্ড দেওয়ার লোকও সেদিন হাজির ছিল। আমরা প্রায় সবাই তার কাছে একটি কি দুটি করে ইউরোপ এর সীম কার্ড নগদ টাকা দিয়ে কিনেছি। আঠাশ 'শ টাকার সিমে যে টক টাইম ছিল কেউই সেটা শেষ করতে পারিনি। আর যে পাঁচ জিবি ডাটা ছিল তাও খরচ করে উঠতে পারিনি। এখানে একটা খবর জানিয়ে রাখি , বিশেষ করে ভবিষ্যতে যারা ইউরোপে বেড়াতে যাবেন, তাঁদের কাজে লাগবে। এই গো এভরি হোয়ার ট্রাভেল কোম্পানী আমাদের যে যে হোটেলে রেখেছিল , সব হোটেলেই ভালো ওয়াই ফাই ছিল। আমি অবশ্য ভেনিসের কাছের হোটেলে নিজের মোবাইল ডাটা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। পরে সকালে বন্ধুবর যোগেশ এর রুমে গিয়ে দেখি ওয়াই ফাই বেশ চলছে। আমি তো প্রায় সবদিন হোটেলে বসে একটা, এমনকি দুই -তিনটা করে ইউ টিউব শর্টস আপলোড করতে পেরেছি। প্রায় সকলে অনুযোগ করেছে যে, ঐ আঠাশ শ টাকার ম্যাট্রিক্স সিম একেবারেই কাজ করেনি। আমার কিন্তু কোন সমস্যা হয়নি। আমি তো মাউন্ট জুংফ্রাউ এর উপর থেকে, গন্ডোলা থেকে, সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা থেকেও ছেলেকে what's app ভিডিও কল করে সব দেখিয়েছি।

প্রথম ঐ রকম ভিডিও কল করার পর তো আমার ছেলে আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। মেদিনীপুরের ডোবা পুকুরে সাঁতরে বড় হওয়া, সেই মতিবাবু মাষ্টার মশাই এর ছেলে, একেবারে সুইজারল্যান্ডের

পাহাড় থেকে ছেলেকে ভিডিও কল করে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখাচ্ছে; এটা বোধহয় হিন্দি সিনেমার মত হয়ে গেল! সে তো গেল একজন অতি সাধারণ জীবন যাপন করা, সরকারী চাকরি করে অবসর নেওয়া ডাক্তারের প্রৌঢ় বয়সের স্বপ্নের উত্থানের গল্প; এবার আপনার কাজে লাগবে এমন কিছু কথা বলে নিই। আমার কন্যার মত অনেকেই নিজের এদেশী সিমে, ইন্টারন্যাশনাল রোমিং করিয়ে নিয়ে গেছল। তাতে দশ দিনে দেড় হাজার টাকা লেগেছে। বেশ সস্তা। ওদিকে কাজও করে ভালো। এটাই সবথেকে ভালো ব্যবস্থা। হোটেলে ফিরে যত খুশী ওয়াই ফাই ব্যবহার করা, আর রাস্তায় বের হয়ে নিজের সিমে ইন্টারন্যাশনাল রোমিং। কোন ব্যবস্থাই দোহা বিমান বন্দরে চলবে না। কিন্তু সেখানেও আছে ফ্রী ওয়াই ফাই। একটু সাবধানে ব্যবহার করতে পারলেই হল। আমি তো ফেরার সময় দোহাতে ঐ ফ্রী ইন্টারনেট ব্যবহার করে একটা ইউটিউব শর্টসও দিয়ে দিলাম। আর বাইরে গিয়ে সর্বত্র Whats App কল করুন, সব সময় ভালো শুনতে পাবেন।

সেই ছয় মে তারিখে, কলকাতার জমায়েতে আর একটা জরুরী জিনিস আমরা কিনেছিলাম। একটা ইন্টারন্যাশনাল এডাপ্টার। ওদেশের প্লাগ পয়েন্টে আমাদের মোবাইল ফোন চার্জার এর এডাপ্টার ঢুকবে না। ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট এ প্রতিটা আসনের সামনে যে টিভি স্ক্রীন এর মত আছে, তার তলায় একটা করে ইউএসবি চার্জিং পোর্ট আছে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, খুবই আস্তে চার্জ হয়। প্রায় সব হোটেলেই এইরকম ইউএসবি চার্জিং পোর্ট আছে। কিন্তু দুটিতে বোধহয় আমাদের এই ইন্টারন্যাশনাল এডাপ্টার ব্যবহার করতে হয়েছে। এটার দামও বাইরের দোকানে বা অন লাইনে অনেক সস্তা। গো কোম্পানি এই সব লোককে না ডাকলেই পারে। লোকে তো ভাববে, নিশ্চয়ই কমিশন আছে।

এই পর্ব শুধুই কাজের কথা, শুকনো কথায় ভরে গেল। এবার আমাদের ট্যুর ম্যানেজার পবনদীপের একটি মজার অভিজ্ঞতার কথা লিখে এই পর্ব শেষ করি। বাসে শত শত মাইল চলার সময় আমরা একত্রিশ জন মাঝে মাঝেই গান করে, কবিতা বলে, রসিকতা করে সকলকে মাতিয়ে রাখছিলাম। শুধু আমাদের পোলিশ ড্রাইভার ছেলেটি নির্বিকার ভাবে গাড়ী চালিয়ে গেল। ওরকম একটি " সিক্স প্যাক" চেহারার স্মার্ট ছেলেকে পেলে, আমাদের দেশের পরিচালকরা লুফে নেবে। পবন ওকে নিয়েও বাংলায় রসিকতা করেছ। কিন্তু কলকাতার মেয়ে হলেও, পবন পাঞ্জাবী; তাই ওর বাংলা উচ্চারণে বেশ অবাঙালি টান আছে। সেই প্রসঙ্গেই ও নিজেই বলল, ওর একটা " ছড়ানোর" কথা। ওরা যখন কলকাতায় থাকে, আপিসে অনেক ফোন ধরতে হয়। একবার এক ভ্রমণার্থি ফোন করে জানান যে, এবারের কিস্তির টাকা " চৈত্র মাস শেষ" করে দেবেন। ঠিক আছে, কদিন পরেই তো মাস শেষ হবে, তখনই দেবেন। তার পরেই আর একজন ফোন করে ঐ একই রকম কিছু বলেন। পবন এর আপিসের বস সামনেই বসে ছিলেন। তিনি শুনলেন, পবন ফোনে বলছে, " ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি চরিত্র শেষ করেই দেবেন!" বস তো লাফিয়ে উঠে বললেন, এটা কাকে বললি? পবন নির্বিকার ভাবে বলল, ঐ

তো আগের একজন লোক বলল না, "চরিত্র" মাস শেষ করে দেবেন; এনাকেও তাই বলে দিলাম! সেই থেকে ঐ ছয় তারিখের জমায়েতের মত সময়ে, পবনের সাথে একজন ভালো বাংলা বলা ছেলেকেও রাখা হয়।

আমাদের নিয়ে তের দিন বাইরে কাটিয়ে একত্রিশ তারিখ সকালে বাড়ী ফিরেছে, আবার নয় তারিখ আর একটা দল নিয়ে বেরোবে। ওদের কোম্পানিতে এইরকম বেশ কিছু ছেলে মেয়ে কাজ করে। আমাদের প্রায় সাথে সাথেই, মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে দমদম থেকে রওনা দিয়েছে , আর একটা দল। সেই দলটি একটি নীল রঙের বাসে করে আমাদের সাথে সাথেই প্রায় চলল। সেই দলের ম্যানেজার ছিল , সৌম্যদীপ নামের একটি ছেলে। অনেক জায়গায় এরা দুজনই ষাট জনের দল একসাথে নিয়ে ঘুরেছে। এছাড়াও অনেক জায়গায় আরও গোটা দুই বাঙালি ট্যুরিষ্ট দলের সাথে দেখা হল। প্যারিস বিমান বন্দর এর কাছের ক্লারিয়ন হোটেলের লবিতে, এক সকালে একসাথে ছয়টি ভারতীয় দল হাজির হলাম। ওসব বিরাট বিরাট হোটেল যেন ভারতীয় ট্যুরিষ্ট দলের জন্যই তৈরী।

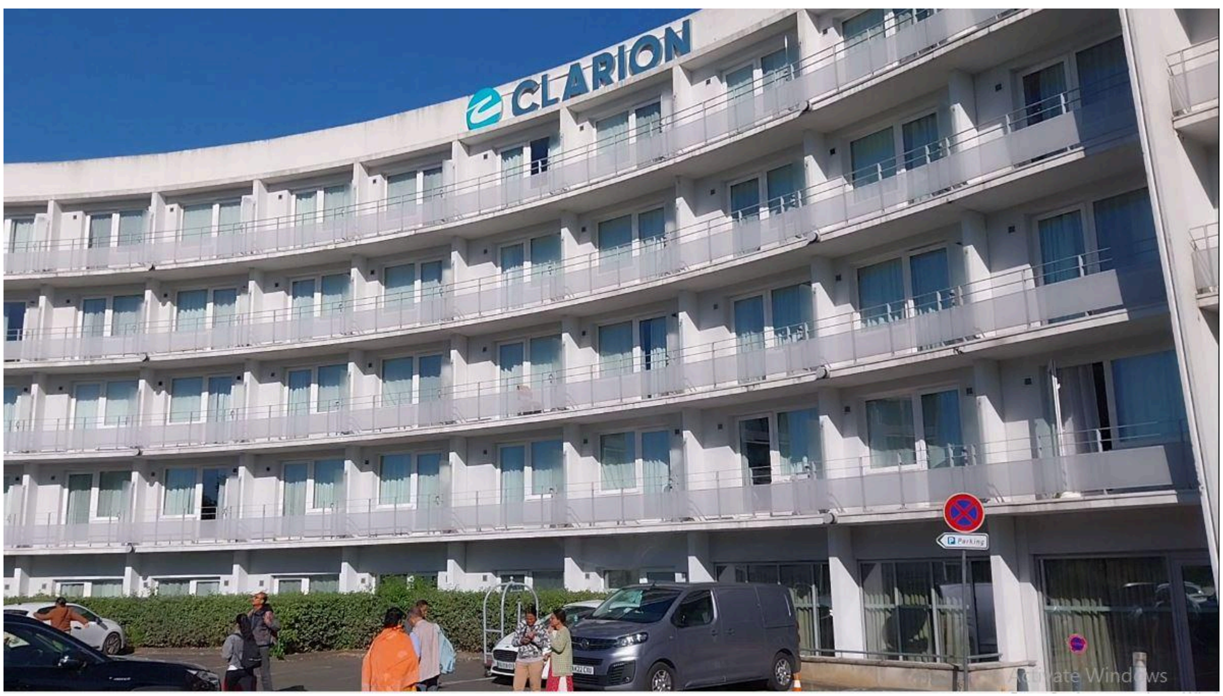

আমার কাছে একটা ব্যাপার বেশ মজার ছিল; সকালে প্রাতরাশের হল ঘরে একসাথে কয়েকশ লোককে ওরা সামলায় কি করে? এটাই তো ওদের কাজ। এখন অবসর নিয়েছি। কিন্তু সরকারী হাসপতালে কাজ করার সময়, শত শত রোগী আমরাও সামলেছি। আমাদের হাসপতালের ইমার্জেন্সিতে একসাথে চার পাঁচ জন শুধু জ্বরের রুগী এসে পড়ত। আমার বন্ধুর কন্যা মেঘা, কয়েক বছর ধরে লন্ডনে থাকে। ওর জ্বরের চিকিৎসার জন্য একবার, তিনমাস পর ডেট পেয়েছিল। জানিনা, আমার

পায়ের গোড়ালিতে চোট লাগার চিকিৎসা করাতে কত দিন পর ডেট পেতাম। এখানে, দমদমে আমার চিকিৎসার জন্য, শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার ছেলে ফোন করে, ডাক্তার ঝা এর সাক্ষাতের সময় নেয়, শনিবার সকালে। আমি দশটা পনের নাগাদ পৌঁছে, বারোটা পনের -কুড়ি নাগাদ, পায়ে প্লাস্টার করে চলে এলাম। উন্নত দেশের অনেক চোখ ধাঁধানো জিনিস দেখে এলাম। কিন্তু এদেশের হাসপতালে , মাছের বাজারের মত ভিড়ে, কি করে হাজার হাজার মানুষ এর চিকিৎসা হয়, সেটা ওরা দেখে যেতে পারে। ৩.৬.২০২৫.

বিদেশ ভ্রমণ- ৫

আমার বিদেশ ভ্রমণ এর কথা লিখতে বসে, গৌর চন্দ্রিকা করতেই চারটি পর্ব শেষ করে দিলাম। এবার একটু ভ্রমণের কথা না লিখলেই নয়। লন্ডনে নেমে , বাসের বিভ্রাটে আমরা তিন ঘন্টার উপর গ্যাটউইক বিমান বন্দর- এর বাইরে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলাম। প্রথমে তো বাসে বসে, এই ছাড়বে এই ছাড়বে করে আধ ঘন্টা মত কাটল। এর মধ্যে একজন মহিলা অফিসার এসে, বাসের সামনের দরজার পা- দানিতে দাঁড়িয়ে, ড্রাইভারের কাছে জেনে নিলেন , কেন বাসটি ওখানে এত সময় দাঁড়িয়ে আছে! একটু পরই এল পুলিশের গাড়ী। চার পাঁচজন সুন্দর চেহারার পুলিশ, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় এসে, ড্রাইভারের সাথে কথা বলতে শুরু করল। তারপর ট্যুর ম্যানেজার পবনদীপ এর কাছে ব্যাপারটা জেনে নিল। ওদের সাথে কথা বলে, পবন আমাদের বাস থেকে নেমে দাঁড়াতে বলল। আমরা যে যার হাতের- পিঠের ছোট ব্যাগ নিয়ে নেমে গেলাম। ড্রাইভার চটপট আমাদের বড় বড় ট্রলি ব্যাগ সকল বাসের পেট থেকে নামিয়ে দিল। এই বড় ট্রলি ব্যাগ বাসের পেটে ঢোকানো আর নামানোর কাজ সবসময় ড্রাইভারই করে; বারো দিন ধরে তাই দেখলাম। আমরা নামলে কি হবে, বাস আর চালু করা গেল না। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

সাদা জামায় ভারতীয় ড্রাইভার

এদিকে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কনকনে শীতে কাহিল। ঝকঝকে রোদ। একটু যে শিরশির করে বাতাস দিচ্ছে তাতেই কান কেটে নেওয়ার অবস্থা। একে একে আমরা একটু দেওয়াল এর আড়াল খুঁজে, হওয়া থেকে বাঁচার উপায় খুঁজতে লাগলাম। কেউ কেউ বলল, দেড়শ মিটার পিছিয়ে গিয়ে, আবার বিমান বন্দরে ঢুকে দাঁড়াই। কিন্তু নতুন দেশ; ম্যানেজার এর অনুমতি ছাড়া কোথাও যেতেও পারছি না। ভারতীয় ড্রাইভার বারবারই বলল, অন্য গাড়ী এসে গেল বলে। এদিকে ম্যানেজার পবন ফোন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠছে। দুজন একজন করে পবণকে বলতে শুরু করলেন, এই ঠান্ডায় এক কাপ করে কফি অন্তত খাওয়াও। একসময় পবন সেই দেড়শ মিটার পিছিয়ে গিয়ে, বিমান বন্দর থেকে একটি কফি দোকানের ছেলেকে নিয়ে, আমাদের তিরিশ জনের জন্য তিরিশটি কফি আনল। আমরা সাধারনত যতটা কফি খেয়ে অভ্যস্ত, এদের কাগজের গ্লাস তার প্রায় আড়াই গুণ। তার আগেই, পবন ঐ রকম ভেতরে ঢুকে তিরিশটি জলের বোতল কিনে এনেছে, একা একাই। একা মহিলা ঐ ভাবে জলের বোঝা বয়ে এনেছে দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম, ট্যুর -এর একেবারে শুরুতেই এরকম একটা বিভ্রাট ওকে দিশেহারা করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই কোম্পানির মালিকের থেকে এইরকম নির্দেশ পেয়েছে। আবার একেবারে শেষ দিনে, রোমে, হঠাৎ করে বাস পাল্টে আমাদের বড় ট্রলি ব্যাগ সকল অন্য বাসের পেটে ঢোকানো অবস্থায়, আমরা প্রায় দুই আড়াই কিমি দৌড়ে ফিরেছি। পবণও ছুটেছে আমাদের সাথে সাথেই। সে সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে পবণ শুধু এদিক ওদিক ফোন করে গেল। জানা গেল, একই বাস কোম্পানির অন্য এক বাসে, একটি ভারতীয় দলের ট্যুর শুরু হয়েছিল রোম থেকে। সেই বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায়, আমাদের দিন এগারোর ভালোবাসার সাদা বাস নতুন দলকে দিয়ে, আমাদের জন্য অন্য বাস পাঠিয়েছে। অন্তত আমরা সবাই বাসে ফিরে আসার পর এই পাল্টাপাল্টি করলে ব্যপারটা ভদ্রস্থ হত। জানিনা এই Raf Trans কোম্পানির সাথে Go কোম্পানির কি কথা হয়েছিল! আমাদের প্রিয় ড্রাইভার (নাম বলেছিল আমাকে, কিন্তু এতই মৃদুভাষী যে, আমি সেই নাম মনে রাখতে পারি নি।) , আর পরে ইটালিতে যে সাদা চুলের নতুন সারথি আমাদের বাস চালাচ্ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছি , ওরা দুজনেই পোল্যান্ডের লোক। ওর আগের সারথি রোম থেকে পোল্যান্ড চলে গেছে। আমাদের কথার লব্জ ওদের বোঝার কথা নয়। ইংরেজী কতটুকু জানে, তারই খবর আমরা জানি না। আমি নতুন সারথীকে বললাম, “ তোমার বন্ধু কোথায় গেল? “ কিছুই বুঝতে পারল না। পরে যখন বললাম, “ তোমার আগে যে চালাচ্ছিল, সে কোথায় গেল?” তখন বুঝল।

বাসের কথা যখন এলোই, বাসের প্রসঙ্গ শেষ করে দিই। ইউরোপ ভ্রমণ করতে গিয়ে, ১২ দিনে আমি যত কিমি বাসে বসে যাত্রা করেছি , গত বারো কেন কুড়ি বছরের সব ধরনের রাস্তায় চলা গাড়ীতে মোট ততো কিমি চলিনি। মনে পড়ল, আমার বাবা মায়ের গুরুদেব, আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদু গুরুদেব, ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের ১৯৩৩ সালের বাসে চাপার কাহিনী। মহানাম দাদু সেবার শিকাগো মহাধর্ম সভায় গেছলেন; হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ তার চল্লিশ বছর আগে প্রথম যে সভায় যোগ দিয়েছিলেন। জাহাজ বন্দর থেকে ধর্ম মহা সভায় যেতে, হাজার দুই কিমি বাসে যেতে হবে শুনে (সবথেকে সস্তার পরিবহণ) দাদু ভয় পেয়ে গেছলেন। পরে অবশ্য উনিও মেনে নিয়েছিলেন, বাসে যেতে তেমন অসুবিধা হয় নি। আমি বহু বছর আগে মহানাম দাদুর এই কাহিনী শুনেছিলাম। আমার এখনও বাসে লম্বা রাস্তা যেতে ভয় করে। বছর দুই আগে , সপরিবারে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি গেছলাম; এ সি , স্লিপার বাসে। সত্যিই ঝাঁকুনিতে আমার রক্ত রস থেকে মাখন তুলে নিয়েছিল। ডালখোলায় , ভোর রাত্রে বমি করে দিয়েছিলাম।

ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী আমেরিকা হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৩.৩.১৯৩৯

আনন্দবাজার পত্রিকা

(সংবাদদাতার পত্র)

ফরিদপুর, ৯ মার্চ : ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ফরিদপুর শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু আশ্রম হইতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ১৯৩৩ সালে আমেরিকার চিকাগো মহানগরীতে গমন করেন। উক্ত মহাসভায় ৩০০০ প্রতিনিধির সমক্ষে হিন্দুধর্মের সার্বভৌমত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া তিনি সকলকে মুগ্ধ করেন। তারপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি হইতে অজস্র নিমন্ত্রণ আসিতে থাকায় বিশ্বধর্ম মহাসভার উদ্যোক্তাগণ তাঁকে উক্ত সভার সম্পাদকের ভার দিয়া আমেরিকার সর্বত্র প্রেরণ করেন। ব্রহ্মচারীজী ১৯৩৬ সালে লন্ডন মহানগরীতে বিশ্বধর্ম মহাসভার তৃতীয় অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা করেন।

এবারের ইউরোপ ভ্রমণ করতে গিয়ে আমরা বোধ হয় হাজার চারেক কিমি বাসে যাত্রা করেছি। ঐ রকমের দামী বাস আমাদের দেশে অনেক জায়গায় চলে। কিন্তু ওদেশের রাস্তা কতটা ভালো, আমার পক্ষে লিখে জানানো অসম্ভব। কথায় বলে না, মাখনের মত রাস্তা। আমি তো ছেলেকে ফোনে বললাম, প্লেনের থেকে বাসে বেশী আরামে ঘুরছি। হাই ওয়েতে প্রায় সবসময় একশ কিমি গতিতে চলতে থাকে। এই চার হাজার কিমি রাস্তায় একবারও নিজের নির্দিষ্ট লেন ছেড়ে অন্য লেনে যেতে দেখিনি, কোন গাড়িকেই। কোন গাড়ী হর্ন বাজায় না। আমাদের প্রিয় সারথী, একবার আমাদের ম্যানেজার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সেকেন্ডের ভগ্নাংশের সময় হর্ন বাজিয়ে ডেকেছিল। তাই না হলে তো আমরা ভাবতাম, ওদেশের বাসে হর্নই থাকে না। কোন দিনই, একবারের জন্যও হঠাৎ ব্রেক করে আমাদের ঝাঁকুনি দেয়নি। আমি তো পায়ে চোট লাগার পর দুই তিন বার , পিছনের সিটে আরামে শুয়ে যাত্রা

করেছি। আমাদের দেশে , বাসের সামনের দিকে আসন পাওয়ার জন্য প্রায় মারামারি করতে হয়। ঐ সাদা বাসে, অনেকেই খুঁজে খুঁজে পিছনের দিকে বসে চলেছি।

শেষ পর্যন্ত এটাই বলব যে, ইউরোপের রাস্তায় দূরপাল্লার বাস যাত্রা অত্যন্ত আরামদায়ক। আমাদের বাসে টিভি স্ক্রীন থাকলেও, আমরা এক মিনিটের জন্যও চালাইনি। সামনে দাঁড়িয়ে, ম্যানেজার পবন, অনেক সময় মাইকে ঘোষণা করেছে, শুনতে অসুবিধা হয়নি। তবে, গান করার সময় মাঝে মাঝে ভালো শোনা যাচ্ছিল না। আমার বিশ্ব পরিক্রমাকারী ডাক্তার দাদা বলছিলেন, ঐ বাসে WiFi থাকে। আমাদের বাসে ছিল না। না থেকে কোন অসুবিধা আমার অন্তত হয়নি। বাস সকল স্পটে ঢুকতে পারে না। একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে, হয়তো দু ঘন্টা পরে আবার সেখানে ফিরে আমাদের তুলে নিয়েছে। ঐ সময়ই সম্ভবত গাড়ীতে তেল টেল ভরে নিয়েছে। পরপর বারোদিন বাসে চেপে, প্রতিদিন শত শত কিমি ঘুরেছি, এখনই কেমন অবিশ্বাস্য লাগছে। ৫.৬.২০২৫.

বিদেশে ভ্রমণ ৬

শেষ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর, অন্য একটি বাস এল। আমাদের বড় বড় ব্যাগ ইত্যাদি বাসের পেটে ঢোকানো হলো; আমরা বাসে উঠে বসলাম। গ্যাটউইক বিমান বন্দর থেকে লণ্ডনের "লণ্ডন আই" প্রায় পঞ্চাশ কিমি রাস্তা। মাটির নিচে দিয়ে মেট্রো রেল যোগাযোগ আছে কি না জানিনা। কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে থাকার সময় দেখেছি, বিমান বন্দর থেকে, মাথার উপর দিয়ে মেট্রো রেল চলে যাচ্ছে। আমরা প্রায় ঘন্টা খানেকের বাস যাত্রায় , টেমস নদীর তীরে অবস্থিত লণ্ডন আই এর কাছে পৌঁছলাম। বাস চলতে শুরু করে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমাদের দুই দিকের সোনালী সবুজ প্রান্তরের মধ্যে নিয়ে গেল। অকৃপণ প্রকৃতি দেখে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। কে বলবে যে, এই লোকগুলিই আগের সাড়ে তিন ঘন্টা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ধৈর্য হারা হয়ে যাচ্ছিল। ছুটন্ত বাসের জানালা দিয়ে যেদিকে তাকাই সবুজ আর সবুজ। প্রথমে কিছুটা একেবারেই গ্রামের মত। ক্রমশ কিছু কিছু বাড়ী ঘর চোখে পড়তে থাকল। সবাই মোবাইলে, আর ক্যামেরায় ছবি তুলে তুলে ছটপট করতে থাকলাম। লন্ডন শহরতলীর বাড়িগুলি সব প্রায় একই রকমের। ঢালু ছাদ। মাথায় চিমনি। একটি করে ছোট এন্টেনা। ডিস এন্টেনা, গোটা ইউরোপ ভ্রমণেই আমার চোখে পড়েনি।

ওখানে প্রায় রাত নয়টায় সূর্য ডোবার কথা। আমরা ভাগ্যবান, এতটুকু মেঘ বৃষ্টি পাইনি। টেমসের পারে পৌঁছে, নীল জল, নীল আকাশ, নদীর পাড়ে সবুজের সমারোহ, উল্টো পারে খুবই চেনা ছবির মত বিগ বেন , এই সবের মধ্যে ছবি তুলে আর আশ মেটে না। আমরা যেখানে জমায়েত মত করে, টেমস নদীতে নৌকা ভ্রমণ (Cruise) এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম তার থেকে একশ ফুট মত দূরে, একটা পার্ক মত জায়গায় দাঁড়িয়ে, মাইক আর বক্স নিয়ে একটি কম বয়সের মেয়ে গান গাইছিল। পয়সা রোজগারের জন্য কি না, জনিনা। পরদিন দুপুরে আমাদের লণ্ডন আই চড়ার সময়ও একজন পুরুষ মানুষ ওভাবে গান গাইছিলেন। আমার ডাক্তার দাদাও বলছিলেন, ওখানে কেউ না কেউ গান গাইতে থাকে।

আমাদের ম্যানেজার পবন সকলকে ডেকে নিয়ে ক্রুজের জেটিতে লাইন দিয়ে উঠতে বলে দিল। এই রকমের সকল টিকিট কাটার দায়িত্ব ট্যুর কোম্পানির। কোথাও গিয়ে সাথে সাথেই ম্যানেজার পবন (এবার থেকে ওকে শুধুই পবন বলে লিখব। এর মধ্যে ও আমাদের দলের একজন হয়ে গেছে) টিকিট কেটেছ। কোথাও বা মাস খানেক আগে অনলাইনে টিকিট কেটে রেখেছে। আমি শিবাজীবাবুর ইউটিউব ভিডিও দেখে জেনেছি, এই ক্রুজের টিকিট বেশ দামি। উনি সস্তায় ওলা বোট ভাড়া নিয়ে ঘুরেছেন। আমরা ছাড়াও আরও জন দশেক অন্য যাত্রীও আমাদের সাথে উঠেছেন। এমন সুন্দর ঝকঝকে দিনে কে আর নিচের তলায়, কাঁচের জানালা ঘেরা সিটে বসে! আমরা সবাই ছাদে। উপরে বোধহয় শ দেড়েক লোক বসার জায়গা ছিল। আমরা চল্লিশ জন মত উঠেছি। যন্ত্র চালিত ক্রুজ সামান্য ঘড়ঘড় শব্দ করে চলতে শুরু করল। মাইকে অল্প আওয়াজে কিছু বলে বলে দিচ্ছিল। এক তো সাহেবদের উচ্চারণে কি বলছে, কিছুই বুঝতে পারি নি। আমরা তো তখন চারিদিকের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বধির হয়ে গেছি। কোনদিক ছেড়ে কোনদিকে তাকাই! সবাই তখন এই স্বপ্নের নৌকা ভ্রমণ এর স্মৃতি বাকী জীবনের জন্য স্মৃতিতে, আর মোবাইলে, ক্যামেরায় সঞ্চয় করতে ব্যস্ত। কয়েক মাস আগে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে, ডাল লেকে, শিকারা ভ্রমণ করে, এরকম শিহরিত হয়ে উঠছিলাম। এখানকার প্রতিবেশ সম্পূর্ন আলাদা ; চারিদিকে আধুনিক বড় বড় গগনচুম্বী অট্টালিকা।

টেমস নদীর নীল জল

মাথার উপর দিয়ে একে একে সেতু, সেতুতে রেল, বাস, অন্যান্য গাড়ী। মাথার উপর নীল আকাশ। সেই আকাশে উড়ে যাওয়া সাদা বা ইস্পাত রঙের বিমান। সব কিছুর ছবি তুলে রাখতে হবে। বিখ্যাত লন্ডন ব্রীজের (টাওয়ার ব্রীজ)তলা

দিয়ে পেরিয়ে গেলাম। কতো ছবিতে এই ব্রীজ দেখেছি। একটি ক্যালেন্ডার এর ছবিতে , এই লণ্ডন ব্রীজের উপর নীল আকাশে সাদা রাজ হাঁসের মত এরোপ্লেন দেখেছি।

এই একই আকাশের নিচে, আমার মত অকিঞ্চিৎকর একটি মানুষ আর এমন প্রকৃতির সাথে প্রযুক্তি মিলিয়ে যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা সৌন্দর্য একই সাথে থাকতে পারে, কল্পনাতেও ছিল না। করুণাময় ঈশ্বরের অকৃপণ দানের উপর আমার সেই অবিশ্বাস দূর করার জন্যই যেন একেবারে ঐ সময়েই একটি সাদা বিমান উড়ে গেল আমাদের মাথার উপর দিয়ে। সেই সময় আমার মোবাইলের ভিডিও ক্যামেরা চালুই ছিল। পরে বাড়ী ফিরে, ইউটিউব ভিডিও করার সময় সেই প্রায় অলৌকিক সমাপতন আবার দেখলাম। এই লণ্ডল ব্রীজের বিখ্যাত হওয়ার কারণ হল, বড় জাহাজ পেরোতে হলে, এই সেতু মাঝখান থেকে খুলে উপর দিকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। এই জিনিস আমাদের দেশেও আছে। এই তো ক'মাস আগে রামেশ্বরম ধাম দেখতে গিয়ে দেখে এলাম। আমাদের গর্বের পাম্বান সেতু। সমুদ্রের উপর সেই সেতু দিয়ে রেলগাড়ী চলে। প্যাম্বান সেতু অবশ্য আমি দেখেছি উপর থেকে, গাড়ী চলার রাস্তা থেকে। আমি ঘুরে আসার দিন পনের পর থেকে, পাম্বন সেতুর উপর দিয়ে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

ঐ দিন বিকেলে টেমস নদীতে নৌকা ভ্রমণ এর পর আর আমাদের নির্দিষ্ট কোন সূচি ছিল না। আমাদের লণ্ডন শহরে ঢুকতেই সাড়ে তিন ঘন্টা দেরী হয়ে যাওয়ায় ঐ বিকেলে আমরা লণ্ডন আই নাগর দোলায় উঠতে পারিনি।

Cruise থেকে দেখা লন্ডন আই

দিনের আলো কমে আসছিল, সন্ধ্যা ন' টা নাগাদ। বাসের জন্য একটু পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করার সময় কয়েকজন শৌচালয় এর খোঁজ করায়, পবন, বিনা পয়সার শৌচালয় খুঁজতে শুরু করলো। নদীর বুকে ক্রুজের শৌচালয় ছিল। কিন্তু ঐ সময়, ঐ রকম একটা মিনিট পনের কুড়ির স্বপ্নের নৌকা ভ্রমণ ছেড়ে কেউ শৌচালয় এর কথা ভাবতেই পারেনি। নামার সময় হলে, ওরা শৌচালয় বন্ধ করে দেয়। পিছন দিকে একটা বিশাল বাড়ীতে শৌচালয় এর খোঁজ নিয়ে এল পবন। কিন্তু বলল, সবাই দল বেঁধে যাওয়া যাবে না; যাদের বেশ জরুরী দরকার, তাঁরা এক এক করে কাজ সেরে আসুন। এই সময় মনে পড়ল, দিন তিনেক পর, বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে, এক রেস্টুরেন্টে দুপুরে খেতে ঢুকে কেউ কেউ ওদের শৌচালয় ব্যবহার করতে যায়। কিন্তু সেখানে জন প্রতি এক ইউরো দিতে হয়েছে। একজন কোন ফাঁকে টাকা না দিয়ে নেমে আসে। বিশাল চেহারার অশ্বেতকায় পাহারাদার, পরের জনকে আটকে রেখে পয়সা আদায় করে। সেই থেকে আমাদের দলের সবাই সাবধান হয়ে যাই। পকেটে খুচরো ইউরো না নিয়ে কেউ শৌচালয় এর দিকে পা বাড়ায়নি। বারো দিনে মাত্র গোটা তিনেক জায়গায় সেরকম ইউরো দিয়ে ঢুকতে হয়েছে। সাধারণত কোথায় ফ্রী WC (western comode?) পাওয়া যায়, পবন খুঁজে বের করে ফেলত।

ঐদিন লণ্ডন শহরের শহরতলীর একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্টে আমরা ডাল-ভাত-তরকারী, পায়েস খেয়েছিলাম। ওখানকার রাত দশটার পর আমরা খেতে বসলাম। আমাদের দেশে তখন রাত পৌনে তিনটা। প্রথম দিন তিন - চার এরকমের জেট ল্যাগ আমাকে বেশ বিব্রত করেছে। রাতের খাবার পর আরও মিনিট চল্লিশ বাসে চলে আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেল বেশ ভালো ছিল। কিন্তু ঐ রাত্রে ঘুমানোর জন্যই। আগের রাত্রেও রাস্তায় রাস্তায়, কোলকাতা থেকে দোহা প্লেনে, এসব করে প্রায় ঘুমানোই হয়নি। আজও দেশের সময় প্রায় রাত চারটায় শুতে গেলাম। মনে

পড়েছিল, সাধারণত দমদমের বাড়ীতে আমি প্রায়ই ঐ সময় ঘুম থেকে উঠে, মিশনের মহারাজ বা কোন ভালো কথকের, রেকর্ড করা ভাষণ শুনতে শুরু করি। লন্ডনের শহরতলীর হোটেলে প্রথম রাত ভালোই কাটল।

আজ ৮.৬.২৫ তারিখ, দমদমের বাড়ীতে বসে এই পর্ব শেষ করলাম।

পরদিন দুপুরে টেমস টেমস নদীর জল ঘোলা। আগের বিকেলে নীল জল দেখেছি।

বিদেশে ভ্রমণ ৭

বেশ রাত করেই ঢোকা হল, লণ্ডনের হিথরো বিমান বন্দর এর কাছের হোটেলটিতে। ঐ সব দেশের হোটেলে কোথাও গাড়ী থেকে রুমে ব্যাগ বয়ে দেওয়ার লোক থাকে না। বাস হোটেলের বাইরে দরজার কাছে দাঁড়ায়। ড্রাইভারই সবার বড় ব্যাগ ইত্যাদি বাসের পেট থেকে নামিয়ে পাশে রেখে দেয়। যে যার ব্যাগ টেনে হোটেলের ঘরে নিয়ে যেতে হয়। একসাথে একত্রিশ জন পৌঁছে গেলে একটু হৈ হৈ তো হয়ই। এক জায়গায় তো রিসেপশন-এর মেয়েটি রীতিমত কড়া করে পবনকে বলেছিল, আস্তে কথা বলতে। হোটেলে বহু লোক আগে থেকেই আছে, কেউ কেউ হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। অত বড় হোটেল, কোথাও কোন শব্দ নেই।

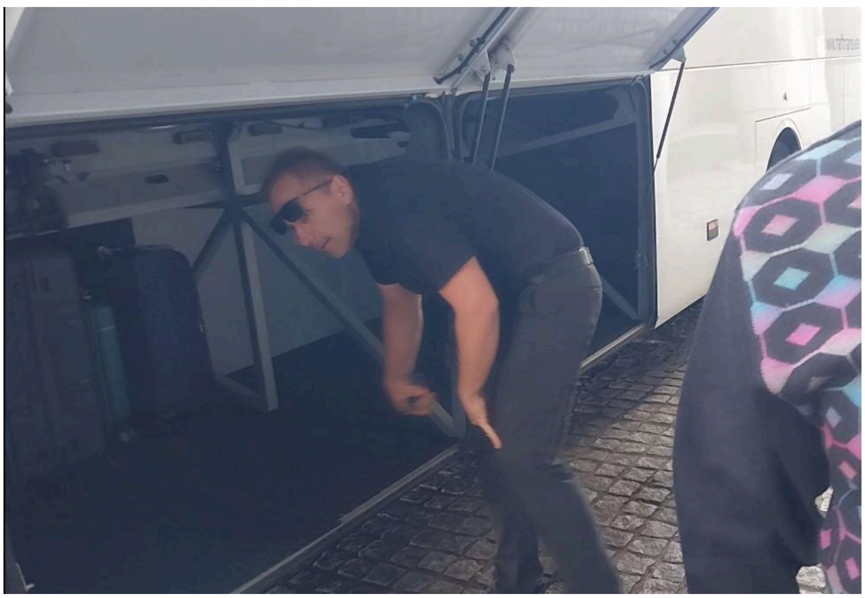

বাসের পেটে ট্রলীব্যাগ তোলা হচ্ছে

অনেক আধুনিক হোটেলেই দরজার তালা ইলেকট্রনিক; কার্ড দিয়ে খুলতে হয়। এসব আমাদের দেশেও অনেক দেখেছি। সমস্যা হল, সব এক রকমের নয়। এক একটি এক এক কায়দার। কেউ কেউ ঘরে ঢোকার সময় অন্যের সাহায্য নিয়েছে। এখন আমাদের ডুয়ার্সের ছোট রিসর্টেও ইলেকট্রিক কেটলি দিতে দেখেছি। কিন্তু আমাদের কলকাতার জমায়েতে কোম্পানী থেকে বলে দিয়েছিল, সব হোটেল ফোর স্টার হলেও, কোভিডের পর থেকে অনেক হোটেলে কেটলী দেয় না। প্রথম হোটেলেই কেটলি পেলাম। আমাদের ট্যুর ম্যানেজার পবন, কলকাতাতেই বলেছিল, যাদের ভোরে উঠে চা খাওয়ার অভ্যেস তাঁরা একটা ইলেকট্রিক কেটলি বয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আমাদের ভোরে চা খেতে হবে এমন কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু আমার স্ত্রীকে দেখেছি , ভোরে উঠে জল সামান্য গরম করে খায়।

পবন কিন্তু কলকাতায় বসেই একটা বেশ বড় খবর দিয়েছিল। ঐ সকল দেশে জলের দাম কফির থেকে বেশী। কিন্তু ওদের যে কোনো ট্যাপ থেকেই জল নিয়ে পান করা যায়। স্নানের জলও পানীয় জলের

মতো জীবাণু মুক্ত। সেই জন্য সকলকে একটা করে খালি বোতল লাগেজে নিয়ে নিতে পরামর্শ দিয়েছিল। আমরা তিনজনের জন্য দুটি ভালো প্লাষ্টিকের বোতল নিয়ে গেছলাম, বাড়ী থেকে। বড় বোতলটি শেষ পর্যন্ত কাজে লাগেনি। প্রথম হোটেলেই কেটলি দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। আমি শোয়ার আগে এক কেটলি জল ফুটিয়ে, ঢাকনা খুলে ঠাণ্ডা করতে দিয়ে, বিছানায় উঠেছি। এই হোটেলে এক দুই বোতল মুখ বন্ধ জল দিয়েছিল কি না মনে নেই। সে যাই হোক, পরদিন সকালে আমি ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কেটলির জল, বাড়ী থেকে নেওয়া বোতলে ভরে নিয়েছিলাম। অনেকেই সকালে প্রাতরাশের হলে গিয়ে জল ভরেছে। পরে বেশ কয়েকটি হোটেলেই কেটলি না থাকলেও মুখ বন্ধ জলের বোতল পেয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের অন্তত কোথাও জল কিনতে হয় নি। আমার মেয়ে তো ওর আপিসের কারো অনুরোধে, একটি মুখ বন্ধ জলের বোতল ইউরোপ থেকেই এনে বিতরণ করেছে। চেক্ ইন লাগেজে মূখ বন্ধ জল আনতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু হ্যান্ড লাগেজে কোন তরলই আনতে দেয় না। ফেরার সময়, রোম বিমান বন্দরে কতো যে মুখ বন্ধ জলের বোতল ফেলে দিয়ে আসতে হয়েছে তার হিসেব নেই। আমি তো মেয়ের বোঝার ওজন কমাতে, একটা বোতল আমার বড় ট্রলিতে ঢুকিয়ে এনেছি। একটি সেরকম বোতল এখনও আমাদের খাওয়ার টেবিলে দাঁড়িয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে।

এখানে জলের বোতল এর মতোই আর এক বোতলের গল্পটা বলে নিই। বেশ কিছু হোটেলেই দুই রকমের বোতল দেখে আমরা সবই জলের বোতল ধরে নিয়ে ঠকেছি। একটি সাধারণ পানীয় জল, আর অন্যটি সোডা ওয়াটার। ইতালির একটি হোটেলের প্রাতরাশের হলে, এক কর্মচারীর কাছে জানলাম, ওরা বলে ওয়াটার উইথ গ্যাস। আমি তো প্রথমে একটি হোটেলে, না বুঝে একটি সোডার বোতল খুলে, মুখে নিয়ে দেখি, জিভে কেমন চিনচিন করছে। যারা বুঝে নেবার এতক্ষণে বুঝে গেছেন, এই গেঁয়ো ডাক্তার লোকটি, একেবারেই বেরসিক। তাই বলে কি আমাদের দলে কোন রসিক মানুষ ছিল না! ছিল, ছিল। পবনই, রাত্রে খাওয়ার আগে কেউ কেউ কেন একরার হোটেলের ঘরে যেতে চাইতো সেটা বলতে, আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। আমি পরে এক রসিক দাদুকে দুই একটা সোডার বোতল দিয়েছি।

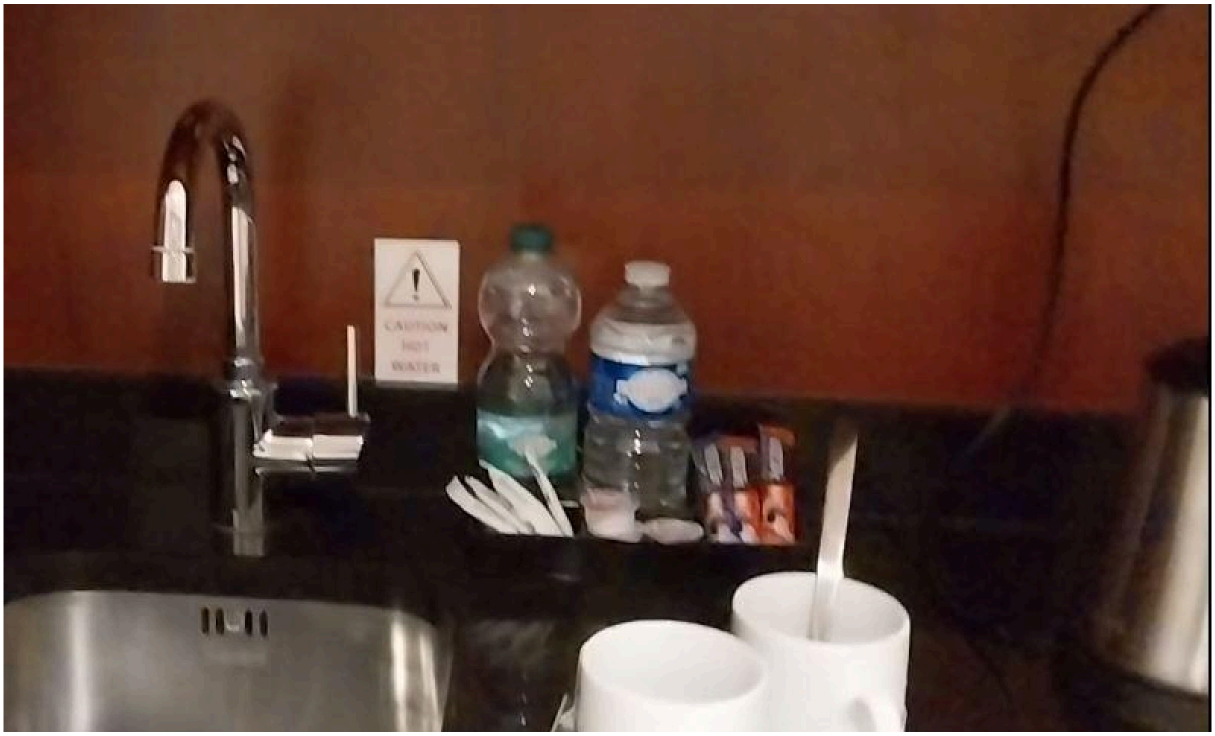

দুই রকম জলের বোতল ও চায়ের সরঞ্জাম

আচ্ছা, রসিকজনের কথা যখন এলই, সে বিষয়ে কটা কথা বলেই দিই। আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রা এবারই আমার প্রথম ছিল। সব বারই বিমানবালাদের প্রথম কাজ হল, রসিক মানুষদের রস পরিবেশন করা। আমি তো আমার প্রিয় আপেলের রসই পেয়েছি। একবার জানতে চাই, চা বা কফি হবে? কি বলল বুঝলাম না। আঙ্গুল দিয়ে বিমানের পিছনের দিকে দেখালো। পরে বুঝেছি, ঐ সব বদ রসিক মানুষ এর গরম পানীয় নিতে হলে, পিছনদিকে , যেখানে ওদের গরম রাখার মেশিন আছে, সেখানে গিয়েই বলতে হবে। একবার বিকেলের দিকে উঠে পা হাত ছাড়াতে পিছন দিকে হেঁটে ঘুরে আসতে গিয়ে, কফি খেয়ে এলাম।

কফি আর চায়ের প্রসঙ্গ এসেই গেল যদি, ওদের কড়চা শেষ করে দিই। এয়ার পোর্টে বসে থাকার সময় অনেকবার দেখেছি, লোকে বড় বড় কাগজের গ্লাস ভরে কফি খায়। কফির গন্ধ আমার ভালোই লাগে। কিন্তু বিমান বন্দরে ঢুকে, পাঁচ গুণ দাম দিয়ে কফি কেনার সাহস আজও আমার হয়নি। আমার এক বিখ্যাত (আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত) ভাইকে বিমান বন্দরে ঐ রকম বড় ডাব্বায় (বিশাল গ্লাস) দুধছাড়া কালো কফি খেতে দেখেছিলাম। বছর আট -দশ পরেও সেই কথা মনে আছে। বাসে এক দেশ থেকে অন্য দেশে শত শত মাইল চলার সময়, মূলত বিনা পয়সার শৌচালয় এর জন্যই, আমরা মাঝে মাঝে থেমে, কোন শপিং মলে ঢুকে পড়তাম। ওখানে অনেকেই কিছু কিছু কেনা কাটাও করেছে। আমার বোন আর কন্যা বেশ জুটি বেঁধে এদিক ওদিক থেকে এটা ওটা কিনেছে, গোটা সফরেই। আধুনিক কফি মেসিন থেকে ইউরো দিয়ে, নিজে নিজেই কফি বের করে নেওয়ার কায়দা আমার কন্যার মত নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরাই ভালো পারে। বোধহয় এই জন্যই আমার বোন সব জায়গায় ভাইঝিটিকে টেনে নিয়ে যেত। এক জায়গায় ওরা দুজন ঐ রকমের এক মেসিনে কসরত করছে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঐ রকমের এক ডাব্বা কফি বের হল। পাশেই ছোট কাগজের কাপ (গোটা দশেক দেশ ঘুরে, কোথাও প্লাষ্টিকের কাপ দেখিনি) দেখে একটা কাপ নিয়ে ঐ ডাব্বা থেকে একটু ভাগ করে খেলাম। আহা, তবেই না আজ আপনাদের বলতে পারছি দুই দশমিক আট ইউরো দিয়ে কেনা কফিও আমার এই গেঁয়ো জিভের ছোঁয়া পেয়ে ধন্য হয়েছে!

ঐ রকমের এক মেসিনে, আমাদের দলের এক ডাক্তারবাবু , কার্ড দিয়ে ইউরো খরচ করে কফি নিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন দেখে, আমার মেয়েকে ডেকে আনলাম। পরে শুনেছি, ওনার ঐ কার্ডেই কিছু

সমস্যা ছিল। ঐ মেসিনেই দেখেছি, কফি দুই দশমিক আট দাম হলেও, চা কিন্তু তিন দশমিক দুই ইউরো লেখা ছিল। আমরা যে সব হোটেলে ছিলাম , সব জায়গায় প্রাতরাশের হলে একটি করে আধুনিক কফি মেশিন ছিল। এক একটি এক এক কেরামতির। কোথাও কফি বা গরম জল কিংবা গরম দুধের জন্য আলাদা আলাদা টাচ বোতাম। ছবি বা লেখাও আছে। বিপদে পড়তে হল ইতালির এক হোটেলে। ওরা কিন্তু ভাষার ব্যাপারে একেবারে কট্টর। কোথাও একটি শব্দও ইংরেজিতে লেখা নেই। ওদের নিজেদের ভাষায় শুধু লেখা। কফি , মানে ব্ল্যাক কফি তো বের হল। এবার দুধের বোতাম কোনটি?! গোটা হলে হয়তো একশ লোক বসার জায়গা আছে, কর্মচারি এক কি দুই জন। সেই সময় এক সাদা রঙের বিদেশিনী কাপ নিয়ে আমার পিছনে এসে হাজির। ওনাকেই ইংরেজিতে বললাম, আমাকে দুধের বোতাম কোনটি বলে দিতে পারেন? উনিও ইটালিয়ান ছিলেন না; কিন্তু সপ্রতিভ। এটা না ওটা বলতে বলতে ওনার মনে পড়ে গেল; “ Latte” হল দুধ। আমি কিন্তু দশ মিনিট পর ভুলেই গেছি। এখন Meta AI খুঁজতে গিয়ে দেখি, অন্তত চার রকমের Latte হয়। আমাকে আমার এক ডাক্তার ভাই প্রথম দিকেই বলেছিলেন, স্যার, ঐ সব দেশের মানুষ, গাছপালা, পশু পাখি, সব কেমন দেখে এসে লিখবেন। আমি যেখানেই সামান্য সুযোগ পেয়েছি , বিদেশী মানুষের সাথে এক দুটি কথা বলেছি। কেউ আমার মত বাদামি রঙের মানুষকে অবজ্ঞা করেনি। এই মেয়েটি তো আমাকে Latte মানে Milk বলে দিতে পেরে, কিশোরীর মত খুশী হয়েছিল। ওদের বয়স বোঝা দায়। তবে, এই মহিলা 35-40 তো বটেই।

ইটালির হোটেলের সেই কফি মেসিন

বয়স যে হয়েছে বেশ বুঝতে পারছি। কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের! সব হোটেলেই চায়ের বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট প্যাকেট," গরম জলে ডোবানোর শ্যাসে" রাখা থাকত। আমি রুমের কেটলির পাশে রাখা শ্যাষেগুলি তো এনেইছি, অনেক হোটেলের প্রাতরাশের হল থেকে চার -পাঁচ রকমের চা পকেটে করে এনেছি। এখন, এই গরমের দেশে বসে, শীতের দেশের চা, প্রতিদিন সকাল বিকেল পরখ করে দেখছি। চায়ের বাটিতে ভেজানো চা পাতা ফেলার ঝামেলা নেই, এই এইটুক তফাৎ আমার কাছে ধরা পড়েছে। লন্ডনের সেই প্রথম হোটেলের প্রাতরাশের গল্প দিয়ে পরের পর্ব শুরু করব।

আজ ৯.৬.২০২৫. পায়ের প্লাস্টার অনেক ঢিলা হয়ে গেছে, ফোলা কমার জন্য। ভেতরে মাঝে মাঝেই বেশ কুট কুট করছে। আরও তিন সপ্তাহ রাখতে হবে; চুলকানি কত বাড়বে কে জানে!

বিদেশ ভ্রমণ ৮

গত পর্ব শেষ করার সময় বলেছিলাম, লণ্ডনের শহরতলীর হোটেলের প্রাতরাশ নিয়ে পরের পর্ব শুরু করব। আমার সেই মনোযোগি ডাক্তার ভাইটি পড়েই লিখেছে, স্যার, ও দেশের লোকেরা তো খুব ব্যালান্সড খাবার খায়। আপনি একজন ডাক্তার হয়ে কি বুঝলেন, ভালো লিখে জানাবেন। সমস্যা হল, আমি পুষ্টি বিশারদ নই; সামান্য সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেওয়া ডাক্তার। আমার মূল্যায়নের কি দাম আছে! তার উপর মাত্র একটি দিন, শুধু সকালের নাস্তা দেখে, ৯০% বাদামী উপভোক্তাদের সাথে , একবার প্রাতরাশ করে কোন মন্তব্যই করা উচিত নয়। অবশ্য এখন আমার এরকম পরপর বার দিন দেখার বিরল অভিজ্ঞতা হয়েছে। যাই লিখি, ঐ বারো দিনের চোখে দেখা নিরীক্ষণ থেকেই ছাপার হরফ হয়ে দেখা দেবে। (ছবি যোগ করতে গিয়ে দেখছি প্রায় সবই ভিডিও তোলা হয়েছে। আমাদের ওয়েব সাইটে ইউরোপ ভ্রমণ নিয়ে ডজন খানেক ইউ টিউব ভিডিও পেয়ে যাবেন ,www.dayalbandhu.vip দেখুন।)

প্রায় সব বাদামী উপভোক্তা

প্রথমেই একটি অনেষ্ট কনফেশন দিয়ে রাখি। আমার পরিবার বহু বছর আগে থেকেই স্বল্পাহারি। সে তো আমাদের টিংটিংয়ে চেহারা দেখে সবাই বোঝে। আমার এক বন্ধু , স্টেনালাইন জাহাজের ডেকে আমাদের ছবি দেখে অকপটে লিখেছেন, ভালো করে ধরে থাকুন স্যার! রোগা পটকা মানুষদুটিকে সমূদ্রের বাতাস উড়িয়ে নিতে পারে, এই আশঙ্কা আর কি! এদিকে যখন থেকে রেল গাড়ীতে বা মেট্রোতে বরিষ্ঠ নাগরিকের তকমা পেয়ে গেলাম, আমার স্ত্রী খাদ্য পানীয়ের ব্যাপারে একেবারে চাবুক চালাতে শুরু করেছে। এত কথার মারপ্যাচে না গিয়ে সরাসরি বলি; আমরা বেশ পেটরোগা লোক। খাই খুবই কম। একটু অনিয়ম হলে হজম করতে পারি না। এই একটু আগেই, মিশনের মহারাজ, ভাগবত পুরাণ আলোচনা করতে করতে, “ বৃকোদর” কথাটির অর্থ বললেন, “অনেক খেয়ে হজম করতে পারে।” আহা,

আমি তো আমার আশেপাশে কতোই বৃকোদর দেখি প্রতিদিন। সেই উত্তর বঙ্গের সরকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চাকরী করতাম যখন, তখন একটি চোখের শিবির থেকে ফেরার সময়, জেলার প্রোগ্রাম অফিসার দাসবাবু বলেছিলেন, ইটাহারের এক ধাবায় বসে চোদ্দটা তেলাপিয়া মাছ ভাজা খেয়ে রায়গঞ্জে ফিরেছিলেন। আমার কাছে সেই সময় ঐ দাশবাবু একজন " ভোজন বীর" হয়ে গেলেন। এবার বিদেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে এরকম কতো বৃকোদর দেখে চক্ষু সার্থক করে নিলাম। আমরা সাধারনত নিমন্ত্রন বাড়ীতে গেলে, ভোজন রসিকদের দেখে পুলকিত হয়ে যাই।

স্যালাড, কাটাফলের পাশে, ক্ষীর, ইয়োগার্ট আর তৃতীয় অবতারের সহাবস্থান

লন্ডনের সেই হোটেলে আমাদের দলের সবাই প্রায় একসাথেই প্রাতরাশের হল ঘরে ঢুকেছিলাম। এই সব দলে ভ্রমণের এটাই দস্তুর। হোটেলে ঢোকার সময়, ট্যুর ম্যানেজার হাতে হাতে ঘরের চাবি দেওয়ার সময়ই বলে দিচ্ছিল, কোন দিকে প্রাতরাশের ঘরটি, সকালে কটা থেকে শুরু হবে। আমাদের কটার মধ্যে ব্যাগপত্র নিয়ে নীচে লবিতে এসে হাজির হতে হবে। বাস কটায় ছাড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাও কি সবই নিয়ম মত চলে! কেউ কেউ একেবারে ব্যাগপত্র গুছিয়ে যখন প্রাতরাশের জন্য নামছেন, আমরা তখন ও কাজ মিটিয়ে আবার ঘরের দিকে ফিরে চলেছি। এবারের যাত্রায় ১২ টি হোটেলের এগারটিতেই প্রাতরাশ দেখে ছবি তুলে আনার মতোই। আমরা দল বেঁধে হৈ হৈ করে সব কাজ করতে পছন্দ করি। দুই চারজন সাদা সাহেব যে এদিক ওদিক বসে নীরবে ডান হাতের কাজ সেরে নিচ্ছেন, আমাদের যেন চোখেই পড়ছে না। খাদ্য পানীয়ের এরকম বিপুল আয়োজন আমি দেশের কিছু কিছু বড় হোটেলেও দেখেছি। কিন্তু এরা বোধহয় বৃকোদর আর বক রাক্ষস দুজনকেই পেট ভরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে রাখতে চেয়েছে।

আমি তো এসব জায়গায় কি কি ফলের আয়োজন করা হয়েছে, আগে গিয়ে সেই সব দেখি। চার পাঁচ রকমের কাটা ফল আর আঙ্গুর একটা পাত্রে রাখে। শুধুই আনারসের রসে ডুবে যায় নাকি কিছু তরলও ঢালে জানি না। এদের আবার চার পাঁচ রকমের গোটা ফল রাখাটা দস্তুর। এই লন্ডনের হোটেলের ফলের সম্ভারে উজ্জ্বল লাল আপেল স্বমহিমায় বিরাজ করছিল। এত বড় আপেল আমি কোলকাতা কেন, কাশ্মীরেও দেখিনি। পরে বাকী সব হোটেলেই সবুজ আপেলই দেখেছি, লাল ছিল না।

সবুজ আপেল আর কালো কলা আমার চেনা

সব হোটেলেই আপেল আর কমলা লেবুর রস পেয়েছি। কোথাও কোথাও আনারস বা অন্য কোন ফলের রসও পেয়েছি। ইউরোপের কমলা বা ঐ জাতীয় কোন ফলের যে রস সব হোটেলেই রাখে, সেগুলি একটু কষাটে ভাব থাকে। অনেকেই গ্লাশ ভরে নিয়ে ফেলে রেখেছে। একটি হোটেলে কালো কলা দেখে আমি পরীক্ষা করতে একটি নিয়ে দেখি, ভালো পাকেনি; ফেলে দিতে হল। চা কফির কথা তো আগেই বলেছি। ইয়োগার্ট অর্থাৎ ঐ সব দেশের বিশেষ দই, প্রাতরাশ আর নৈশভোজের জন্য সব জায়গায় পেয়েছি। কোথাও কোথাও দই এর সাথে স্ট্রবেরি বা অন্য কিছু মিশিয়ে তিন চার রকমের দই এর ব্যবস্থা। আমরা বাড়ীতে সকাল দুপুরে সাদা দই খাই। রাত্রে সাধারণত খাই না।

জাহাজের প্রাতরাশে ইয়োগার্ট ও কাটা ফল

সেই প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, কলেজের দিনগুলিতে এক দাদা বলেছিলেন, আয়ুর্বেদিক মতে, “ ন নক্তৌ দধি ভুঞ্জিতাম” অর্থাৎ রাত্রে দই খাওয়া বারণ। এক যুগ আগে, ভেলোর মেডিক্যাল কলেজের এক অনুষ্ঠানে গিয়ে, শেষ রাত্রে, শহরের এক রেস্তোরাঁয় খেতে নিয়ে গেছল আমাদের চার - পাঁচ জনকে। আমাদের প্রনম্য বাভাসকার স্যারও ছিলেন। ঐ রকমের পৃথিবী বিখ্যাত একজন মানুষের সাথে একসাথে দু'দিন ঘুরেছি, সেই শ্লাঘণীয় ঘটনা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। সেই রাত্রে খাওয়ার তালিকায় ‘ কার্ড রাইস ‘ ছিল। তখন আমার ঐ রাত্রে দই খাওয়া বারণ কথাটা শুনে, আর এক বিখ্যাত ডাক্তার, বন্ধুবর দিলীপ পুণে বলেছিলেন, “ রাত্রে কোন সাদা খাদ্যই খাওয়া উচিত নয়!” অর্থাৎ ভাত, দই, চিনি, লবণ সবই রাত্রে না খাওয়া ভালো। কিন্তু অনেক বয়স্ক ডাক্তারবাবু রাত্রে দুধে ভিজিয়ে খই খাচ্ছেন দেখেছি।

আবার আমি আপনাদের লণ্ডনের হোটেল থেকে কোথায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছি। প্রাতরাশের আয়োজনে প্রাণীজ প্রোটিন বললেই ডিম এর কথা আসে। ওখানে সেদ্ধ ডিম সব হোটেলেই ছিল। কিন্তু

আমরা যাকে ওমলেট বলি সেই জিনিস কোথাও ছিল না। আমি একটি নতুন ডিমের পদ দেখে খেয়ে দেখলাম, ভালো। ওটার নাম আমার কন্যা বলল, ‘ স্ক্র্যাম্বলড এগ্ ‘ I দুই একটি হোটেলে একটু অন্যভাবে তৈরী ডিমের পোচ খেয়ে দেখেছি, খারাপ না।

Scrambled Egg & Pork (Red meat).

কিন্তু প্রায় সব হোটেলেই ভগবানের তৃতীয় অবতারের নানান পদ থরে থরে সাজানো দেখেছি। আহা, নয়নাভিরাম। কিন্তু ঐ প্রাণীটিকে আমাদের দেশে যেভাবে নর্দমার পাঁকে পড়ে থাকতে দেখেছি; কোন দেশেই, কোন অবস্থায় ওর মাংস আমার খাদ্য বস্তু মনে হয়নি। ঐ সব হোটেলেই দেখলাম, কি ভাবে রান্না করেছে জানি না, রং একেবারেই টাটকা কাঁচা মাংসের মত। কাঁচা শুকরের মাংস কথাটা এলেই আমার সেই পঁচিশ বছর আগে, রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে কাজ করার সময়-এর একটি লাশের কথা মনে পড়ে। লাশ কাটা ঘরে, অনেক বয়জ্যেষ্ঠ ডা ঘোষের সাথে, কয়েকটি লাশ এর ময়না তদন্ত করতে গেছলাম। একটি যুবক, কাঁচা শুকরের মাংস দিয়ে মদ খেয়ে, বেঘোরে মরেছিল! ডাক্তারী জীবনে অনেক পচা গলা লাশ দেখলেও, ঐ বিশেষ লাশটির কথা ভুলতে পারিনি। মাফ করবেন, সুন্দর সুন্দর খাদ্যের গল্প করতে করতে আপনাদের একেবারে লাশ কাটা ঘরে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। কি করি বলুন; ঐ বিশেষ খাদ্যটি দেখলেই যে আমার মন চলে যায়, সেই রায়গঞ্জের হাসপতালে। প্রায় সব হোটেলেই প্রাতরাশের আয়োজনে বেশ কিছু চিজের পদ রাখা ছিল। আমি সন্দেশ ভেবে একটি প্লেটে করে নিয়ে বসেছি দেখে,

আমার কন্যা সাবধান করে দিল। বলল, ওটা কিন্তু চীজ, একটু আগে মুখে দিয়ে দেখ , খেতে পারবে কি না। সত্যিই অতি বিস্বাদ, খড় পচা গন্ধ। সব হোটেলেই একটি জিনিস থাকতো; মেয়ের কাছেই নাম জেনেছি " ক্রোসান্ট"; বান রুটি আর বিস্কুটের মাঝামাঝি একটি স্বাদ। আমি একটি করে খেয়ে দেখেছি। দলের কেউ কেউ তিন চারটি করেও খেয়েছেন।

গোটা ফল নিয়ে একটি গোটা পর্বই লিখতে হবে। আজ এখানে শেষ করছি। ইউরোপ ভ্রমণ এর তৃতীয় পর্ব ইউটিউব ভিডিওটি দিন দুই এর চেষ্টায় শেষ হওয়ার মুখে। ওটা এখন ইউটিউবে ওঠানোর চেষ্টা করি। আজ ১০.৬ ২৫. একটু আগে বন্ধুবর যোগেশ জানাল, ওর সাথে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ডাক্তারবাবুর দেখা হয়েছে আজ। ওনারা আর একটি বিখ্যাত কোম্পানির সাথে ইউরোপে ঘুরে এসেছেন, কয়েক বছর আগে। টাকা আমাদের থেকে বেশি খরচ হয়েছে। হোটেলগুলো ভালো ছিন না। আমাদের কোম্পানী কোন হোটেল খারাপ দিয়েছে, এমন বদনাম অতি বড় উন্নসিকেও দেবে না।

বিদেশ ভ্রমণ ৯

আমার মত গেঁয়ো ডাক্তার এর প্রথম বিদেশ ভ্রমন-এর কী সাংঘাতিক অভিঘাত, বুঝতেই পারছেন। যা দেখি তাতেই চোখ কপালে উঠে যাচ্ছে। আরে মশাই দামি হোটেলের প্রাতরাশ ঐ রকমই হয়; তাই নিয়ে এতো লেখার কি আছে? তা ঠিক। আমিও দেশের মধ্যেই ঐ রকম হোটেলে দুই-চারবার ঢুকেছি। আসলে আমার সহৃদয় পাঠকেরা যে যা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, তাই নিয়েই কিছু লেখার ইচ্ছা হয়েছে।

এবার একটু ভ্রমণের গল্প করি। লণ্ডনের সেই শহরতলীর হোটেলে সকালেই পেটভরে খেয়ে নিয়ে আমরা ব্যাগ পত্র গুছিয়ে, ঘর খালি করে নেমে এলাম। আমাদের সাদা বাস হোটেলের বাইরে আসতেই আমরা সবাই নিজের নিজের ট্রলি ব্যাগ নিয়ে বাসের পাশে রাখলাম।

তল্পি গুটিয়ে হোটেলের লবিতে

এই সাদা Raf Trans লেখা বাসের ড্রাইভার ছেলেটি আমাদের এখানকার যে কোনো সিনেমার নায়কের থেকে ভালো চেহারা। মুখে কোন কথা নেই। মিনিট চার পাঁচেকের মধ্যে আমাদের একত্রিশ জনের , গোটা পঁয়ত্রিশ ব্যাগ, বাসের পেটে চালান করে দিল। পরের দশ এগারো দিন ধরে ও এই একই কাজ করে গেল। এদিকে ম্যানেজার পবন মাথা গুণে দুই জন কম দেখে, দৌড়ে গিয়ে হোটেলে ঢুকল। দুজনকে বোধহয় হোটেলের ঘরে ঢুকেই টেনে এনেছে। আমাদের যা যা দেখার আর যে যে সময়ে দেখার, তার থেকে পাঁচ মিনিট দেরী করলে মুশকিল। যারা ভবিষ্যতে এইরকম কোন বিদেশে ভ্রমণ করতে যাবেন, এই সব খুঁটি নাটি নিয়ম মেনে চলতে হবে, এটা মাথায় রাখবেন। সকালে উঠে স্নান সেরে নিচে প্রাতরাশের ঘরে যাওয়া। তারপর আবার রুমে ফিরে ব্যাগ গুছিয়ে নেমে আসা, এ প্রায় প্রতিদিনের কাজ। আমার মত ভোরে ঘুম থেকে ওঠা লোকের কোন অসুবিধা নেই। আমি তো প্রতিদিনই ভোরে

উঠে, হোটেলের Wifi ব্যবহার করে ঘন্টা খানেক কাজ করতে পেরেছি। নিয়ম মত চললে অনেক সময় থাকে। কিন্তু প্রায় দিনই কেউ না কেউ দেরী করে ফেলছিলেন। তাছাড়া রাস্তায় হয়তো কিছু একটা দেখে এক ঘন্টা পর নির্দিষ্ট জায়গায় বাসে এসে সকলে ওঠার কথা। কেউ হয়তো কোন দোকানে ঢুকে গেল। ব্যাস , দল ছাড়া। পবনের মাথা খারাপ; ও বেচারা দৌড়ে খুঁজতে গেল।

যাই হোক, মিনিট পনের দেরী করে আমরা রওনা দিলাম। বাস চলতে শুরু করতেই রাস্তার বাম দিকে দেখি হিথরো বিমান বন্দর। কতো নাম শুনেছি। ভেতরে ডজন ডজন এরোপ্লেন দাঁড়িয়ে আছে। এবার আমরা হিথরোতে ঢুকিনি। অনেকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা মাঠ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে ঝকঝকে রাস্তা চলল। তারপর একসময় লণ্ডন শহরের মধ্যে ঢুকে গেলাম। পবনের সাথে যোগাযোগ করে , আমাদের লণ্ডনের গাইড একটি রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছিল। ওর কাছে বাস দাঁড়াতেই উঠে এল।

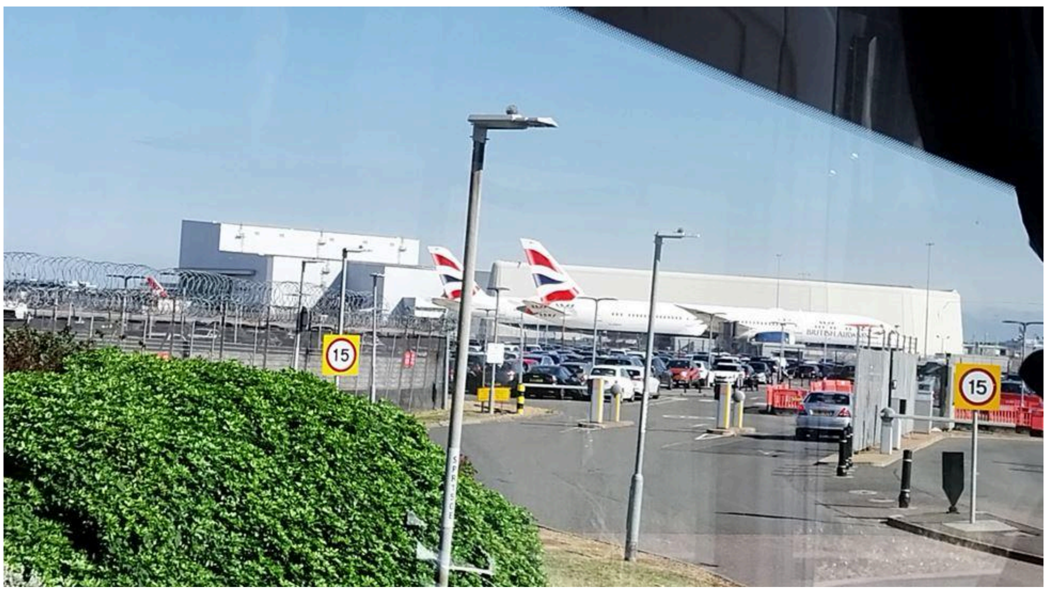

বাস থেকে দেখা হিথরো বিমান বন্দর

আমাদের বাসে একটি মাইক্রোফোন ছিল; পবন তাতে করে অনেক কিছু ঘোষণা করেছে, অনেকবার, প্রতিদিন। লম্বা রাস্তায় চলার সময় কেউ কেউ গান গেয়েছে, কেউ কবিতা, কেউ জোকস্ বলে সকলকে মাতিয়ে নিয়ে চলেছে। লন্ডনের গাইড সেই মাইক হাতে নিয়ে প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে, নিজের কাজ করতে শুরু করেছে। অনেকটা আমেরিকান টানে ইংরেজি বললেও এর কথা আমি মোটামুটি বুঝেছি। আমার লণ্ডন ভ্রমণের ভিডিও ইউটিউবে দেখলে এই গাইড , আর প্যারিসের গাইডের বলা কথা কিছু কিছু শুনতে পাবেন। লণ্ডন শহরের রাস্তায় একেবারে কলকাতার মত পিলপিল করে লোক হাঁটতে দেখা যায় না। দুই একটা গলিতে বেশ ভিড় দেখেছি। গাইড বাসে বসেই রাস্তার দুই দিকের বেশ কয়েকটি বাড়ী সম্বন্ধে বলে বলে চলেছিল। আমার মনে হয়েছে, লণ্ডনের রাস্তায় কলকাতার মত এত বেশী গাড়ী না থাকলেও যথেষ্ট গাড়ী চলে। কিন্তু রাস্তা বেশ চওড়া। আর লোকজন, গাড়ীর চালক অত্যন্ত সুশৃঙ্খল;

তাই আমাদের বাস বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে থাকল। লন্ডন আর প্যারিস শহরে অনেক লাল দোতলা বাস চলাচল করতে দেখলাম। বড় হাইওয়েতে তো নয়ই, শহরেও সেরকম গাড়ীর হর্ন আমি শুনিনি। এই গাড়ী চলাচলের শৃঙ্খলার জন্যই আমাদের বাস যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তে পারেনি। তাই বিখ্যাত হাইড পার্ক আমরা বাসে বসেই দেখলাম। শহরে অনেক অনেক ছোট বড় পার্ক আছে। আর শহরের রাস্তার পাশে পাশে অজস্র সবুজ গাছ। অনেক ছোট বড় চিনার গাছ আছে। কিন্তু কাশ্মীরে যেমন দেখা যায়, সেরকম বিশাল বিশাল মহীরুহ কোনোটাই নয়।

পার্লামেন্ট স্কোয়ারে চিনার গাছের ছায়ায় গান্ধিজী

পার্কের ঘাস আর রাস্তার পাশের গাছ, সব ঝকঝকে সবুজ। সম্ভবত প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলেই কোথাও ধুলো নেই। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল, যে দেড় দিন লন্ডনে আর একদিন প্যারিসে ঘুরেছি কোন সময় বৃষ্টি পাইনি। আমরা গাইডের পরিচয় করিয়ে দেওয়া বাড়ী, জায়গা, দূতাবাস এসব দেখতে দেখতে এক সময় পিকাডিলি সার্কাস পেরিয়ে গেলাম। এটা আমাদের পার্কসার্কাসের মত কয়েকটা রাস্তার সংযোগস্থল। কিন্তু পার্ক সার্কাসের মত অতগুলি রাস্তা বোধহয় নেই, তাই মাঝের জায়গাটা অতোটা বড় নয়। গাইডের মতে এই পিকাডিলি সার্কাসের আসেপাশে যত থিয়েটার হল আছে, পৃথিবীর আর কোন শহরে তেমন নেই। সপ্তাহ শেষে আঁতেল লোকেদের মেলা বসে যায়। আমরা গোটা দশেক দেশের যে গোটা পনের বড় শহরে ঘুরেছি, কোথাও " হকার ফুটপাথে " ঘরবাড়ী বানিয়ে বসেনি। কিন্তু

লণ্ডন সহ বেশ কিছু শহরের ফুটপাথে খোলামেলা রেষ্টুরেন্ট দেখেছি। নিশ্চয়ই এই গ্রীষ্মকালে এসব দেখা যায়। যখন বরফ পড়ে তখন নিশ্চয়ই এসব থাকে না।

পিকাডিলি সার্কাস

আমরা লণ্ডন শহরের মধ্যে প্রথম যে জায়গায় থেমে বাস থেকে নামলাম, সেটা ট্রাফালগার স্কয়ার। বাস থেকে নেমে একশ মিটার মত হেঁটে গিয়ে পেলাম; রাস্তা থেকে গোটা দশেক সিঁড়ি নেমে একটা ফুটবল মাঠের মত, পাথর বাঁধানো জায়গা। মাঝে একটি ফুট তিরিশের স্তম্ভ। অনেকটা আমাদের অশোকস্তম্ভের মত। কিন্তু মাথায় কিসের মূর্তি বা চিহ্ন রয়েছে ঠিক বুঝলাম না। স্তম্ভের বেদী বেশ উঁচু করে বাঁধানো; চার কোনায় চারটি কালো সিংহ মূর্তি। একদিকে একটি ফোয়ারা; জলে গোটা দুই রঙ্গিন হাঁস সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। ওখানে কিছু ছবি তুলে আমরা বাসে ফিরে এলাম। এই বাস থেকে নেমে বা ফিরতে যেখানেই রাস্তা পার হয়েছি, সিগন্যাল সবুজ হলে, জেব্রা ক্রসিং ধরেই সকলে চলছে দেখেছি।

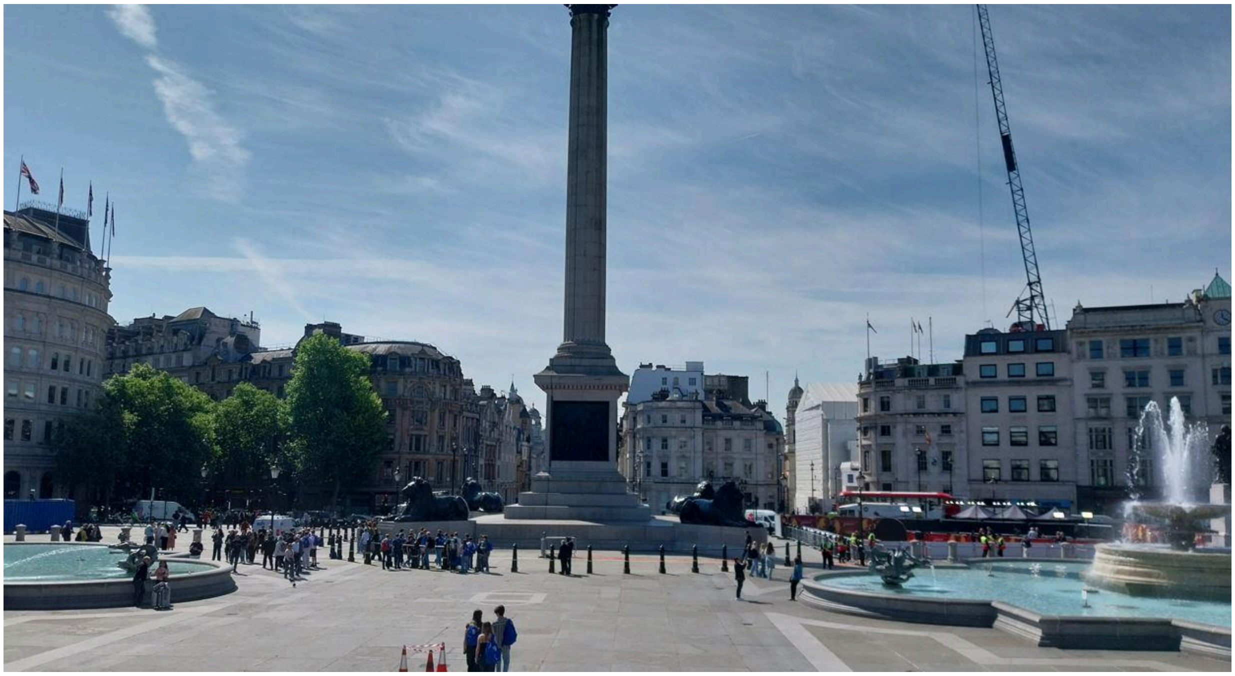

ট্রাফাল্গার স্কোয়ার

আমরা এরপর চললাম , বাকিংহাম প্যালেস দেখতে। মাঝে চলতে চলতেই একটি বাড়ী দেখিয়ে গাইড বলল, ওটা প্রধান মন্ত্রীর বাসস্থান। আশেপাশের অন্য বড়, পুরাতন ধাঁচের বাড়িগুলির মতোই দেখতে। কিন্তু একটি জিনিস বলার মত। গাইড বেশ মজা করেই বলল, এই যে দেখছেন, কিছু লোক প্লাকার্ড হাতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এটা এই বাড়ীর প্রতিদিনের দৃশ্য।

বিক্ষোভ প্রদর্শন

বাকিংহাম প্যালেস একসময় প্রায় তিনভাগ পৃথিবীর রাজবাড়ী। এখনও দেখলাম , বেশ লোকজন দেখার জন্য গেটের সামনে হাজির হয়েছে। আমরাও তো তিরিশজন লোক , হাজার হাজার মাইল দূর থেকে, লাখ লাখ টাকা খরচ করে ওদেশে গিয়ে ঐ রাজবাড়ীর সামনের ভিড় করেছিলাম! ওরকম বা ওর থেকে আরেকটু বেশি গুরু গম্ভীর রাজ বাড়ী আমাদের দেশে অনেক আছে। আর আমরা সেই সব বাড়ী পয়সা খরচ করে দেখতেও যাই। গাইড আমাদের ঐ বাড়ীর ওপর ওড়া একটি পতাকা দেখিয়ে বলল, এর মানে এখন রাজা এই বাড়িতে নেই। রাজা যখন আসেন, তখন দুটি পতাকা থাকে। একটি রাজার, আর একটি ইংল্যান্ডের সরকারী পতাকা। আরও একটি লক্ষণ হল, এখন দুই জন লাল পোশাকের দারোয়ান আছে; রাজা থাকলে চারজন থাকে। ঐ বেশ জমকালো পোশাকের দারোয়ান এর ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তন হয়। এই বাড়ী এখন আসলে রাজার আপিস। উল্টোদিকে, শ দুই মিটার দূরের, গাছ পালায় ঘেরা সাদা রঙের বাড়ীতে রাজা বাস করেন। প্যালেসের সামনের চওড়া রাস্তার রং কালো নয়, লাল। এটাও রাজাকে বিশেষ মর্যাদা দিতেই অন্য রঙের করা হয়েছে। কিছু ছবি তুলে আমরা ফেরার রাস্তা ধরলাম। ঐ রাজবাড়ীর ভেতরে ঢুকে ঘুরে দেখানোর কি একটা ব্যবস্থা আছে। সম্ভবত আগে থেকে বুকিং করতে বা টিকিট কেটে রাখতে হয়। আমাদের ট্যুর কোম্পানিকে ধন্যবাদ যে, আমাদের ঐ বাজে কাজে সময় দিতে বাধ্য করা হয়নি।

বাকিংহাম প্যালেস ও চার লাল দারোয়ান

এরপর আমরা লণ্ডন শহরের আর একটি বিখ্যাত জায়গা ঘুরে দেখেছি। আর দেখেছি দুটি মনোরঞ্জন এর জায়গা। দুটিই খুব বিখ্যাত। ওদের নিয়ে পরের পর্বে লেখা যাবে। যে বিখ্যাত পার্কের মত জায়গা এরপর আমরা দেখতে গেলাম, সেই মাঠের পাশে আমাদের শ্রদ্ধার মহাত্মা গান্ধীর একটি মূর্তি আছে। আমি আগেরদিন দুপুরে, লণ্ডনের মাটিতে পা দিয়ে কয়েকজনকে বলেছিলাম, এই হল "মাই ফার্ষ্ট ভিজিট টু লণ্ডন!" অনেকেই ভুলে গেছেন। আমরা ১৯৭৭ -৭৮ সালে, নতুন এগারো বারো ক্লাশে পড়ার সময়, মহাত্মা গান্ধীর ঐ শিরোনামে লেখা একটি ইংরেজী নিবন্ধ পড়তাম। এখন আর খুঁটিনাটি মনে নেই; শুধু এটুকু মনে আছে, গান্ধীজী প্রথমবার লণ্ডন দেখে খুবই হতাশ হয়েছিলেন। জানিনা উনি ঠিক কি মানসিক অবস্থা নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু খুবই খোলা মনে

লণ্ডন দেখতে গেছলাম। আমি হতাশ হইনি। পরের পর্বে লিখে জানানো যাবে, একটি অতি বিখ্যাত জিনিস দেখে আমি অন্তত খুশী হতে পারিনি।

আজ ১১.৬.২৫. প্যারিসের বিশ্ব বিখ্যাত ল্যুভর বা ল্যুভ মিউজিয়ামের ভেতরে ঢুকে যা যা দেখে, ছবি আর ভিডিও তুলে এনেছি, তাই নিয়ে একটি ইউটিউব ভিডিও দিয়েছি, আজ। কিন্তু আমার পরিচিত প্রায় পাঁচ'শ লোকের তেমন আগ্রহ দেখছি না। ঠিক আছে, ভীম নাগের সন্দেশ সকলের ভালো না লাগতে পারে। পরের পর্বে অনেকটা গুড় ঢেলে দেব।

পতাকা হাতে লন্ডনের গাইড

বিদেশ ভ্রমণ ১০

লণ্ডন শহরে ঘুরতে ঘুরতে বাস আমাদের নিয়ে চলল, পার্লামেন্ট স্কোয়ারে। ছোট একটি সবুজ ঘাসের মাঠ ঘিরে রাস্তা। মাঠের পরিমাণ একটি ছোট ফুটবল মাঠের মত হবে। ঘাস দেখে মনে হল, ঐ মাঠে নেমে কেউ খেলে না। সবুজ মাঠ এর কথায় আমার একটি পুরনো দুর্বলতার কথা বলতে ইচ্ছা হল। আচ্ছা বলুন তো, বরফে ঢাকা পাহাড়, সুনীল সাগর, সবুজের ঢেউ খেলানো পাহাড়ের দৃশ্য, কতো মনোরম ভ্রমণ স্থানে তো আমরা বেড়াতে যাই। বাড়ীর সামনে কোন দৃশ্য দেখে আপনি সবথেকে খুশী হন? আমার উত্তর পরে দেব।

পার্লামেন্ট স্কোয়ার

এই মাঠের চারদিকে একটি চক্কর দিয়ে আমাদের বাস একটি জায়গায় নামাল। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পিছনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গাইড, বাস থেকে ঐ মূর্তি দেখালো। আমরা ভেবেছিলাম, বাস ওখানে দাঁড়াতে পারবে না, তাই জানালা দিয়ে মহাত্মার পিছন দিকের ছবিই তুলে নিলাম। পরে তো নেমে, অমরা মূর্তির সামনে গিয়েই দেখলাম। আরও জন দুই মহান মনুষের মূর্তি আছে; তার মধ্যে আমার চেনা, নেলসন ম্যান্ডেলা। মাঠের চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকা বিখ্যাত সব বাড়ী একে একে চিনিয়ে দিচ্ছিল গাইড। আমাদের সবার চেনা, বিগ বেন। ঘড়িতে তখন দুপুর বারোটা পাঁচ। গাইড জানাল, ঐ বিখ্যাত স্থাপত্যটির নাম বিগ বেন হওয়ার কথা। ওর উপরের দিকে বড় ঘন্টা আছে, ঘন্টায় ঘন্টায় বাজে। আমি কোন ঘন্টা দেখতে বা শুনতেও

পাই নি। ঐ বিগ বেন লাগোয়া ওদের পার্লামেন্ট বিল্ডিং। তার পাশে বিখ্যাত পুরাতন গীর্জা, ওয়েস্টমিনস্টার আবে। আমরা একটু দূর থেকে দেখে ছবি তুললাম। আমার পরিব্রাজক ডাক্তার দাদা বলছিলেন, ওর মধ্যে স্যার আইজ্যাক নিউটন, চার্লস ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীর সমাধী ফলক আছে। আমার দূর্ভাগ্য, এত কাছে গিয়েও দেখা হল না। আসলে ভ্রমণে গিয়ে কে কি দেখতে চায়, সেটা নিজেরা ঠিক করা যায় না। ট্যুর কোম্পানী বিভিন্ন দলের লোকজনের চাহিদা বুঝে একটা তালিকা তৈরী করে। তার উপর যদি, আমাদের যেমন প্রথমেই ঘন্টা তিন চার নষ্ট হয়ে গেলো, সেরকম হলে অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী আর নেলসন ম্যান্ডেলার মূর্তি দুটির পিছন দিকে ওদের সুপ্রীম কোর্ট এর বাড়ী। আমাদের দিল্লীর সুপ্রিম কোর্টের বাড়ী যেমন অনেকটা বড় বাগান এর মধ্যে, এদের সেরকম নয়। প্রায় পাশের বাড়ির মতই একটা পুরোনো ধাঁচের গুরু গম্ভীর ভবন। মহাত্মা গান্ধীর বাম দিকে ইনকাম ট্যাক্স এর বড় বাড়ী।

আগের দিন আমাদের বিকেলের তিন ঘন্টার উপর নষ্ট হওয়ায়, আমরা লণ্ডন আই উঠতে পারিনি। আজ গাইডের সাথে ঘোরা শেষ করে আমরা চললাম, লণ্ডন আই। আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের মিনিট পনের আগে পৌঁছে দেখি, একেবারে মেলা বসে গেছে। লণ্ডন আই এর টিকিট কাটার ঘরের মধ্যে বিনা পয়সার শৌচালয় আছে। সকলে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিলাম। টিকিট কাটার জন্য বোধহয় গোটা দশ বারো, টিকেট ভেন্ডিং আছে। এখন যেমন আমাদের রেলের টিকিট কাটার জন্য স্টেশনে স্টেশনে ভেনডিং মেসিন আছে, অনেকটা সেই রকম। আমাদের টিকিট ট্যুর কোম্পানী থেকেই কাটা ছিল। আমরা সবাই ওঠার জন্য লাইন দিলাম। এখানেও বেশ সিকিউরিটি চেক করে দেখা হল। লণ্ডন আই একটি বিরাট নাগর দোলার মত। চারশ পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু। অন্তত পঁচিশ তিরিশটি ক্যাপসুলের মত , কাঁচে ঘেরা ঘরের মত। এক একটি ক্যাপসুলে কুড়ি জন মত মানুষ উঠতে পারে। আমরা গোটা তিনেক ক্যাপসুলে ভাগাভাগি করে উঠে গেলাম। ভেতরে জন পনের

লন্ডন আই নাগরদোলা

বসার মত ব্যবস্থা আছে। আমরা জন পাঁচ ছয়, যারা ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত ছিলাম, আমরা বসার চেষ্টাই করিনি। নাগর দোলার মত আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে এক পাক দিয়ে আসতে মিনিট পনের-কুড়ি লাগল। উপর থেকে নিচে লণ্ডন শহরের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেলাম। ঝকঝকে রোদ থাকায় আমাদের ছবি তোলার আর ভিডিও করার খুব সুবিধা হল। একেবারে উপরে উঠে, নিচে টেমস নদী, নদীতে চলা ক্রুজ, স্পিড বোট সব দেখতে ভালোই লাগল। আমাদের ঠিক উপরের আর নিচের ক্যাপসুলের ছবি সুন্দর ভাবে তোলা হল। আমি এর আগে কোথাও লণ্ডন আই এর ভেতর থেকে তোলা কোন ছবি দেখিনি। তাই এই জিনিসটির এত নাম শুনলেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না।

লন্ডনের সব বিখ্যাত বাড়ী বাইরে থেকে দেখে আর লণ্ডন আই চেপে, আমরা চললাম আর এক বিখ্যাত জায়গায়। মাদাম তুসো ওয়াক্স মিউজিয়াম। আমাদের দলের সবার টিকিট ট্যুর ম্যানেজার পবনের কাছেই ছিল। অন্য সব জায়গার মত এখানে ঢোকার আগেই , পবন বলে দিল, কত সময় ভেতরে থাকার জন্য বরাদ্দ। তারপর বেরিয়ে সকলকে কটার সময়, কোথায় অপেক্ষা করতে হবে। দলের সকলের সাথে আমরা লাইন দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। অনেক আলো আঁধারি ভুলভুলাইয়া , অলি গলি ঘুরে ঘুরে অন্তত গোটা চল্লিশ ঘরের মধ্যে দিয়ে চললাম। এক এক ঘরে চার পাঁচ জন করে নানা পেশার বিখ্যাত মানুষের মোমের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের দেশের অমিতাভ বচ্চন, শচিন তেন্ডুলকার ছাড়াও আর জন দুই অভিনেতার মূর্তি আছে। আমরা ভারতীয়রা চটপট ঐ সব ভারতীয় ব্যক্তির মূর্তির সাথে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে নিলাম। সবমিলে বোধহয় দুই আড়াইশ মূর্তি আছে। আমি তো জন পাঁচ এর বেশীকে চিনলাম না। আমার চোখে একমাত্র ফুটবলার এমবাপের মূর্তিটি অনেকটা জীবন্ত মনে হয়েছে। পেলে বা মারাদোনার মূর্তি দেখলাম না। ক্রিকেটেরও শচীন ছাড়া আর কারো মূর্তি নেই। শেষের দিকে একটি ট্যাক্সি রাইড আছে। অনেকটা আমাদের আটো রিক্সার মত, কালো কালো গাড়ী। এক একটিতে দুই তিন জনের বসার জায়গা। মেলায় যেমন বাচ্চাদের জন্য

মাদাম তুশোয় শচীনের সাথে

খেলনা ট্রেন থাকে, অনেকটা সেই রকম, পরপর অনেক কটা খেলনা গাড়ী, গড়গড়িয়ে চলল। সেই একই রকম আলো আঁধারি, ভুলভুলাইয়া পথে। পাশে পাশে নানান রকম কান্ড কারখানা দেখানোর জন্য নানান রকম মূর্তি। কোথাও পুরনো দিনের কল কারখানা চলছে, কোথাও ভূতের কান্ড। সেই মত নানান শব্দ ইত্যাদি। এরপর এলো একটি থ্রি ডি থিয়েটার। চশমার উপরে চশমা লাগিয়ে দেখা। বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের কান্ড কারখানা; আমি ছেষট্টি বছর বয়সে , লণ্ডন শহরে বসে সেই থ্রি ডি কার্টুন দেখে এলাম। এক ঘন্টার উপর এই সব হৈ হৈ কান্ড দেখে, অনেক ছবি - ভিডিও দেখে বেরিয়ে এলাম। গেটের বাইরেই অপেক্ষা করছিল, ম্যানেজার পবন। মিনিট তিন চার হেঁটে, গোটা দুই রাস্তা পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম একটি ‘কে এফ সি’ দোকানে।

আগের দিন দুপুরে লন্ডনে নামার আগে, প্লেনের মধ্যেই দুপুরের খাবার খেতে দিয়েছে। রাত্রে সেই ভারতীয় রেস্টুরেন্টে ভাত খেয়েছি, ভারতীয় সময় রাত পৌনে তিনটা নাগাদ। সকালে

হোটেলে বাস্তবেই পেট ভরে খেয়ে বেরিয়েছি। দুপুরে এক গাদা আলু ভাজা, একটু মুরগী মাংসের কাটলেট এর মত পেট ভরানো খাদ্য, আর কোকাকোলা। আমার পরিবারে গত বারো মাসে যত আলু কেনা হয়েছে, ইউরোপে এই বারো দিনে তার থেকে বেশী আলুভাজা খেলাম, আমরা তিনজনে। গত বারো বছরে যত ঠাণ্ডা পানীয় আমি খেয়েছি, তার থেকেও বেশী খেলাম এই বারো দিনে। এখানে অবশ্য সব কোকের গায়ে লেখা থাকে, জিরো ক্যালোরি। জানিনা আমাদের মত বাতিকগ্রস্ত লোকেদের জন্যও ওগুলি স্বাস্থ্যকর ছিল কি না। কি আর করা যায়; যষ্মীন দেশে যদাচার।

বাড়ীতে আনা ফ্রীজ ম্যগনেটগুলি

বাসের দিকে যাওয়ার সময় কারো একজনের খেয়াল হল, এইবার বাসে উঠে আমরা লণ্ডন ছেড়ে হল্যান্ডের দিকে চলে যাব। আসার পথে কেউ কেউ একটা দোকান দেখে এসেছিল; এক এক করে আমাদের অর্ধেকের বেশী লোক ঐ দোকানে ঢুকে গেল। মূলত স্মৃতি চিহ্ন অর্থাৎ মেমেন্টো কেনার জন্যই সবাই ঢুকেছে। বাড়ী ফেরার পর দেখেছি, আমার কন্যা সবকটি দেশ থেকে ফ্রিজ ম্যাগনেট কিনে এনেছে। ওগুলি আমার ট্রলি ব্যাগে ঢোকানোর সময় কথা হচ্ছিল, দেশের মধ্যে কতো জায়গায় ঘোরা হল , সেসব জায়গার কোন ফ্রিজ ম্যাগনেট কেনা হয়নি। এখানে এই “গেঁয়ো ডাক্তার” এর আর একটি দুর্বলতার কথা আপনাদের বলে দিই। আসলে এই

ছেষট্টি বছর বয়সে এক বিদেশ ভ্রমণ এর ধাক্কায় অনেকটা সাবালক হয়ে গেলাম। এই ফ্রীজে লাগানোর স্মৃতি চিহ্ন ব্যাপারটাই আমি জানতাম না। যত বেশি জানছি, ততোই জানছি, আমি কত কম জানি! তাই না হলে, এই লণ্ডন বা পিসার হেলানো টাওয়ার এর একটা ফ্রীজ ম্যাগনেট তিন বা পাঁচ ইউরো দিয়ে কিনে আনা হয়েছে, কাশ্মীর বা কন্যা কুমারীর ওরকম একটা একশ দেড়শ টাকা দিয়ে কিনতে তো পারতাম বটেই। হ্যাঁ, ঠিক এই জিনিস নয়, আমি এই বছরই কন্যা কুমারী থেকে, স্বামীজীর একটি ছোট্ট পিতলের মূর্তি এনেছি। ঠিক ঐ স্মৃতি চিহ্ন হিসেবেই। লণ্ডনের সেই দোকানে কেনাকাটার পর আমরা বাসে উঠে চললাম , প্রায় একশ মাইল দূরের বন্দরে ষ্টেনালাইন জাহাজে ওঠার জন্য।

আমাদের এখানে যেমন চারটে পাঁচটা বেজে গেলে আমরা বুঝি বিকেল হয়ে গেছে, আলো কমে আসে, সেদিন লন্ডনেও সেরকম যেন বিকেল হয়ে গেল। পথে পড়ল আমাদের সবার কাছে কতো চেনা লর্ডস ক্রিকেট খেলার মাঠ। বাইরে থেকে বিশেষ কিছু দেখার নেই। একটা সাধারণ রাস্তার পাশে আমাদের বাস দাঁড়াল। লণ্ডনের যে কোন রাস্তার মত ফুট পাথে অনেক সবুজ গাছ। সামনে একটা গেট দেখে আমরা একটু উঁকি ঝুঁকি দিলাম ; ছবি তুললাম। পবন বলল, বড় গেটটা একটু পিছন দিকে। সকলে ওর পিছন পিছন ফুটপাথ ধরে প্রায় একশ মিটার পিছিয়ে গেলাম। দুই পাঁচিলের কোনায় উঁচু দেওয়ালে, লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড খোদাই করা। ওর সামনে দাঁড়িয়ে কটা ছবি তুলে বাসে ফিরে এলাম।

লর্ডসের বাইরে

এবার টানা ছুটল বাস। একটু পরেই শহর ছাড়িয়ে প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলল চওড়া রাস্তা। শহর থেকে বেরিয়েই দেখলাম বেশ বেলা আছে। আসলে তখনও সূর্য ডোবার প্রায় তিন ঘন্টা বাকী। ঘন্টা দুই চলার পর কেউ কেউ শৌচালয় বা পানীয় জলের খোঁজ নিতে শুরু করায় একটি পেট্রোল পাম্পে বাস দাঁড়াল। কেউ কেউ ফাঁকা জলের বোতল নিয়ে পাম্পের সাথের দোকানে গিয়ে ঢুকল। আমি বাস থেকে নেমে দেখি শিরশিরে বাতাস দিচ্ছে, কান ঢাকা না দিল থাকা যাচ্ছে না। এক পাশে লাঙ্গল করা মাঠের মত বিস্তীর্ণ মাঠ। একটা ছবি তুললাম। পরে মনে হলো, একটা ক্যারি ব্যাগ থাকলে একটু ইংল্যান্ডের মাটি আনা যেত। কেন? কি কাজে লাগত? সত্যিই ভেবে দেখিনি। বছর খানেক আগে আমার মেজদি, বাবার জন্মস্থানে বেড়াতে গেছল। সেটাও এখন বিদেশ। এখন যারা সেই বাস্তু ভিটার বাসিন্দা, তারা সম্ভবত আমাদের বাবাকে দেখেনি। কিন্তু দিদিদের ওনারা বেশ খাতির করেই বাস্তু ভিটার চারিদিকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। যতদূর জানি, দিদি ঐ পূর্বপুরুষের ভিটার একটু মাটি প্যাকেট করে এনেছে। কি করতে? কি ভেবে? মানুষের আবেগ মানুষকে দিয়ে কত কিছু করায়! ভ্রমণ এর কথা লিখতে গিয়ে কি সব আবেগের কথা লিখছি। শেষ পর্যন্ত ওদেশের গোধূলী বেলায় আমরা বন্দরে ঢোকার জন্য গাড়ীর লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম, বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে দশ তলা জাহাজ। বড় বড় কন্টেনার ট্রাক জাহাজে উঠে নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। জাহাজের গল্প পরের পর্বে লেখা যাবে।

ইংল্যান্ডের চাষের মাঠ

আজ ১৪.৬.২৫. এই লেখা লিখতে লিখতেই দেখলাম, সেই লর্ডসের মাঠে, দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে, টেষ্ট ক্রিকেট এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হল। আমি কোনদিন টেষ্ট ক্রিকেট বা কোন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা দেখতে মাঠে যাইনি। টিভিতেই দেখি। ভালো লাগে। খেলার খুঁটিনাটি সব দেখা যায়, বারবার রিপ্লে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয় ; মাঠে গিয়ে ঐ হৈ হট্টগোল আমার ভালো লাগে না। একই ভাবে আপনাদের অনেকেরই মনে হতে পারে ; এত খরচ করে, এত দৌড় ঝাঁপ করে, দুপুরে আলুভাজা আর কোক পেপসি খেয়ে, সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে বিদেশ ভ্রমণ এর দরকার কী? আজকাল তো ঘরে বসে টিভিতেই সব দেখা যায়। ঠিকই। তফাৎ ঐ ঘরে বসে, বাথরুমে স্নান করা আর সমুদ্রে স্নান করার মধ্যে যে তফাৎ, ততটুকুই।

বিদেশ ভ্রমণ ১১

আমরা বাসে বসে বসেই, আমাদের প্রথম বড় জাহাজে ওঠার ব্যাপার স্যাপার দেখতে থাকলাম। এর আগে আমরা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণের সময় জাহাজে চড়ে এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাওয়া আসা করেছি। সেগুলি খুবই ছোট জাহাজ; মাত্রই দোতলা। এই স্টেনালাইন জাহাজটি বেশ বড়, দশ তলা। আমাদের বাস একটা ফুটবল মাঠের মত বিস্তীর্ণ বাঁধানো চত্বরে পৌঁছতেই একজন কর্মচারী এগিয়ে এসে, কোন লাইনে দাঁড়াতে হবে দেখিয়ে দিল। আমরা যে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম, সেখানে আগে সম্ভবত আর একটা বাস ছিল। আমাদের পাশে আরও গোটা তিনেক লাইনে , চার চাকার গাড়ী আর সাইকেলও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। হাইওয়েতে যেমন টোল গেট হয়, অনেকটা সেই রকম। আমাদের প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট ওখানে দাঁড়াতে হয়েছিল। ওখানে বাসে বসে বসেই, বাসের ডান দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকা ছোট গাড়িগুলি যেমন দেখছিলাম, তেমনি দূরে, জাহাজের পাঁচ ছয় তলায় কেমন করে বড় বড় কন্টেনার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তাও দেখছিলাম।

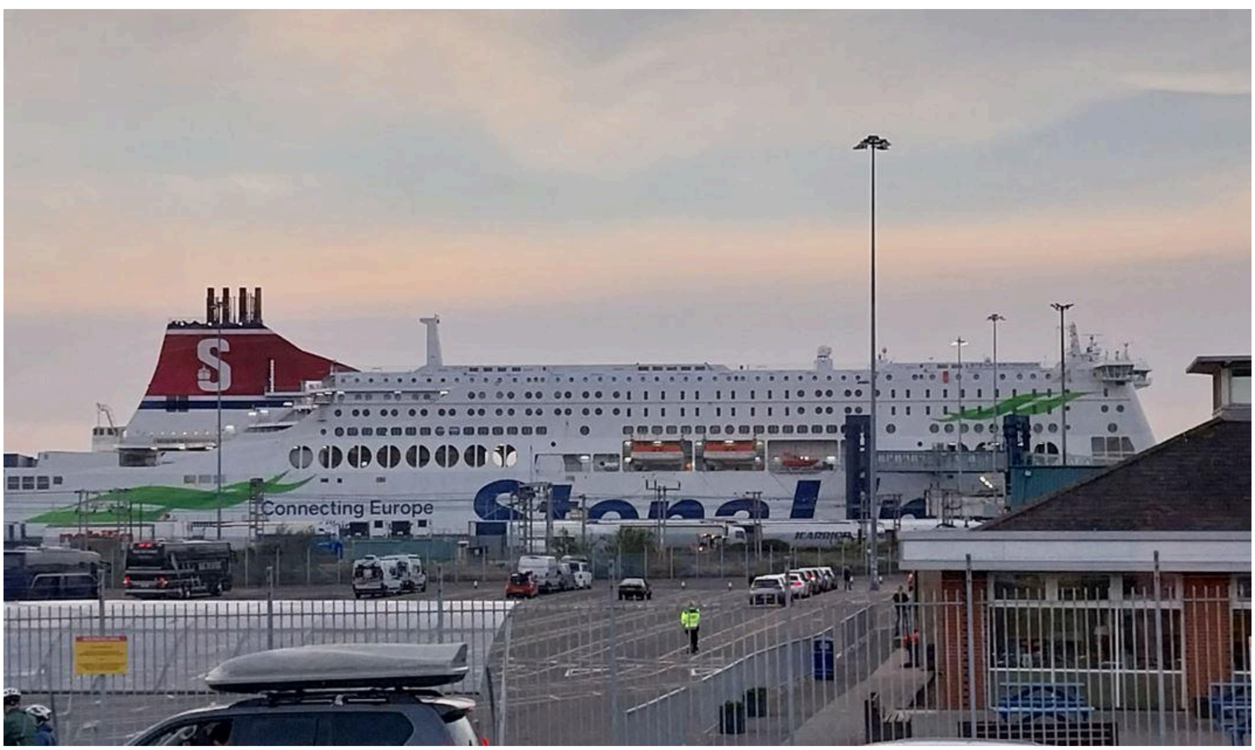

বাসে বসে দেখা ১০ তলা জাহাজ

চার চাকার গাড়ীতে পোষ্য কুকুর নিয়ে চলেছে কেউ। সাইকেলে সুন্দর করে বেঁধে নিয়েছে , হয়তো কয়েকটি দেশে ঘুরে আসার রসদ। মাঝে মাঝেই চার পাঁচ কামরার রেল গাড়ী সামান্য কিছু যাত্রী নিয়ে এসে কয়েক মিনিট পর খালি ফিরে যাচ্ছে। এক সময় একজন মহিলা কর্মচারী আমাদের গাড়ীতে এসে , ম্যানেজার পবন এর সাথে কথা বলল। পবন আমাদের সকলের পাসপোর্ট বের করে দিতে বলল। সেই

মহিলা আমাদের বত্রিশটি পাসপোর্ট নিয়ে, ঐ টোল আপিসের মত ঘরে গিয়ে ঢুকল। মিনিট পনের পরে আবার সব পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সম্ভবত ওখানে ওগুলি স্ক্যান করে নিয়েছে। এই সব কাজ মেটার পর আমাদের বাস এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেল। একটু এগিয়ে, ডান দিকে ঘুরে জাহাজের দিকে এগোতে সেই রেলের লেভেল ক্রসিং এ একবার দাঁড়াতে হল। তারপর বাস একেবারে জাহাজের পেটের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। কখন ডাঙা থেকে জাহাজে চড়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারি নি।

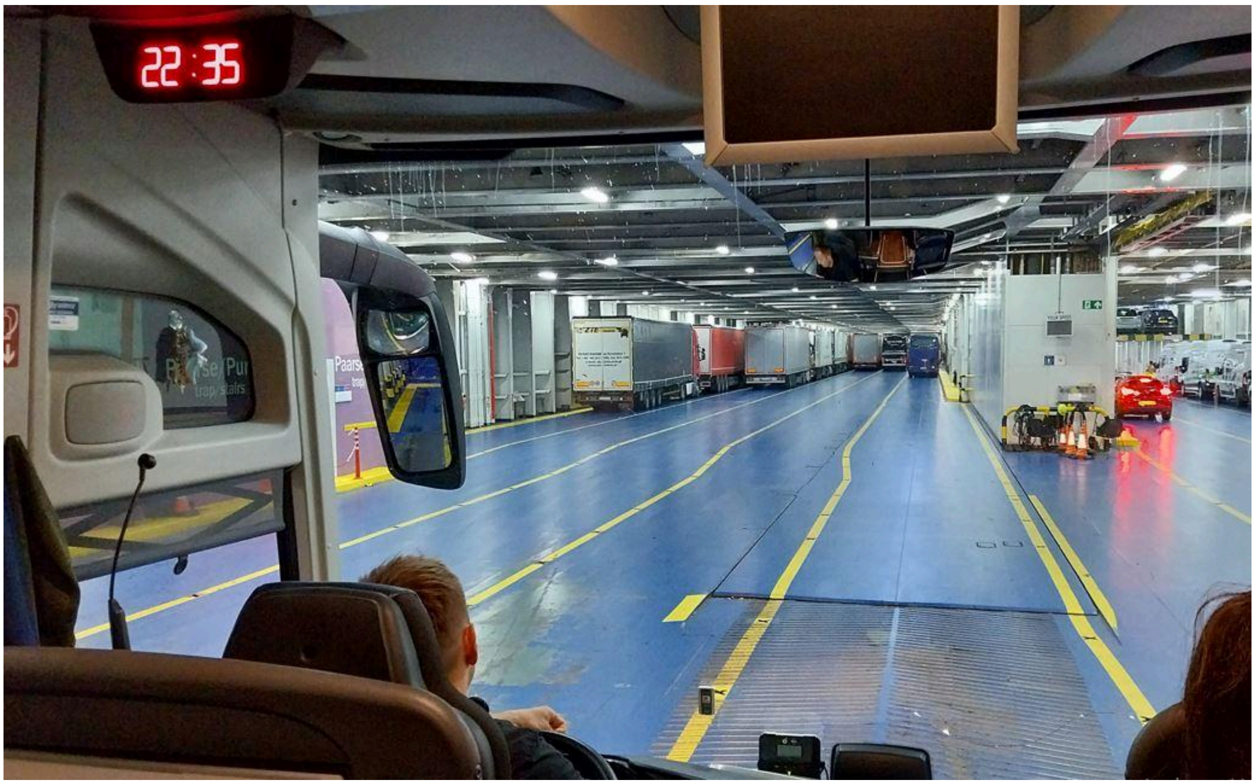

জাহাজের পেটে আমাদের বাস ও বড় বড় ট্রাক

পবন আমাদের বাস থেকে নেমে, জাহাজের এক কর্মচারীর পিছন পিছন যেতে বলল। গোটা দুই তিন তলা লিফটে উঠলাম। পবন আমাদের সকলের কেবিনের চাবির কার্ড মত, কাগজের চৌকো চৌকো কার্ড দিয়ে বলে দিল, যে যার কেবিনে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে, সাত তলায় খাওয়ার ঘরে চলে আসতে। আমরা কেবিনে গিয়ে পিঠের ব্যাগ রেখে, কেবিনের বিছানা, উপরের ব্যাংকে ওঠার সিঁড়ি, বাথরুম এসব দেখে, রাতের খাবার খেতে নেমে গেলাম। জাহাজের খাওয়ার হলঘরটি মোটামুটি তিন-চার শ লোকের ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসার মত একটি ঝাঁ চকচকে রেস্টুরেন্টের মত। আমরা বোধহয়, গো এভরি হোয়ার ট্রাভেল কোম্পানির দুটি বাসের , পঁয়ষট্টি সত্তর জন লোক, একদিকে বসে গেলাম। বিয়ে বাড়ীতে বুফে ডিনার যেমন হয়, সেই ভাবে নিজের নিজের প্লেট নিয়ে খাওয়ার তুলে নিলাম। রাত হয়েছিল; সকালে উঠে আবার ছটা বাজার আগে প্রাতরাশের জন্য নামতে হবে , তাই রাত্রে আর ডেকের

দিকে যাওয়ার কথা ভাবিনি। সোজা নিজেদের কেবিনে গিয়ে শুয়ে গেলাম। কেবিনের বিছানা, বাথরুম ইত্যাদি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর থেকে পঁচিশ গুন বেশি পরিষ্কার, আর আরাম দায়ক। ভোরে উঠে আমরা গরম জলে স্নান সেরে নিলাম।

জাহাজে আমাদের কেবিন, চারটি বিছানা

সকালে শুনেছি, কেউ কেউ ঐ রাত্রেই খোলা ডেকে গিয়ে ঘুরে এসেছেন। আমাদের রাত্রে খেতে বসার আগেই সম্ভবত, জাহাজ ইংল্যান্ডের বন্দর থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। রাত্রে নর্থ সী তে কি দেখা যায় আমার জানা নেই। যারা রাত্রে ডেকে ঘুরে গেছেন, তাঁদের আর জিজ্ঞেস করা হয়নি। তবে অনুমান করা যায়, রসিক মানুষদের কাছে, জাহাজের ডেকে বসে বসে দ্রাক্ষারসের বিশেষ স্বাদ নেওয়ার ইচ্ছাটাই আসল কারণ ছিল। আমরা সকালে প্রাতরাশের পর খোলা ডেকে গিয়ে আধ ঘন্টা মত ঘুরেছি। ডেক তখনও শিশিরে ভেজা। আমি ভোরে উঠে বুঝতে পারলাম যে, আমাদের মাথার কাছের একটু কম উজ্জ্বল আয়নাটি আসলে একটি কাঁচের জানালা। বাইরে শিশিরের বিন্দু বিন্দু জলে বেশ ঘোলা হয়ে ছিল। বাইরের ছবি ভালো আসেনি। এক সময় দেখলাম, ডান দিকে কোনা করে তাকালে সূর্য ওঠা দেখা যাচ্ছে। ডেকে গিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলাম, অনেক ছবি তোলা হল।

ডেকে আমি, পিছনে নর্থ সী

দূরে দূরে বেশ কিছু ছোট জলযান চলতেও দেখলাম। খাওয়ার ঘরের বড় বড় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সমুদ্র দেখা গেছে। ডান দিকে এক দেড় মাইল দূরে , পাড়ে অনেক উইন্ড মিল, বাড়ীঘর দেখা যাচ্ছিল। প্রাতরাশের সময়ই পবন আমাদের বলে দিয়েছিল, সাতটার সময় সব পিঠের ব্যাগ ইত্যাদী নিয়ে, সাত তলায় বসার জায়গায় জমায়েত করতে। আমাদের বড় ট্রলি ব্যাগ সকল, সেই সকালে লণ্ডনের হোটেলের বাইরে আমাদের বাসের পেটে চালান করে দিয়েছিলাম। একেবারে পরদিন রাত্রে, প্যারিসের হোটেলে গিয়ে আবার সব ট্রলি ব্যাগ নামানো হয়েছে।

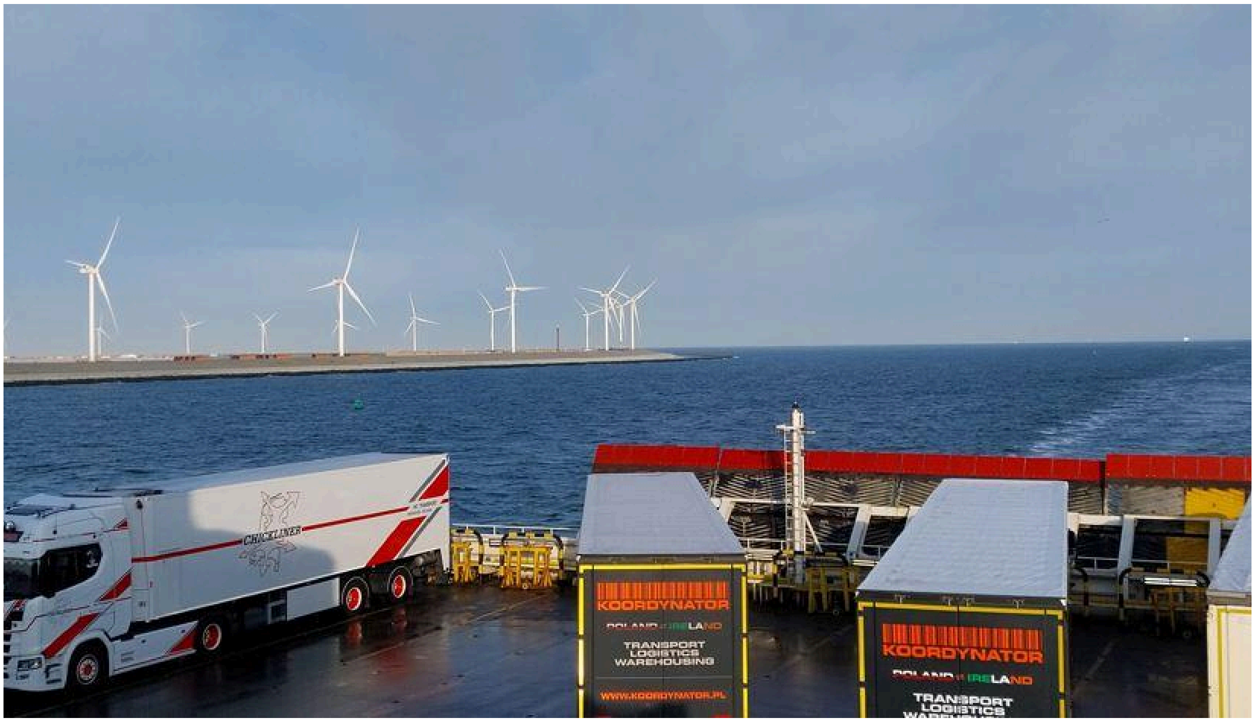

নিচের ডেকে বড় বড় ট্রাক, দূরে হল্যান্ডের উইন্ড মিল

সাতটার ঠিক আগে , কেবিনের মধ্যে বেশ মোলায়েম ভাবে ঘোষণা শোনা গেল, জাহাজ বন্দরে থেমে গিয়েছে, এবার যাত্রীরা নেমে যেতে পারেন। সাতটা বাজতেই সকলে জাহাজ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। নামার সময়ও তাই; কখন জাহাজ থেকে ডাঙায় চলে গেলাম, বোঝাই গেল না। একটা একশ মিটার মত করিডোর দিয়ে এগিয়ে, হল্যান্ডের অভিবাসনের জন্য দুটি লাইন করে দাঁড়ালাম।

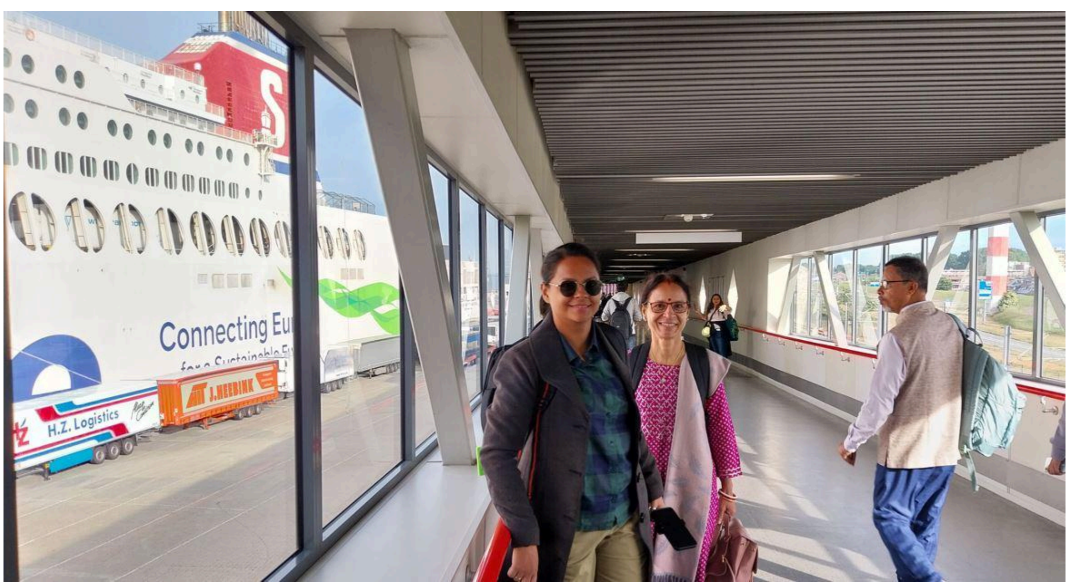

নামার পথে

পবন সহ একত্রিশ জনের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে মিনিট পনের লাগল। দুই জন ইমিগ্রেশন অফিসার -এর মধ্যে একজনের চেহারা এতোই সুন্দর যে, আমাদের দলের দেবাবু তাঁকে অনুরোধ করেন, একটা সেল্ফি তাঁর সাথে নেওয়ার। রসিক মানুষ আধিকারিক খুশী মনে, তাঁর খোপ থেকে বেরিয়ে এসে, দেবাবুর সাথে ছবি তুললেন। জীবনে এই প্রথম আমি ইমিগ্রেশন অর্থাৎ অভিবাসনের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে দেখলাম। কোলকাতা বিমান বন্দরে, লণ্ডনের গ্যাটউইকে, রোমে, হল্যান্ডের বন্দরে। আমার ধারণা ছিল, ব্যাপারটি বেশ জটিল। কিন্তু ভিসা পাসপোর্টে কোন গন্ডগোল না থাকলে, ব্যাপারটি যে এতোই সহজ, এবারই সেটা দেখে নিলাম। অন্য সব জায়গার অফিসার নির্বিকার মুখে কাজ করে গেলেন। কিন্তু হল্যান্ডের নাম না জানা এই ভদ্রলোক আমাদের দলের দুই এক জনের সাথে বেশ রসিকতাও করেছেন। দেবাবুর সাথে তোলা ওনার ছবিটি আমাদের এই ভ্রমণ দলের Whats App গ্রুপের কল্যাণে এখন আমাদের সকলের কাছেই আছে। ওনার সেই ছবি আমি আমার ইউটিউব ভিডিওতেও দিয়েছি।

শুধুই কোষ্ঠকাঠিন্য রুগীর মত মুখ করে বসে থাকা আধিকারকদের সাথে একজন হাসিখুশি মানুষের কতো তফাৎ, সেটা আমার সহৃদয় পাঠকেরা জানুন, এই লক্ষ্যেই এই কথাগুলি লিখলাম। পরে এই

লেখাগুলি যখন ই -বুক করে পাঠাবো, তখন ওনার ঐ ছবি অবশ্যই দেব। বিদেশে একরাত সমুদ্র যাত্রার সামান্য অভিজ্ঞতা আপনাদের জন্য লিখে জানালাম। ছবি আর ভিডিও দেখে দেখে আমাদের পড়ার অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। তবুও যে আপনারা কেউ কেউ পড়ছেন, পড়ে আরও পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন; সেই জন্যই পায়ে প্লাস্টার নিয়ে বাড়ীতে আটকা পড়ে, শুধু টিভি দেখে সময় না কাটিয়ে, এই সব ভ্রমণ কাহিনী লিখে কিছুটা হলেও সময় কাটাচ্ছি।

আজ ১৫.৬.২০২৫. সকাল থেকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। ক'মাস প্রবল গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসছে; খুশীর খবর। কিন্তু পায়ের প্লাস্টার কাটার আগে বোধহয় আর বাইরে বেরোতে পারব না। বাকী পর্বগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব, এটাই পাওনা।

বিদেশ ভ্রমণ -১২

হল্যান্ডের মাটিতে পা ফেলেই আমরা আমাদের প্রিয় সাদা রঙের বাসে উঠে বসলাম। ম্যানেজার পবন কিন্তু ঠিক হিসেব করে করে কোথায় বিনাপয়সায় শৌচালয় আছে তার খবর আমাদের দিয়েছে। হল্যান্ডের অভিবাসনের পর সুন্দর একটা হল ঘরের মধ্যে, ঝকঝকে চেয়ার বেঞ্চে আমরা কিছু সময় অপেক্ষা করেছি। পবন সেই সময় দেখিয়ে দিয়েছে, ওখানেই সুন্দর শৌচালয় আছে। কেউ কেউ পরের কয়েক ঘন্টার জন্য কিছুটা ওজন কমানোর জন্য সেই শৌচালয় ব্যবহারও করেছে।

হল্যান্ডের হোয়েক (Hoek) বন্দরে কয়েক মিনিটের অপেক্ষা

আমাদের এই বাসের পেটে ঢোকানো অবস্থায় থেকেছে আমাদের বড় বড় ব্যাগ ইত্যাদি। ড্রাইভার ঠিক কোথায় রাত্রে থেকেছে, বা কখন ডিনার করেছে, আমি দেখিনি। পরে কিন্তু সব জায়গায় ওকে আমাদের সাথেই ডিনার আর প্রাতরাশ করতে দেখেছি। হল্যান্ডের বন্দর এলাকা থেকে কখন সাধারণ বসতি এলাকায় ঢুকে গেলাম, বোঝার উপায় নেই। বেশ সাজানো গোছানো রাস্তা আর ঘরবাড়ী। অনেকটা লণ্ডন শহরের শহরতলীর মত। একসময় আমাদের বাসরাস্তার পাশে পাশে চলল একটি খাল। খালে ছোট ছোট যন্ত্র চালিত নৌকা। পরে এইরকম দেখেছি, ভেনিস এর কোন কোন জায়গায়। আধঘন্টা কি একটু বেশি হবে , চলার পর আমরা মাদুরোদাম

এর সামনের চত্বরে পৌঁছে গেলাম।

হেগ শহরের রাস্তা ঘাট, ঘরবাড়ি

আমাদের আগে আগেই, গো কোম্পানির আর একটি দল নিয়ে নীল বাসও পৌঁছে গেছে। আমরা নেমে একটু হেঁটে মাদুরদামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়ই দেখলাম , সুন্দর লাল রঙের ট্রাম চলে যাচ্ছে।

হেগের ট্রাম

আমি ভিডিও তুলে নিলাম। মূল গেটে ঢোকার আগে দুই পাশে দুটি পরিষ্কার জলাশয়। মানুষের সাড়া পেয়ে কয়েকটি বড় বড় মাছ সামনে এগিয়ে এল। এর মধ্যে আরও একটি বাস কখন এসে গেছে আমি খেয়াল করিনি। হঠাৎই গোটা এলাকাটা এক ঝাঁক শিশুর কলরবে মুখরিত হয়ে গেল। সম্ভবত কোন স্কুলের জন পঁচিশ বাচ্চা নিয়ে কয়েকজন শিক্ষিকা এসেছেন। বাচ্চারা সবাই মাছ দেখার জন্য একটি জলাশয়ের বাঁধানো পাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ল। ওরা মাঝে মাঝেই আনন্দে চিৎকার করে উঠছিল। মাদুরোদাম এর ভেতরে কি আছে আমার জানা ছিল না। কিন্তু ঐ শিশুদের উপস্থিতি আমার মনে এক নির্মল আনন্দের বন্যা বইয়ে দিল।

গেটের সামনে সকলে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হল। তারপর একে একে টিকিট দেখিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। এখানেও টিকিট কেটেছে ম্যানেজার পবন। ভেতরে গোটা তিনেক ফুটবল মাঠের মত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, গোটা হল্যান্ড দেশের একটি রেপ্লিকা তৈরী করা হয়েছে। খুব একটা নতুন মনে হল না। কিন্তু ঐ সব দেশের স্বাভাবিক নিয়মেই কোথাও এতটুকু অযত্ন নেই। ভেতরে পাহারা দেবার বা দেখাশোনা করার সেরকম কোন লোকজনও চোখে পড়ে নি। আমরা ঘুরে ঘুরে প্রায় সব কিছু দেখলাম। এত নিখুঁত ভাবে একটি গোটা দেশের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি তৈরী করা ব্যাপারটি কিন্তু খুব সহজ নয়। আমি একটি রাস্তার উপরে সেতুতে দাঁড়িয়ে নিচের রাস্তায় গাড়ী

চলাচলের ভিডিও তুলে নিলাম। পরে বাড়ীতে বসে দেখেছি; বলে না দিলে ওটা যে কোন বড় রাস্তার বাস্তব চিত্র মনে হবে। পরে আমি জার্মানীর মিউনিখ শহরে অনেকটা ঐ রকম রাস্তায় গাড়ী চলাচলের ভিডিও তুলে এনেছি।

মাদুরোদামের ভেতরে

এখানে আমার একটি আগের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিই। সবুজ ঘাসের মাঠ দেখে, আপনার বাড়ীর সামনে কোন দৃশ্য দেখতে খুব ভালো লাগে, জানতে চেয়েছিলাম। আমার কথা পরে বলব বলেছিলাম। বিকেলের সোনালী আলোয়, সবুজ ঘাসের মাঠে শিশুরা দৌড়ে বেড়াচ্ছে, এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আমি দেখিনি। এই হল্যান্ডের হেগ শহরের মাদুরোদামের বিশাল চত্বরে ঐ কটি বাচ্চা, কে কোথায় রঙিন প্রজাপতির মত ঘুরে বেরিয়েছে, আমি দেখতে পাই নি। একবার এক ছিপছিপে দিদিমণির সাথে দুটি বাচ্চাকে ঘুরতে দেখে , আমি আর বন্ধু যোগেশ ভেবেছিলাম, ওরা ঐ দিদিমণির জমজ বাচ্চা। পরক্ষনেই খেয়াল হল, ওরা সেই স্কুলের বাচ্চাদের সাথেই এসেছে। বেশ কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মত ঘুরে বেরিয়েছে। দিদিমণিরা শুধু চোখে চোখে রেখেছে। ঐ রকম বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্যও কয়েকটি ব্যবস্থা আমি দেখেছি। মাঠের এক পাশে একটি দোকানে ঢুকে অনেকেই স্মৃতি চিহ্ন কিনতে ব্যস্ত হয়ে গেল। আমি একবার ঢুকে দেখে এলাম।

ভেতরে একটি বিনাপয়সায় শৌচালয় দেখলাম। বন্ধু যোগেশ ভেতরে ঢুকে কাজ সারার সময় আমি কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে পাশের ঘরের দিকে চলে গেছলাম। সেখানে একটা ভালো জিনিস দেখে টুক করে দুটি ছবি তুলে নিলাম। দেওয়ালে লাগানো বেবি কেয়ার স্টেশন। বাচ্চার ন্যাপী পাল্টানোর জন্য যাতে মা একাই, বাচ্চাকে বড় প্লাষ্টিকের প্লেটের মত জায়গায় শুইয়ে, ফিতা দিয়ে আটকে নিরাপদে কাজটি করতে পারেন তার ব্যবস্থা। উন্নত দেশের সবকিছুই এত উন্নত দেখতে হবে, এতটা মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না।

বেবি কেয়ার স্টেষণ

গো কোম্পানি এই সময় প্রায় এক সাথে দুটি দল কোলকাতা থেকে পাঠিয়েছে। আমাদের দলের ম্যানেজার পবনদ্বীপ কাউর আর অন্য দলের ম্যানেজার সৌম্যদীপ। জাহাজে ডিনারের সময় থেকে প্রায়ই আমাদের দুটি দলের দেখা হয়ে যাচ্ছে। এই মাদুরোদামের বাইরে বেরিয়ে দেখি, সৌম্যদীপ ওরফে কার্ফা সকলকে ডেকে একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের ম্যানেজার পবন তখনও কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য ভেতরেই থেকে গেছে। আমরা দুটি দলের সকলে মিলে কার্ফার সাথেই চললাম, বাসের দিকে। আমাদের সাদা বাস, ওদের নীল বাস ছাড়াও আরও গোটা তিনেক বাস একটু দূরে, পার্কিং এ দাঁড়িয়ে ছিল। নীল বাস আগে ছেড়ে চলে গেল। আমাদের দলের সবাই এলে, মিনিট দশেক পর আমাদের বাস ছাড়ল। আবার মিনিট পনের কুড়ি চলেই, বাস প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলা হাই ওয়েতে চলে এল। সব হাই ওয়েতেই আমাদের বাস, প্রায়

সব সময় একশ মাইল গতিতে চলেছে। রাস্তার পাশে পাশে বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্র। দূরে দূরে কয়েকটি বাড়ী। মাঝে মাঝেই মাঠে গোরুর দল চরে বেড়াচ্ছে।

হল্যান্ডের গ্রাম ও গোচারনের তৃণভূমি

হল্যান্ড আর সুইজারল্যান্ডে এইরকম অনেক গোরুর দল দেখেছি, কিন্তু কোথাও কোন রাখাল দেখিনি। হল্যান্ড আর সুইজারল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে দুধ আর দুগ্ধজাত পণ্য উৎপন্ন হয় শুনেছিলাম। হল্যান্ড বা বেলজিয়ামে আমরা কোথাও প্রাতরাশ বা নৈশ ভোজের সুযোগ পাইনি। কিন্তু প্যারিস থেকে একেবারে রোম পর্যন্ত সব জায়গায় দুই তিন রকমের ইয়োগার্ট অর্থাৎ দই, আর অনেক রকমের চীজ দেখেছি। ইয়োগার্ট আমার খুব প্রিয় খাদ্য। কিন্তু সেই যে প্যারিসের হোটেলে চীজ মুখে দিয়ে ফেলে দিতে হয়েছিল, আর ওদিকে হাত বাড়িয়ে দেখিনি। ঘন্টা দুই টানা ছুটল আমাদের বাস। তারপর পৌঁছে গেলাম বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে।

শহরে ঢুকেই চোখে পড়ল সাদা ট্রাম। ট্রাম বললেই আমার কানে বাজে, কোলকাতার ট্রামের টং টং ঘন্টার শব্দ। মহাত্মা গান্ধী রোডের একটি বাড়িতে থেকে এগারো বারো ক্লাশে পড়তাম। ভোর রাতে ঘুম ভাঙ্গলে রাস্তা দিয়ে টং টং করে ট্রাম চলে যাওয়ার ঘন্টাধ্বনী শুনতাম। সেই 1977-78 সালে। এই ট্রাম নিজেই তো একজন উপন্যাসের নায়ক। সেই কথা এখানে শুরু করে, আমার বারো দিনের ভ্রমণ কাহিনীকে কোন ট্রাজিক উপন্যাসে পরিণত করতে চাই না। হল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ডের লুসার্ন আর জুরিখে ট্রাম দেখে কিন্তু আমি উচ্ছসিত হয়েছি। একবারও মনে আসেনি , “হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে “ কোন কবি এখনও কোলকাতার রাস্তায় ট্রাম খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

ব্রাসেলস শহর -এর সাদা ট্রাম

ব্রাসেলস শহর ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য একজন স্থানীয় গাইড ঠিক করাই ছিল, ট্যুর কোম্পানী থেকে। লণ্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস, রোম আর ফ্লোরেন্স শহরে , স্থানীয় গাইড, আমাদের শহর ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। এরা ঠিক সময় মত, নির্দিষ্ট জায়গায় হাজির হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছে। এদের সাথে ট্যুর কোম্পানী কী করে, কোন শর্তে যোগাযোগ করে, আমার জানা নেই। কিন্তু প্রতিটি জায়গায়, কত কত রাস্তা বাসে করে গিয়ে ওদের সাথে দেখা করে নেওয়া; এটা অবশ্যই ম্যানেজার পবন বা অন্যান্য ম্যানেজারদের বিশেষ কৃতিত্ব। বাসে লম্বা রাস্তা চলার সময় দেখেছি, পবন সারা সময়ই কানে ইয়ার ফোনটা লাগিয়ে ফোনে কথা বলতে বলতে চলেছে। রাত্রেও অনেক রাত পর্যন্ত মোবাইলে যোগাযোগ করতে থাকে, ওর রুমে থাকা দিদিমণি বলেছেন।

ব্রাসেলসের এই গাইড কোন মাইক বা হেড ফোন ছাড়াই আমাদের একত্রিশ জনের দলের সাথে, শহরে ঘুরতে ঘুরতে কথা বলেছে। এতে আমাদের বেশ অসুবিধা হয়েছে। পরে , ফ্লোরেন্সে আর রোমে গাইডেরা আধুনিক F M রেডিও আর সবার জন্য একটি করে এক কানের হেড ফোন ব্যাবহার করে কথা বলতে বলতে চলেছে; সেটা অনেক সুবিধাজনক।

ফ্লোরেন্সে আমাদের সবার গলায় ঝোলানো FM Radio। লাল পোশাকে গাইড। পতাকা হাতে পবন।

আমার মত বেয়াড়া ট্যুরিষ্ট, যারা নতুন নতুন শহর শুধু চোখে দেখা, আর কিছু ছবি তুলে নেওয়ার জন্য ভ্রমণে বের হয়ে যাই, তাদের জন্য এই হেড ফোন দেওয়া গাইড কিছুটা কাজের। এই যে গোটা দশেক দেশের গোটা পনের শহরে ঘুরতে চলে গেলাম, এতটুকু পড়াশোনা না করেই চলে গেলাম, এটা একরকম অপরাধ। আমি তো গোটা পাঁচেক শহরের নাম ওখানে পৌঁছে প্রথম শুনেছি। আমার সেই বিশ্ব পর্যটক ডাক্তার দাদার মত সিরিয়াস ট্যুরিষ্টরা , পরে আমার কাছে আমাদের ঘোরা শহরগুলি সম্বন্ধে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছেন, হয়তো কোন পৃথিবী বিখ্যাত কোন মূর্তির কথা; বোকার মত বলতে হয়েছে, ওটাতো দেখিনি। এখন তো হাতে মোবাইল থাকলেই কত কি জেনে নেওয়া যায়। যে কোন নতুন জায়গায় যাওয়ার আগে, ট্রেনে বা বাসে বসেই দেখে নেওয়া যায়, ওখানে কি কি দর্শনীয় স্থান বা জিনিস আছে। আমাদের দলের এক ডাক্তার ভাই ঠিক এই কাজটিই করছিলেন। পিসার হেলানো টাওয়ার দেখে ফিরে আসার সময় আমরা দুটি দলের সকলে একটি রাস্তার পাশে অপেক্ষা করছিলাম, ট্রামের জন্য (এই ট্রাম কিন্তু মাথায় টিকি ট্রাম নয়) ; হঠাৎ দেখি রাস্তা পেরিয়ে ঐ ভাই প্রায় দৌড়ে একটা গলিতে ঢুকে যাচ্ছেন। অন্য দলের ম্যানেজার, কারফা ছুটল ওনার পিছু পিছু। ওরা দুজন মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এল। এর মধ্যেই দেখেছি, অন্তত জন কুড়ির গোটা দুই দল ঐ গলিতে ঢুকে গেল। নিশ্চয়ই ঐ গলিতে বিশেষ কিছু দেখার আছে। এবার ভালো করে দেখলে, চোখে পড়ল ঐ

গলির মুখে একটি ল্যাম্প পোস্টের গায়ে একটি দিক নির্দেশনা আছে; তাতে লেখা ‘ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি!” ডাক্তার ভাই ফিরে এসে জানাল, ঐ গলিতে ঐ প্রনম্য শিল্পীর জন্মস্থান। এখন কিছু কাজ চলছে, তাই ঘেরা আছে। আমার পায়ে চোট না থাকলে আমিও ঐ ভাইয়ের পিছন পিছন ছুটতাম নিশ্চিত। মাত্র একশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকলাম মিনিট দশেক। এটা অমার্জনীয় অপরাধ। কোন বাঙালি যদি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে একশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করে, অথচ একবার ঐ তীর্থস্থান দেখে না আসে, তাকে কি বলবেন? হাজার হাজার মাইল দূরের ঐ শহরে জীবনে আর কোনোদিন যাওয়া হবে না। ভেবে দেখুন, কি আহাম্মকের মত কাজ করে এসেছি।

আজকের পর্বে আর ব্রাসেলস শহর দেখার কথা লিখলাম না। এত বড় পর্ব কজন লোক পড়বেন, আমার সন্দেহ আছে।

আজ ১৭ ই জুন ২০২৫. বর্ষা এসে গেল। পায়ে প্লাস্টার নিয়ে আর বাইরে বেরোতে পারব না। গতকালই আমার নিজের এক জামাইবাবু ফোন করছিল, একটি দরকারে। প্রথমে বলল, ইউরোপ ভ্রমণ করে এলে দেখলাম। কিন্তু আমি বাড়ীতে বসে আছি, পায়ে প্লাস্টার নিয়ে, এই খবরটি জানে না। জানতে চাইলাম, আমাদের ভ্রমণের কথা কি করে জেনেছে? সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই জেনেছে। ওখানেই তো কয়েকবার লিখেছি, আমার পায়ে প্লাস্টার এর কথা। তখন বলল, অতোটা পড়িনি। অর্থাৎ, আমার এই লেখাগুলি লোকজন কেমন পড়ছে, সেটা বেশ বুঝলাম। এসব লেখালেখি না করে টিভি খুলে বসলেই তো অনেক গা গরম করা খবর দেখে সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়।

বিদেশ ভ্রমণ -১৩

নতুন পর্ব আজ আর শুরু করব না ভেবেছিলাম। কিন্তু আগের পর্ব পাঠিয়ে দেওয়ার পর দেখলাম, তারিখ ১৭ ই জুনের বদলে, মে লেখা হয়েছে। অবশ্য এখন যারা আমার লেখা পড়ছেন, আমার সেই সকল সহৃদয় পাঠকেরা ঠিকই বুঝবেন, ওটা লেখার ভুল। কেননা আজ গোটা রাজ্যে বর্ষা এসে গেল, এই খবরটা রেডিওতে শুনতে শুনতে আগের পর্ব শেষ করেছি। আমরা আঠারই মে রাত দশটার দিকে বাড়ী থেকে বের হয়ে, এই বারো দিনের ভ্রমণ শুরু করেছিলাম। ঠিক একমাস হয়ে গেল। এর মধ্যে আমেদাবাদের মহা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। ঐ হতভাগ্য বিমানটিও আমাদের মত লণ্ডনের গ্যাটউইক বিমান বন্দরে নামার কথা ছিল। আমাদের প্রথম বিদেশ যাত্রা মোটামুটি নিরাপদে সম্পূর্ন হয়েছিল। বাইরের দেশে গেলে কিছু কিছু জিনিস সম্বন্ধে খুবই সাবধানে থাকতে হয়। আমাদের ট্যুর ম্যানেজার সেই মে মাসের ছয় তারিখ কোলকাতার হোটেলে আমাদের জমায়েতের দিন থেকে বার বার সাবধান করে দিয়েছে। পাসপোর্ট। পাসপোর্ট হারালে, বিদেশে আপনি চরম বিপদে পড়ে যাবেন। এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা ভয়ানক সাবধান ছিলাম। ঐ ছয় তারিখ কি তার পরদিনই আমার কন্যা, অনলাইনে তিনটি আধুনিক " জাল গেঁজে" ব্যাগ কিনে নিয়েছিল। একেবারেই গেঞ্জি বা অন্তর্বাসের সাথে সেই ব্যাগে পাসপোর্ট বেঁধে নিয়েই আমরা প্রতিদিন হোটেল থেকে বাইরে পা দিয়েছি। নতুন যারা বিদেশে যাবেন, তাঁদের কথা ভেবেই, বারবার মনে করিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক " জাল গেঁজে" জামার নিচেই রেখেছি বরাবর

ব্রাসেলস এর পুরনো গীর্জা

আমাদের ব্রাসেলস এর গাইড , আমাদের সবার আগে একটি পুরনো গীর্জার সামনে দাঁড় করিয়ে ঐ গীর্জার সম্বন্ধে কিছু বলেছিল। গীর্জার নাম বা ইতিহাস নিয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাই এখন কিছুই মনে নেই। ছবি তুলে এনেছি; ই - বুকে সেই ছবি থাকবে। ঐ গীর্জার সামনে একটা বাঁধানো খোলা মাঠ, তারপর কিছু গাছপালা। ঐ গাছ সম্ভবত একটি ব্রোঞ্জের মূর্তিকে সাজানোর জন্য হিসেব করে লাগানো। আমরা আমাদের এই ইউরোপ ভ্রমণ এর কদিন যে সকল ছোট বড় শহর দেখেছি, সব জায়গায় যথেষ্ট গাছ যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেই তুলনায় আমরা ব্রাসেলস শহরে যে সব রাস্তা বা বাজার এলাকায় ঘুরেছি, সেই সব জায়গা একটু কম সবুজ। ঐ যে ব্রোঞ্জের মূর্তি আমরা দেখলাম, সেটি ওদের কোন রাজা বা রাজপুত্রের। কিন্তু কোন মুকুট, তরোয়াল বা ঝলমলে পোশাক নেই। ওটাই কোন বিজ্ঞানী বা প্রফেসরের মূর্তি বললেও আমরা মেনে নিতাম। কিন্তু যে ব্যাপারটি আমার বেমানান লেগেছে, সেটা হল, মূর্তির মাথায় কপালে পাখীর বিষ্ঠা। গাইডের পিছন পিছন আমরা শহরের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চললাম। আমি বহু পুরনো দিনের বাংলা সিনেমা বা সাহিত্যে বেলজিয়ান কাঁচের কথা শুনেছি। ওদিকে যাওয়ার কদিন আগে এই নিয়ে আমার এক বন্ধুর সাথে রসিকতাও করেছি।

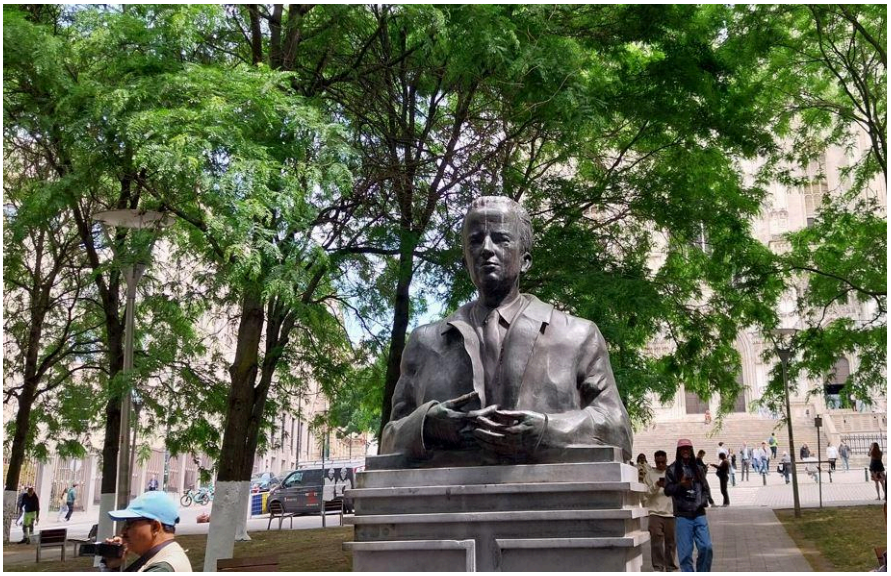
রাজার মূর্তি

বেলজিয়াম শহরের প্রাণকেন্দ্র বলা যায়, “গ্যালারী দু রোই” কে। একটা এক দেড়শ মিটার লম্বা রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে তিন চার তলা সমান উঁচু বাড়ী। ভালো করে না দেখলে মনে হবে, দুই পাশে দুটি মাত্র বাড়ী। বাড়ী দুটির ছাদের উপর থেকে গোটা রাস্তা ছাওয়া গম্বুজের মত কাঁচের ছাউনী। বাড়ী দুটির চেহারা বেশ পুরনো ধাঁচের, গুরু গম্ভীর। গাইডের কথায় যা বুঝলাম, ঐ বাড়ী দুটিতে বেলজিয়ামের সব থেকে দামি দামি (?) অভিজাত দোকান আছে।

গ্যালারী দু রোই

আমি ঐ জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়েছি, অভিজাত শব্দটির জন্য। এই কথাটি নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু অভিমত আছে। অতুল সম্পত্তি থাকলেই কি তাকে অভিজাত বলতে হবে? মানুষটির মধ্যে যদি

মনুষ্যত্ব না থাকে? তবুও? ঐ কাঁচে ঢাকা রাস্তার উপরেও, চেয়ার টেবিল পেতে গোটা দুই রেষ্টুরেন্ট বসানো হয়েছে। এ কিন্তু আমাদের কলকাতার ফুটপাতের দোকান নয়। পরে, প্যারিসের মত বিখ্যাত শহরের ফুটপাতেও ওরকম কয়েকটি রেষ্টুরেন্ট দেখেছি। এটা বোধহয় ঐ সব শীতের দেশের লোকের, গ্রীষ্ম কালের একরকম সৌখিনতা।

রাস্তায় রেস্তোরা

আমাদের ঘোরা গোটা দশেক দেশের কোথাও আমি মশা বা মাছি দেখিনি। একজন দিদিমণি , সম্ভবত ইটালির কোথাও একটা মশা দেখেছেন, বলেছিলেন। ঐ কাঁচের ছাদের রাস্তা পেরিয়ে আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। একটা ফাঁকা মাঠ মত চত্বরে বেশ কয়েকটি খাওয়ার দোকান বসেছে দেখলাম I ওটা দেখেই আমার, ইন্দোরের "ছাপ্পান দুকান" এর কথা মনে পড়ে গেল। গেল ডিসেম্বরে আমরা ওদিকে ঘুরে এলাম। ইন্দোরের ঐ ছাপ্পান্ন দুকান কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর। একটি বড় চওড়া রাস্তা বন্ধ করে, দুই দিকে আঠাশটি করে মোট ছাপ্পান্নটি দোকান করা হয়েছে। মাঝের জায়গাটা পার্কের মত কিছু গাছ রেখে, সিমেন্টের সুন্দর সুন্দর বেঞ্চ করা হয়েছে। ওটাই এখন ইন্দোরের একটা বিখ্যাত ভ্রমণ স্থান। এছাড়াও ইনদোরে সরাফা বাজার নামে একটি রাতের বাজার আছে; স্ট্রীট ফুড এর মেলা বসে, প্রতি রাত্রে।

ঐ চত্বর ছাড়িয়ে আমরা আর একটা বড়, পাথর বাঁধানো চত্বরের মধ্যে গিয়ে থামলাম। এটিই ব্রাসেলস এর প্রধান চক। এর চারপাশে বেশ উঁচু উঁচু, সূঁচালো মাথার প্রাসাদের মত বাড়ী। সব কটা প্রসাদেরই বিশেষ কিছু নাম আর তাৎপর্য আছে। গাইড বলার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু আমি বুঝিনি। আরও কিছুটা এগিয়ে একটা চৌরাস্তায় পৌঁছলাম। এই চৌরাস্তার এক কোণে,প্রায় পনের ফুট উঁচুতে একটি বাচ্চার প্রস্রাব করার মূর্তি। এই বাচ্চাটির উচ্চতা ফুট দুই হবে। লাল রঙের

জামা গায়ে। এর নাম যতদূর মনে পড়ে, " মান্নেকেন পিস্ ফাউন্টেন!" এই বাচ্চার প্রস্রাব করা নিয়ে একটি বেলজিয়ান পুরনো উপকথা আছে। কোন এক প্রাচীন কালে, অন্য রাজা বেলজিয়াম আক্রমণ করে রাজধানীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু বাচ্চারা প্রস্রাব করে সেই আগুন নিভিয়ে দিয়ে, নগর রক্ষা করে।

হিসু করা শিশু মূর্তী

ঐ বাচ্চার মূর্তির পাশে একটি দোকান দেখিয়ে ম্যানেজার পবন বলল, আসল বেলজিয়ান চকলেট কিনতে চাইলে,ঐ দোকানে নিতে পারেন। সবাই হুড়মুড় করে ঐ দোকানে গিয়ে ঢুকল। আমিও ঢুকলাম। ছোট দোকানে একেবারে ঠাসা ভিড় হয়ে গেল। এক মহিলা বেশ মন দিয়ে সকলকে বিভিন্ন ধরনের চকলেট দেখিয়ে এর নানান দিক বুঝিয়ে, দাম লিখে লিখে দেখাল। কিছু খুচরো চকলেট সকলকে খেতেও দিল। কিন্তু দাম যা বলল, আমাদের পিলে চমকে উঠলো। এর মধ্যে শহরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে আমাদের দলের কেউ কেউ অন্য কোনো দোকানে অনেক কম দামে বিক্রি হচ্ছে দেখে গিয়েছে। হঠাৎই দেখলাম, সবাই হুড়মুড় করে দোকান থেকে বেরিয়ে, পিছন দিকে পা চালিয়েছে। শ দেড়েক মিটার পিছিয়ে একটা দোকানে গিয়ে ঢুকল সবাই। এখানে দেখলাম, পাঁচ প্যাকেট এগারো ইউরো লিখে বিজ্ঞাপন দিয়ে রেখেছে। আগের সেই দোকানে তিন প্যাকেট একশ কুড়ি ইউরো বলেছিল।

জানিনা, গুণের পার্থক্য দশগুণ হয় কি না। আমার কন্যা ঐ দোকানে ছাড়াও, সুইজারল্যান্ড, আর অন্য কোথাও কোথাও বেশ কয়েক কেজি ওজনের চকলেট কিনে, বাড়ী বয়ে এনেছে। আমিও কয়েকটি খেয়ে দেখেছি। এদের একটা চকলেটের দাম কত জানতে চাইলে আমার কন্যা যা জানিয়েছে, আমার মত গেঁয়ো ডাক্তার যে মাথা ঘুরে পড়ে যাইনি, সে বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমি তো এর আগে ঠিক ঐ রকম দেখতে কিছু নেপালী চকলেট, দার্জিলিং থেকে ফেরার সময় কিনে এনেছিলাম। এখন ভাবছি, ঐ প্রায় পনের ভাগের এক ভাগ দামে কেনা নেপালী চকলেট তাহলে কি দিয়ে তৈরী। চকলেটের দোকানে রীতিমত লাইনে দাঁড়িয়ে আমাদের দলের সবাই চকলেট কিনেছে। তাতে বেশ সময় নষ্টও হয়েছে। ওখান থেকে আরও শ দেড়েক মিটার পিছিয়ে , সেই ছাপান্ন দুকান এর মত জায়গায় ফিরে এসে, দোতলায় একটি ‘বার্গার কিং’ দোকানে ঢুকে দুপুরের খাবারের জন্য বসলাম। এখানে বার্গার আর আলুভাজা। সাথে যত খুশী নাও কোক। কেউ কেউ তো জলের বোতল খালি করে, কোক ভরে নিয়েছে। আমি একটি কথা ওদিকে ঘুরে বুঝেছি, ঐ সব দেশে কোকের থেকে বোতলের জলের দাম বেশি।

শুরু হল রোজ দুপুরে বার্গার

এই যে চকলেট কিনতে গিয়ে বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়ে গেলো, এতে ম্যানেজার পবন বেশ চটে গিয়ে আমাদের কয়েকজনকে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। গোটা ট্যুরে ঐ একবারই দেখেছি, পবন মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি। এরপর কিন্তু পবন আস্তে আস্তে আমাদের বাড়ীর মেয়ের মত হয়ে গেল।

পবনের ঐ মেজাজ হারানোর কারণ হিসেবে, আপনারা যেমন ভাবতে পারেন, আমাদের দলের অনেকেও তাই ভেবেছিল। আমি একেবারেই নির্বিরোধী মানুষ; কোন কিছুতেই আমার বিশেষ মন খারাপ হয়ে যায় না, আবার আনন্দও হয় না। ঐ বার্গারের দোকানের তিন তলায় যে শৌচালয় ছিল, সেটাতে এক ইউরো খরচ করে ব্যাবহার করতে হয়। পবন মেজাজ হারানোর জন্য, বা হয়তো জানতই না; এই সাতানব্বই টাকা দিয়ে প্রস্রাব করার ব্যাপারটি বলে দেয়নি। দুই একজন, সাথে খুচরো ইউরো না থাকায় বেশ বিপদে পড়ে গেছল। সেই কথা আগের এক পর্বে লিখতে গিয়ে আমি “নিগ্রো” কথাটা লেখায় আমার এক বন্ধু সাবধান করে দিয়েছে। বন্ধু কিন্তু ঐ শব্দটির বিকল্প, শুদ্ধ শব্দটি কি বলে দেয়নি। আমি পরে, দিন সাত দশ চিন্তা করেও বিকল্প শুদ্ধ শব্দটি মনে করতে পারছি না। আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করলে, ই -বুক করার সময় ঠিক করে নেব। (বন্ধু, অধ্যাপক সেন-এর পরামর্শে “ অশ্বেতাঙ্গ” শব্দটি ব্যবহার করলাম।)

দুপুরের বার্গার খাওয়া হয়ে গেলে আমরা কিছুটা হেঁটে ফিরে , আমাদের বাসে উঠলাম। আমার বন্ধু এবং ছোট ভগ্নীপতি যোগেশ, সেই বেলজিয়ামে ঢোকার আগে থেকেই, পবনকে বার বার, একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আমাদের বাস কখন পৌঁছবে, জিজ্ঞেশ করছিল। ওর নৈহাটির প্রতিবেশী এক বন্ধুর ছেলে কয়েকমাস আগে ব্রাসেলসে চাকরী সূত্রে এসেছে। ছেলেটি ব্রাসেলসে

একবার দেখা করতে চায়। আমার যেমন বন্ধুর কন্যা মেঘা, কয়েক বছর ধরে লন্ডনে থাকে। আমি লন্ডনে নেমে তাকে ফোন করেছিলাম। আমাদের দল কখন কোথায় থাকবে আমার জানা ছিল না, তাই তাকে দেখা করতে বলিনি। এই ছেলেটি জানত যে, যে কোন ট্যুরিষ্ট একবার ব্রাসেলসের " এটোমিয়ামের" কাছে যাবেই। তাই ঐ জায়গায় এসে দেখা করতে চেয়েছে। আমরা আগে এই নতুন নামটি কখনো শুনিনি; তাই মনে রাখতে পারি নি। এবার আমরা সেই "Atomium " দেখতে চলেছি; পবন সেই কথাটা যোগেশকে জানিয়ে দিল। এই এটোমিয়াম জিনিসটি কি জানার পর বুঝলাম, নামটি ততো খটোমটো নয়। এটি একটি "এটম" বা পরমাণু কথা থেকে এসেছে। আসলে কিন্তু এটা একটা অণু বা মলিকিউল এর অতি বৃহৎ আকার। স্টেইনলেস স্টিলের একটি কাঠামো ,কয়েকশ ফুট উঁচু (১০২ মিটার); বহু দূর থেকে দেখা যায়।

ব্রাসেলসের এটোমিয়াম

প্যারিসের আইফেল টাওয়ার বা দিল্লীর কুতব মিনারের মত এটিও ব্রাসেলসের একটি সিগনেচার আইটেম (সঠিক বাংলা আমার জানা নেই) হয়ে গেছে। সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই ছবি তুলে নিলাম। সেই নৈহাটি থেকে বেলজিয়াম প্রবাসী ছেলেটি সস্ত্রীক এসে আমাদের সাথে দেখা করে গেল। টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, আমরা বেশী সময় আর মাঠে দাঁড়ালাম না। আমাদের বাস কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে ঐ এটোমিয়াম এর পাশ দিয়ে চলল, প্যারিসের

দিকে। এবার আমরা দেখতে পেলাম যে, ঐ কয়েকশ ফুট উঁচু কাঠামোর মধ্যে দিয়ে উপরে ওঠার সিঁড়ি আছে। হয়তো টিকিট কেটে ওঠার ব্যবস্থাও আছে।

নটার মধ্যে প্যারিসের হোটেলে পৌঁছতে না পারলে, বাস কোম্পানী মোটা টাকা খেসারত চাইতে পারে, এরকম একটা উৎকন্ঠা পবন প্রকাশ করেছিল। আমাদের প্রিয় সাদা বাসের, নায়কোচিত চেহারার পোলিশ ড্রাইভার কিন্তু, কোনোদিন, একফোঁটা বিরক্তি প্রকাশ করেনি। তাই ওকে রোমে না দেখে আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে যায়। আমরা কিন্তু সেদিন নটার অনেক আগেই , প্যারিসের সেই হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

ব্রাসেলসের থেকে প্যারিস যাওয়ার পথের পাশে

আজ ১৮ই জুন, ২০২৫. কলকাতায় বেশ বৃষ্টি হচ্ছে সারাদিন। আমাদের দলের দুজন, আসানসোলের ঘোষবাবু আর তাঁর স্ত্রী, রোম বিমান বন্দর থেকে অন্য বিমানে, লণ্ডনে মেয়ের কাছে চলে গেছিলেন। আজ জানিয়েছেন, ফেরার টিকিট এয়ার ইন্ডিয়া কোম্পানির বিমানের। তাই একটা বিরাট কিন্তু........! আমাদের ভ্রমণের সহযাত্রী সুস্থভাবে বাড়ী ফিরে আসুন। এখন আমরা সবাই এই প্রার্থনা করছি।

বিদেশ ভ্রমণ ১৪

প্যারিস শহরে ঢোকার আগে, শহরতলীতে এই হোটেলটি। পরদিন সকালে আমরা বুঝলাম যে এই ক্ল্যারিওন হোটেলটি প্যারিসের বিমান বন্দর এর বেশ কাছে। এর আগে আমি কখনও এত বড় হোটেলে থাকিনি। অন্য সব জায়গার মত এই হোটেলে ঢোকার আগেই আমরা রাতের খাবার খেয়ে ঢুকিনি। ম্যানেজার পবন আমাদের বাস থেকে নামার আগেই বলে দিয়েছিল, আজ বাইরে থেকে প্যাকেটের খাওয়ার আসবে। আমরা যে যার ঘরের চাবি, অর্থাৎ দরজা খোলার ইলেকট্রনিক কার্ড নিয়ে লিফটে করে ওপরে উঠে গেলাম।

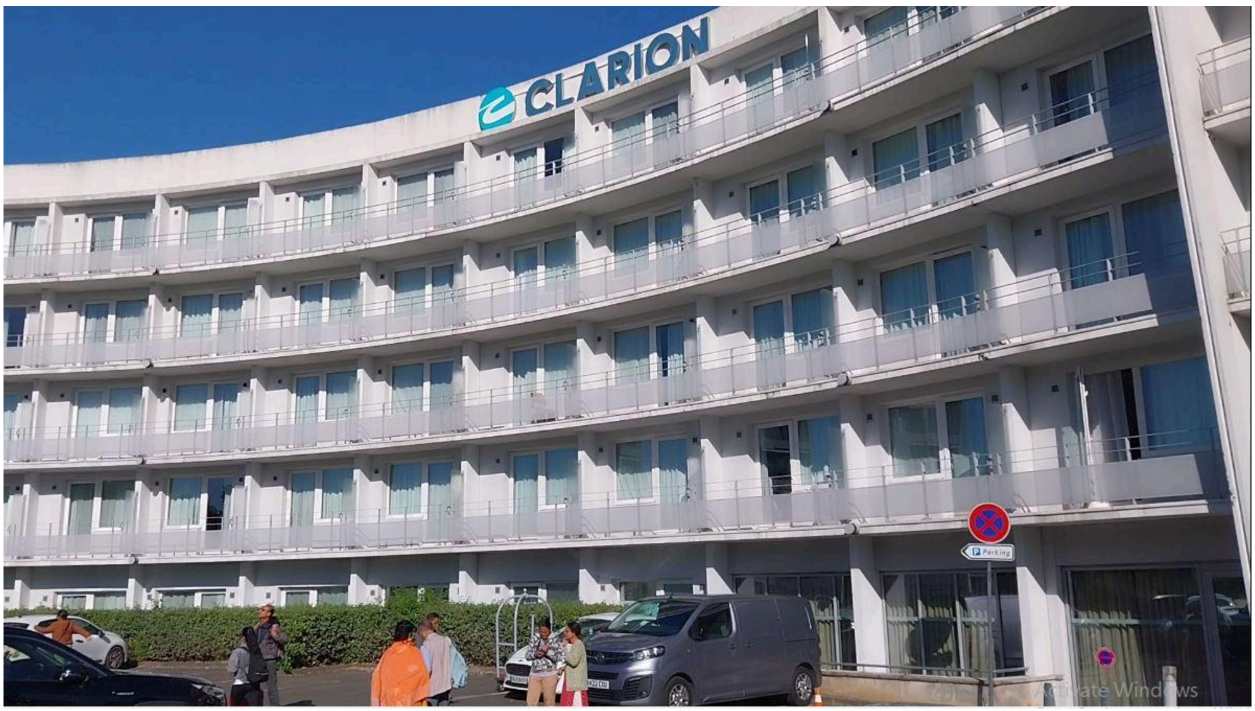

প্যারিসের ক্ল্যারিওন হোটেল

এখানে আমার কন্যার জন্য যে ভাঁজ করা বিছানা দিয়েছিল, আমরা সেটা খোলার কৌশল কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। গুটিয়ে একটা সোফার মত করে রাখা হয়েছে। এই রকম সোফা, দরকার হলে বিছানা; এই জিনিস আজকাল কলকাতাতেও পাওয়া যায়। এক একটির এক এক কায়দা। আমি আর আমার কন্যা ওটাকে নিয়ে একটু গুতাগুতি করতে না করতেই, পবন আমাদের দলের Whats App গ্রুপে জানিয়ে দিল, খাওয়ার এসে গেছে; নীচে হোটেলের রিসেপশন থেকে নিয়ে যান। আমার কন্যা নীচে গিয়ে, আমাদের তিনটি প্যাকেট নিয়ে এল। অনেক পরিমাণ খাদ্য বস্তু দেওয়া ছিল। আমরা খুবই স্বল্পাহারি, আগেই বলেছি; খাওয়ার ভালো

হলেও, আমরা অর্ধেকও খেতে পারলাম না। বাকী খাওয়ার, প্যাকেট ইত্যাদি কোথায় ফেলা যায়? ঘরের মধ্যে ময়লা ফেলার পাত্রে রাখলে, গোটা রাতে দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের দেশের হোটেলে এইসব জিনিস, থালা বাসন সব দরজার বাইরে রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ রকম ঝাঁ চকচকে হোটেলের, করিডোরে পাতা কার্পেটের উপর রাখা যায় কি না, বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে সেই সোফাকে খাটে পরিণত করতে একজন হোটেলের কর্মচারী এসে গেল। আমার কন্যা রিসেপশন এ জানিয়ে রেখেছিল। চোখের সামনে খাট পাতার সহজ কৌশলটি দেখে আমরা খুব সহজেই বুঝে গেলাম। এত সহজ, কিন্তু জানা না থাকলে কতোই না জটিল মনে হয়। সেই কর্মচারীই জানিয়ে দিল, খাওয়ার এর প্যাকেট দরজার বাইরে রেখে দিতে পারি। সেদিন সন্ধ্যায় আমি পিছনের দিকের ছোট বারান্দার দরজা খুলে দেখেছি, সাড়ে নটা কি তারও পর পর্যন্ত যথেষ্ট দিনের আলো থাকে।

এই বিদেশ ভ্রমণে একটা নতুন কাজ হয়েছে; হোটেলে ঢুকেই, হোটেলের Wi fi এর পাসওয়ার্ড নিয়ে, নেটে যুক্ত হয়ে যাওয়া। যদিও বাড়ীতে আমরা দশটার পর আর জেগে থাকি না; এদিকে সাড়ে চার ঘন্টা পিছিয়ে থাকা সময়ে, সেই দশটা মানে আমাদের রাত আড়াইটা। কিন্তু লন্ডনে নেমে থেকে এতই ব্যস্ততায় কাটছে যে, দিন রাত গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি প্রায় প্রতিদিন একটি দুটি করে, এক মিনিটের ইউটিউব শর্টস রেকর্ড করে নিয়েছি। রাত্রে হোটেলে ঢুকে সেই ভিডিও ইউটিউবে পাঠাচ্ছি। এসব করে ঘুমাতে আরও দেরী হয়ে যাচ্ছে। এই প্যারিসের হোটেলে ঢুকে, রুমের মধ্যে কি কি ব্যবস্থা আছে, দেখতে বুঝতেও অনেক সময় গেল। আমরা কিন্তু এতোটা আশা করিনি। বিশেষ করে স্নানের ঘরের দেওয়ালে লাগানো সাদা পাইপের সারি, কি কাজে লাগবে, আমরা প্রথম রাত্রে বুঝতেই পারিনি। পরদিন অন্য কারো কাছে জানলাম যে, ওটি কাপড় শুকানোর মেশিন। পরদিন আমার কন্যা তার আধ ভেজা মোজা শুকিয়ে নিয়েছে। পরে আরও কয়েকটি হোটেলে ওটা দেখে, ওর ওপর তোয়ালে মেলা দেখে বুঝেছি, ওটি আসলে ভেজা তোয়ালে শুকানোর মেশিন। এই হোটেলের কাঠের আলমারিতে দামী চীনামাটির

তোয়ালে শুকানোর মেশিন

থালা বাটি গুছিয়ে রাখা দেখেছি। কিন্তু প্যাকেটের খাওয়ার ঐ থালায় নিয়ে খাওয়ার কথা মাথায় আসেনি। আর একটি জিনিস প্রায় সব হোটেলেই দেখেছি; কিন্তু আমাদের কোথাও মনে হয়নি যে ওটা খুলে দেখি। আমাদের মনে হয়েছে, একটা ছোট ফ্রীজ, কেউ কেউ হয়তো ব্যবহার করে। কিন্তু দিন তিন-চার পর আমাদের দলের কেউ একজন ওটার রহস্য উদঘাটন করে, বাসে আলোচনা করায়, আমি আবার জানলাম, " আমি কত কম জানি!" ওগুলি যে রসিক মানুষদের জন্য ঘরে ঘরে ব্যবস্থা, আমার মত বেরসিক লোক সে খবর জানবে কি করে! সম্ভবত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময়, হোটেলের কর্মচারীরা ঐ রসের ভাণ্ডার পরীক্ষা করে দেখে নেয়; তারপর হিসেব করে দাম নিয়ে নেয়।

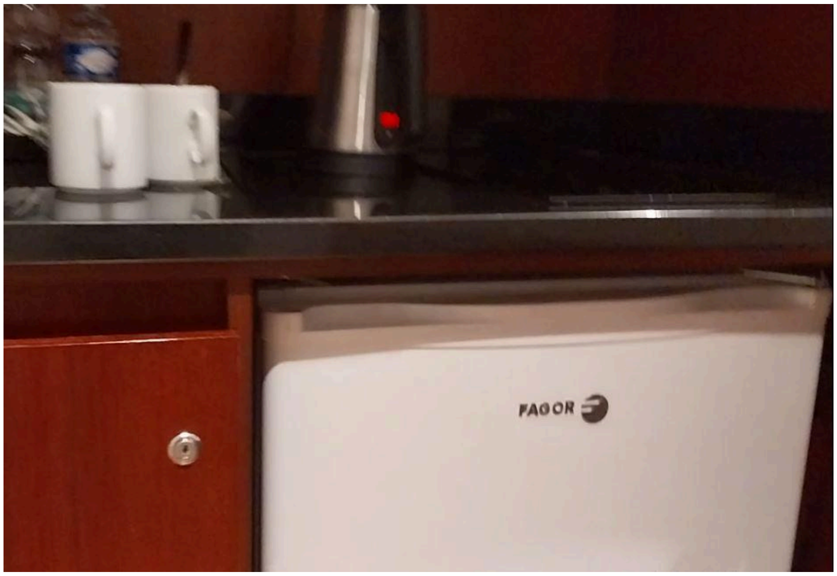

কেটলীর নিচে রসের ভান্ডার (Fagor)

পরদিন সকালে উঠেই আমি পিছনের দিকের বড় কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, আমাদের সাদা বাস ওদিকে রাখা হয়েছে। তারপর বহুদূর পর্যন্ত সবুজ আর সবুজ। সবুজের উপরে নীল আকাশে উড়ে আসছে একের পর এক এরোপ্লেন। হোটেলের সামনে দিকে, খুব কাছেই বিমন বন্দর আছে, বোঝা যাচ্ছিল, সব প্লেনের চাকা বেরিয়ে আসছে দেখে। আমাদের কেউ কেউ দেখেছে, রাত্রে আর সকালে বেশ কিছু বিমান চালক আর বিমানবালা ঐ হোটেলে ঢুকেছে, বেরিয়েছে।

এই হোটেলের সকালের ব্যাপারটি আমি আগেই বিস্তৃত লিখেছি। হ্যাঁ, এই সেই প্যারিসের হোটেলে আমার দেখা বৃকোদরদের গল্পই আগে লিখেছি। পরপর দুই দিন সকালে আমরা এই ক্ল্যারিয়ন হোটেলেই ভরপেট প্রাতরাশ করে সাদা বাসে উঠেছি। এমনকি ট্যুর কোম্পানী দুপুরে কি খাওয়াবে তাই নিয়ে সন্দেহ থাকায়, অনেকেই ঝোলা ভরেও বাসে উঠেছি। অস্বীকার করতে পারব না যে, প্রতিদিনই সকালে আমরা সারাদিনের রসদ পেটে চালান করেই বেরিয়েছি। দুপুরের বার্গার বা আলুভাজা নেহাতই নিয়ম রক্ষা ছিল।

এই দিন আমরা প্যারিস ভ্রমণ করে আবার সন্ধ্যার পর এই হোটেলেই ফিরে আসব; তাই , সেই সকালে উঠে সব ব্যাগ গুছিয়ে নিচে নেমে, বাসের পেটে বড় ব্যাগ চালান করার ঝামেলা ছিল না। যে যার হালকা ব্যাগ নিয়ে বাসে উঠে বসলাম। আমি তো বিদেশের প্রাণ ভোমরা পেটের সামনে, গেঞ্জির উপর বেঁধে নিয়েছি; তাই হালকা ব্যাগও বাসের, মাথার উপর-এর তাকে রেখেই নেমে পড়েছি, সব জায়গায়। এই বাইশে মে ২০২৫ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন

হয়ে গেল। এই দিনই আমরা দুটি পৃথিবী বিখ্যাত জিনিস দেখে নিলাম। প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, দিনে এবং রাত্রেও। আর স্বপ্নের ল্যুভর মিউজিয়াম। সাথে আরও কিছু। সুতরাং সে এক বিরাট পর্ব হবে। আজ এই পর্যন্তই থাক।

প্যারিসের হালকা মিষ্টি - পাই (π)

আজ ১৯ শে জুন। সকাল থেকে আকাশ মেঘলা থাকলেও সেরম বৃষ্টি হয়নি। এদিকে খবর পেলাম, বাঁকুড়ার কয়েকটি নদীতে বান এসেছে। তার মানে কদিন পরেই আমাদের মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বন্যা হবে। বর্ষা এসে ভালো করে পৌঁছতেই পারল না; এখনই বন্যা! ওদিকে মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ বেশ ঘোরালো হয়ে উঠছে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কি তাহলে হবেই!

বিদেশ ভ্রমণ ১৫

(ই-বুক করার সময় প্রথমেই যে কথা বলে দেওয়া দরকার তা হল, ল্যুভ মিউজিয়ামে ৯৬ হাজার এর বেশী ছবি আছে । তাই এখানে ৩-৪ টি ছবি দিয়ে কিছুই বোঝানো যাবে না । ইউ টিউবে ভিডিও আছে , দেখে নিন। https://youtu.be/Z9_7Ma21xEQ?si=v7DRWYbB3Q-45Ah0)

২২ শে মে, সকালে আমরা প্যারিস শহরের বাইরে, বিমান বন্দরের কাছের হোটেল থেকে বেরিয়ে প্যারিস শহরের দিকে চললাম, আমাদের সাদা বাসে। সন্ধ্যায় ফেরার সময় দেখেছি, মিনিট পনের কুড়িতেই ফেরা গেল। কিন্তু সকালে নটার পর থেকেই প্যারিসের দিকের রাস্তায় বেশ গাড়ীর চাপ দেখলাম। এক এক সময় তো কলকাতার রাস্তার মত মনে হচ্ছিল। কিন্তু তফাৎটা হল, কেউ কাউকে টপকে যাওয়ার চেষ্টা করে না। একটুও হর্ন বাজল না। কেউ নিজের লেন ছেড়ে অন্য লেনে গেল না। শহরের মধ্যে পৌঁছে কিন্তু সেরকম গাড়ীর চাপ দেখলাম না। প্যারিস শহরের রাস্তাও লন্ডনের মত বেশ চওড়া, পরিষ্কার, অনেক গাছের জন্য সবুজ। আমরা যে সব রাস্তা বা এলাকা দিয়ে ঘুরেছি, কোথাও একটা আধুনিক বাড়ী চোখে পড়েনি। সব বাড়ীই প্রায় একই রকম, একটু পুরনো ধাঁচের। কিন্তু প্রতিটি বাড়ী বেশ যত্নে আছে। আর একটি বেশ অদ্ভুত মিল সব বাড়িতেই। পরে আমাদের প্যারিসের গাইড দেবাঙ্গী আমাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়। মোটামুটি সব বাড়ী তিন বা চার তলা। কিন্তু তার থেকেও বেশী মিল হল, সব বাড়ীর জানালার মাপ। নীচের তলার জানালা বড়, আর উপরের দিকে ক্রমশ ছোট। এই ব্যাপারটা ল্যুভ মিউজিয়ামের মত বিখ্যাত বাড়ীতেও একই রকম। এর পিছনের কারণটি আরও বিচিত্র। অভিজাত ফরাসীরা মনে করত, মালিক বা ধনী লোকেরা নিচের তলায় থাকবে, আর কর্মচারি লোকেরা উপরের দিকে থাকবে। মালিকের মর্যাদা বেশী বোঝাতে বড় জানালা। আমার মনে হয়, ঐ সব পশ্চিমের শহর যখন তৈরী হয়, তখনও বিদ্যুৎ আবিষ্কার হয়নি; তাই লিফ্ট ব্যাপারটি চিন্তায় ছিল না। কর্মচারি লোকেরা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাবে, বাবু বিবিরা কেন পরিশ্রম করতে যাবে? আর বড় জানালা তো বেশী আলো বাতাসের জন্য, মালিকের তো জন্মগত অধিকার, বেশী পাওয়ারই! এখানে একটা কথা বলি। একটু মফস্বলের দিকে, একটি আবাসন এর ২৯ তলা বাড়ীর দশ তলায় ফ্ল্যাট বুকিং করায় আমার ছেলে বলেছিল, এত নীচে নিলে কেন? কুড়ি পঁচিশ তলায় নিতে পারতে।

প্যারিস শহরে ঢুকে প্রথম যে জিনিসটি আমাদের আগ্রহ তৈরী করল সেটার নাম পরে জানলাম, আর্ক দা ট্রাম্প। আমাদের বাস সকাল দশটা নাগাদ একবার ঐ সৌধটির পাশ দিয়ে গেল। ওটি দেখতে অনেকটা আমাদের দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের মত। চার দিকে চারটি বড় রাস্তা চলে গেছে। কেউ কেউ ওর কাছে হেঁটে গিয়ে ছবি তুলছে দেখলাম। কিন্তু আমাদের বাস দাঁড়ানোর মত জায়গা ছিলনা সম্ভবত। ম্যানেজার পবন বলল, সিটি ট্যুরের সময় আবার আসব। স্থানীয় গাইড এর সাথে শহর ঘোরার সময় একটু দূরে

কোথাও বাস রেখে, আমরা হেঁটে এসেছিলাম। কিন্তু রাস্তার অন্য পাশ থেকেই ছবি তোলা হল। একেবারে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ নেই। ঐ সৌধটি ফ্রান্সের কোন এক যুদ্ধ জয়ের স্মারক, গাইড বলেছিল; আমার জানার আগ্রহ ছিল না।

আর্ক দা ট্রাম্প

সকালে আমাদের বাস একেবারে থামল গিয়ে ল্যুভ (র) মিউজিয়াম এর কাছাকাছি একটি কম ব্যস্ত রাস্তায়। আমরা নেমে , পবনের পিছু পিছু একটু হেঁটে পৌঁছলাম মিউজিয়ামের সামনের বাঁধানো বিশাল চত্বরে। সকাল সাড়ে দশটা -এগারোটা নাগাদ ঐ সামনের মাঠে অন্তত পাঁচ সাতশ লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকালে হোটেল থেকে বেরোনোর সময়ই পবন পই পই করে বলে দিয়েছিল, পাসপোর্ট দেখে দেখে ঢুকতে দেবে; তাই ওটি নিয়েই যেতে হবে। আবার এই বিশ্ব বিখ্যাত ল্যুভ মিউজিয়ামের ভিড়ে, পাসপোর্ট চুরি হয়ে যায় খুব। তাই ওখানে নেমেই মাঠের মধ্যে সকলকে এক জায়গায় জড়ো করে, পাসপোর্ট

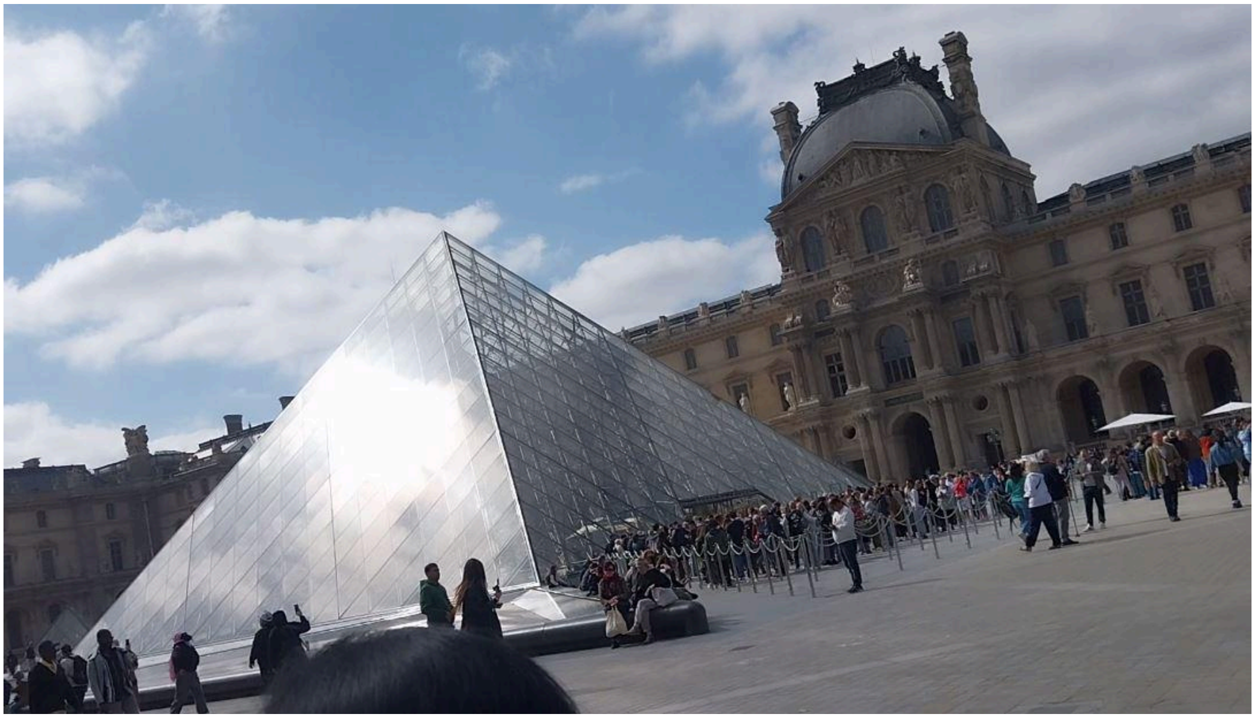

ল্যুভের সামনের মাঠ। নিচের বড় আর উপরের ছোট জানালা

সাবধানে রাখার কথা মনে করিয়ে দেয়, পবন। এরপর মাঠের থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলা নেমে ঢোকার আগে আবার সকলকে কিছু নির্দেশ দিয়েছে, পবন। মূল কথা, ভেতরে ওকে পতাকা হাতে, দল নিয়ে ঘুরতে দেবে না। মাত্র পাঁচ ছয় জন করে এক এক বারে ঢুকতে দেবে। ভেতরে ঢুকে রাস্তা হারানোর সমূহ সম্ভাবনা আছে। সবাই মোনালিসার ঘরের দিকে, তীর চিহ্ন দেখে দেখে এগোবে। এক ঘণ্টা পনের মিনিট পরে, সবাই আবার ঐ একই জায়গায় এসে হাজির হবে।

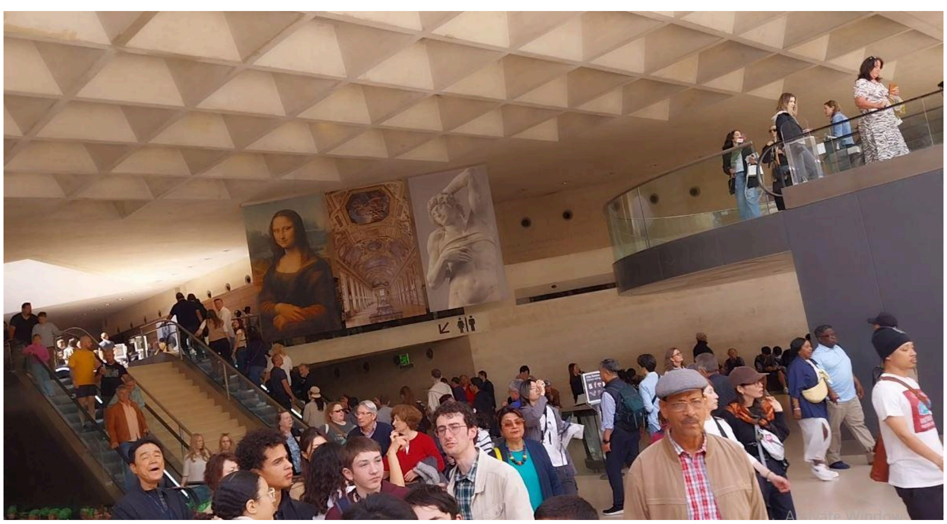

এক তলা নিচে , ঢোকা বেরনোর জায়গা

এবার আমরা প্রথমে নিরাপত্তার পরীক্ষার লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। বেশ লম্বা লাইনে, একটু একটু করে এগোতে থাকলাম। হাতে পাসপোর্ট আর অনলাইনে কেনা টিকিট। বেশ ভালো রকম পরীক্ষা করে, নিরাপত্তার জায়গা পেরোতে দিল। তারপর পাঁচ জন করে ঢোকার গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমরা তিনজন গেট পেরিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়িয়ে পাশপোর্টগুলি আমাদের জাল গেঁজেতে বেঁধে নিচ্ছিলাম। একজন মহিলা কর্মচারী আমাদের ধাওয়া দিয়ে ওখান থেকে এগিয়ে যেতে বলল। ভেতরে প্রায় সব জায়গায়ই দর্শনার্থীর ভিড়। আমরা প্রথমে যেদিকে সব মার্বেলের মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছে, সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সব শিল্পীর তৈরী বিখ্যাত সব ভাস্কর্য। আমার মত আনাড়ির কাছে সবই সমান।

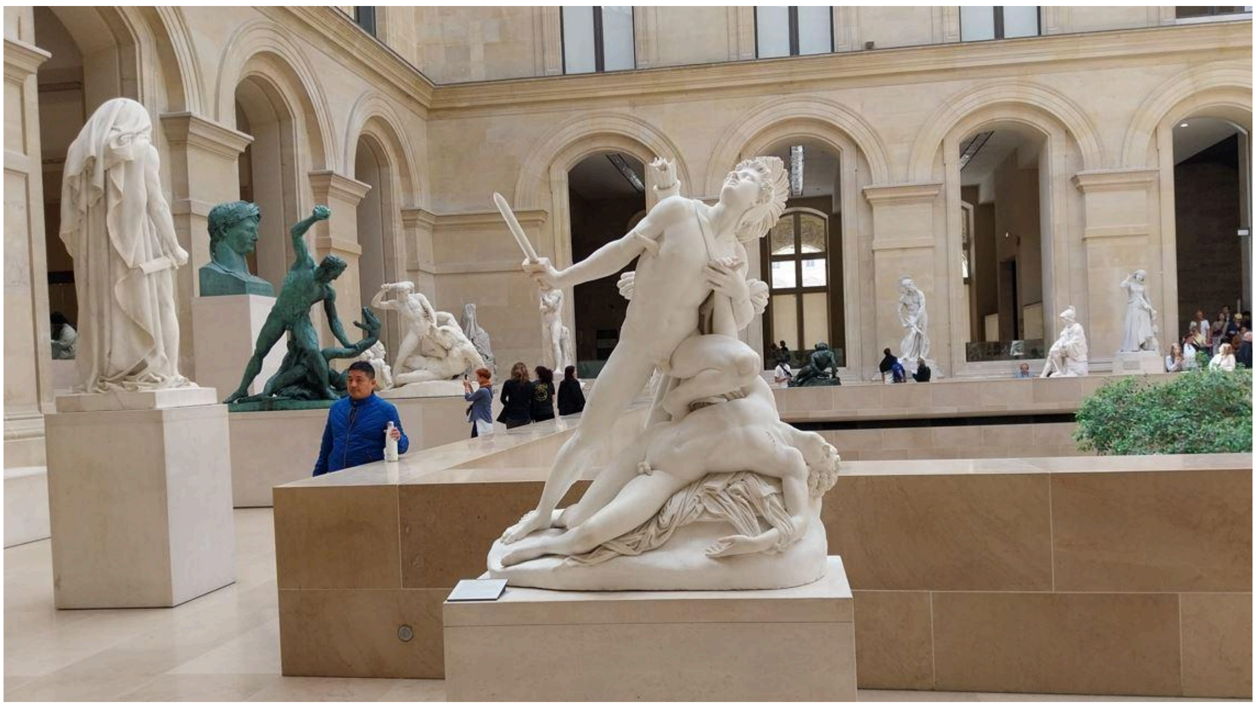

একটি মুর্তিরই নাম জানতাম, খুঁজে পেলাম না। পরে আমার সেই ডাক্তার দাদা জানালেন, ওটা ফ্লোরেন্সে আছে। পরে ফ্লোরেন্স শহরে হেঁটে ঘুরে এলেও তখন ঐ খবর জানা ছিল না, তাই হয়তো কয়েক মিটার দূর থেকে ফিরে এসেছি, না দেখেই। আর যাই হোক, প্রাণ ভরে ছবি আর ভিডিও তুলে নিলাম। প্রায় প্রতিটা মূর্তির নিচেই ফরাসী আর ইংরেজী ভাষায় মূর্তির পরিচয়, শিল্পীর নাম, কত সালে তৈরী, সবই লেখা আছে। দুই একটা পড়েও দেখলাম। সবই দুশো তিনশ বছর আগে তৈরী। আমার ঐ ডাক্তার দাদা একবার বলেছিলেন, মোনালিসার মত বিখ্যাত ছবির সামনে বসে দুই চারজন শিল্পী, দেখে দেখে আঁকার অভ্যাস করে। নারায়ণ সান্যাল মশাই তাঁর প্রবঞ্চক উপন্যাসেও সম্ভবত সেই রকম কিছু লিখেছেন। আমি একটি মূর্তির ঘরে ঢুকে, নিঃশব্দে মোবাইলে ভিডিও তুলে নিচ্ছিলাম। একজন বেশ বয়স্ক মানুষ একটি টুলে বসে, সামনের মুর্তি দেখে দেখে কিছু একটা আঁকার চেষ্টা করছিলেন। আমার

ভিডিওতে তিনিও এসে গেলেন। শুধু মুখ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আমি আস্তে আস্তে ওখান থেকে সরে এসেছি। মূর্তির পরে নানান প্রাচীন প্রত্ন সামগ্রী। প্রায় প্রতিটা ঘরেই দেওয়ালে ডজন ডজন ছবি, অর্থাৎ পেন্টিং। ঐ গাইড মেয়েটির হিসেব মত এই মিউজিয়াম এ ছিয়ানব্বই হাজার এর বেশী ছবি আছে। প্রতিটা ছবির সামনে এক মিনিট করে দাঁড়ালে সাতষট্টি দিন লাগবে। আমরা কয়েক হাজার মাইল দূরের থেকে গিয়ে, বোধহয় মাত্র সাতষট্টি মিনিট ঐ বিশাল মিউজিয়ামের ভেতরে ছিলাম।

৯৬০০০ এর একটি ছবি

একটার পর একটা হল ঘরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। যেদিকে তাকাই বিশাল বিশাল পেন্টিং। আমি যে কটা ভিডিও তুলে এনেছি, সেখানেই কয়েক হাজার পেন্টিং দেখা যাচ্ছে। বার দুই তিন ওখানকার কর্মচারীকে জিজ্ঞেশ করে, মোনালিসার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। এক এক জায়গায় কলকাতার বই মেলার মত ভিড়। কয়েকটি জায়গায় মনে হয়েছে, যে কোন সময় পকেটমার পকেট থেকে কিছু তুলে নেবে। আমার পকেটে অবশ্য একটা রুমাল ছাড়া আর কিছুই নেই। মোবাইলটি আমার হাতেই। যে কর্মচারীদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম; তারা সম্ভবত পাহারা দিতেই বসে ছিলেন। কিন্তু আমি সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাই বোঝার সাথে সাথেই উঠে দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন, কোন দিকে যেতে হবে। এই রকম কর্মচারী মাত্রই কয়েকজন আমার চোখে পড়েছে, ঐ হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে।

মিউজিয়ামের ভেতরের ভীড়

এই প্রায় একমুখী জন স্রোতের টানে আমরাও এগিয়ে চললাম। একবার আমাদের দলের রসিক কাকুর সাথে দেখা হল। কোন দিকে না তাকিয়ে, সোজা চলেছেন আমি বললাম, কাকু , আপনার বন্ধু কোথায়? উত্তরে বললেন, জানি না, আসচে নিশ্চয়ই এদিকে। আমরা ডাইনে বাঁয়ে, দেওয়ালে, ছাদে, বড়বড় পেন্টিং দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। একসময় পৌঁছে গেলাম সেই বিখ্যাত হলের মধ্যে। এর মধ্যে আমরা একবার শৌচালয় দেখে, ভেতরটা একটু দেখে এলাম। প্রবঞ্চক উপন্যাসে সান্যাল মশাই এই শৌচালয় এর কথাই লিখেছেন, সম্ভবত। এই উপন্যাসেই পড়েছিলাম, বিখ্যাত ঐ ছবিটি তেমন কিছু বড় নয়।

ঐ বিশ্ব বিখ্যাত ছবির হলে একটু বেশি লোক হাজির হবে জানতাম; কিন্তু হলে ঢুকে তো ভিড় দেখে ভয় পেয়ে যাওয়ার কথা। আমরা কোলকাতার দুর্গাপূজা দেখা, মিছিলের লোক। কোলকাতার বিখ্যাত সব পূজা মণ্ডপের মধ্যে ভিড় হয়। মণ্ডপের মধ্যে হাজার দেড় দুই লোক হাজির হলেই, পদপিষ্ট হয়ে যাওয়ার মত বিশৃঙ্খল অবস্থা হয়। স্বেচ্ছা সেবক এর দল পারলে ধাক্কা দিয়ে বের করে। এই বিখ্যাত ছবির সামনে দুই হাজার তো বটেই, আরও বেশী মানুষই সেই সময় হাজীর ছিলাম। কিন্তু কোন ধাক্কাধাক্কি নেই, হৈ হুল্লোর নেই। প্রায় সবাই নিজের নিজের মোবাইলে ছবি তুলে নিচ্ছে। আমিও ছবি আর ভিডিও তুলে নিলাম। একেবারে ছবির সামনে না চলে যায় লোক জন, সেই জন্য যে দেওয়ালে মোনালিসার ছবিটি টাঙানো আছে, সেই দেওয়াল থেকে দশ বারো ফুট দূরে পর্যন্ত যাওয়া যাচ্ছে। ঐ ফাঁকা জায়গায় জন পাঁচেক মহিলা কর্মচারি ভিড় সামলাচ্ছেন। ছবিটি অবশ্য দেওয়ালে প্রায় দশ ফুট মত উপরে রাখা। তাই সবার মাথা, এমনকি উঁচু করে তুলে ধরা মোবাইলের জন্যও কারো ছবি দেখতে অসুবিধা হয়নি। আমরা মিনিট দশেক ঐ হলে থেকে পিছনের দিকের যে দরজার কথা পবন বলে দিয়েছিল, সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

মোনালিসা হলে

আমাদের জমায়েতের নির্দিষ্ট জায়গায় সবাই একে একে এসে হাজির হলাম। পবন হিসেব করে দেখল " দুই জোড়া কাকু" আসেনি তখনও। আমার কন্যা এই সুযোগে ছুটে গিয়ে একটি মোনালিসার ফ্রীজ ম্যাগনেট কিনে এনেছে। কম বয়সি দুই কাকু ফিরে এলেন আগে। তারপর ছটফটে কাকু। বড় কাকু আর ফেরেন না। এবার আমরা সবাই ফেরার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। পবনের চাপ বাড়তে লাগলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পারা যায় না। এক এক করে সরে সরে একটু বসার জায়গা খুঁজে বসতে শুরু করলাম। এক সময় দূরে দেখা গেল। এ যেন সেই রামগড় এর সন্যাসী রাজা, রনজিৎ কুমার চন্দ্র ভূষণ সিংহ সাহস রায় এর কাছে শোনা, তাঁর আর আমার বাবার গুরুদেব, ডক্টর মহানাম দাদুর, উদ্ধব সন্দেশ পাঠের মত। গোপিনীরা পথ চেয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছেন। উদ্ধবের রথের ধ্বজা দূরে দেখেই, " ঐ এসে গেছে" বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ। হ্যা, বড় কাকুকে দূরে দেখে, আমরাও " ঐ এসে গেছে" বলে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম।

আজ ২১.৬.২০২৫. বিশ্ব যোগ দিবসে, আমাদের কন্যাও ভোরে উঠে ছুটেছিল, আপিসের " ডিউটি" , বছরে একদিন "যোগা" করে দিতে।

বিদেশ ভ্রমণ - ১৬

লুভ্‌ মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে, সামনের মাঠে আমাদের সাথে দেখা হল, দেবাঙ্গি নামের স্থানীয় গাইডের। এই দেবাংগী মেয়েটির বাবা মা ভারতীয় বংশোদ্ভুত; এই মেয়েটি হিন্দিও ভালো বলে। আমাদের ইংরেজী আর হিন্দি দুই ভাষাতেই সব কিছুর বর্ণনা দিয়েছে। আমরা দল বেঁধে তার পিছু পিছু হেঁটে আমাদের সাদা বাসের কাছে ফিরে এলাম। আসার সময় একটা জায়গায় ফুটপাতে চেয়ার টেবিল পেতে, রেষ্টুরেন্ট বসানো হয়েছে দেখলাম। বাসে উঠে মাথা গুনে ম্যানেজার পবন দেখে দুজন কম পড়ছে। এক ডাক্তারবাবু আর তাঁর স্ত্রী তখনও বাসে ফেরেননি। আবারও আমরা , বসে আছি পথ চেয়ে! বোধহয় উল্টো দিকে আর একটা বাস দাঁড়িয়ে ছিল; তার আড়ালে একটা ছোট পার্কের মত জায়গায়, বেঞ্চে ওনারা দুইজন বসে ছিলেন। ঐ বাসটি সরে যেতে, আমাদের দলের কেউ একজন দেখতে পেলেন, ওদের। পবন হৈ হৈ করে ডেকে, বাসে উঠে আসতে বলল ওদের। এবার আমরা প্যারিস শহর দেখতে চললাম।

প্যারিসের বাড়িগুলির বিশেষত্ব ইত্যাদি নিয়ে গাইড আমাদের যা বলেছিল, আগেই লিখেছি। আমরা আবার সেই আর্ক দা ট্রাম্প এর কাছে গিয়ে দেখলাম। নতুন যে জায়গায় নিয়ে গেল, সেটি একটি বড় বাঁধানো চত্বর। গোটা দুই তিন ফুটবল মাঠের মত হবে। এই জায়গার নাম, " কনকোর স্কয়ার!" ফরাসী বিপ্লবের বিজয়স্তম্ভ বলা যায়।

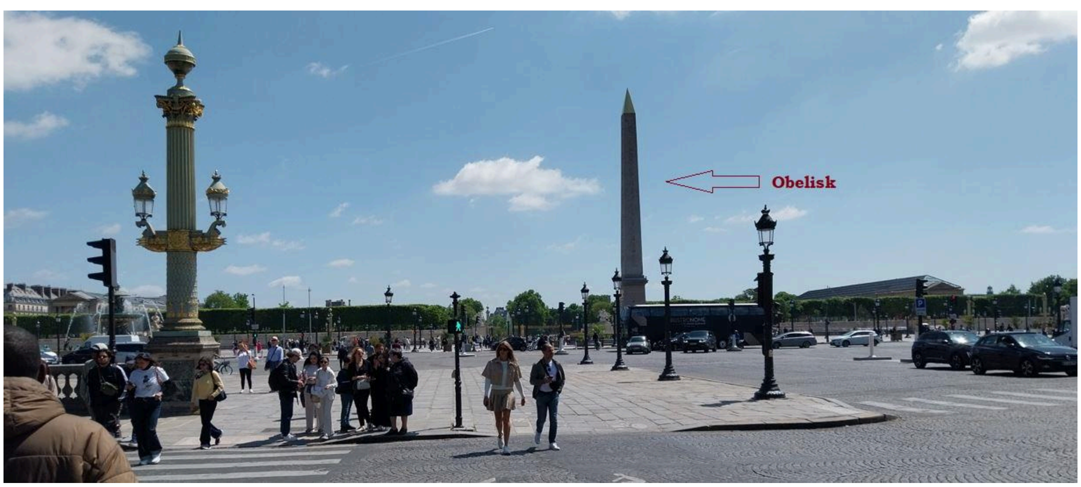

কনকোর স্কোয়ার

ঐ চত্বরে একটি পাথরের, পেন্সিলের মত দেখতে স্মারক দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট ফুট উঁচু ঐ স্মারকটি মিশর দেশের দান। নাম, ওবেলিস্ক । এছাড়া একটি বেশ মূর্তি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো ফোয়ারা আছে। গাইড বলেছিল, চত্বরের চার কোনায় চারটি বিশেষ নারী মূর্তি আছে।

আমরা সেই সব দেখতে আর এগিয়ে গেলাম না। ঐ ওবেলিস্ক আর ফোয়ারার ছবি তুলে বাসে ফিরে এলাম। শহরের রাস্তায় বাসে করে ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটি বিখ্যাত বাড়ী আমাদের চিনিয়ে দিল গাইড। আসলে রাস্তা বিরাট চওড়া চওড়া হলেও, যে কোন জায়গায় বাস দাঁড়িয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই।

রাত্রে আলোকোজ্জ্বল আইফেল টাওয়ার দেখে ফেরার সময় এটা আরও ভালো করে বুঝেছি। আমরা রাত দশটায়, পাঁচ মিনিটের জন্য হওয়া " স্পার্কলিং টাওয়ার" দেখার জন্য ঠিক মিনিট তিনেক আগে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। একটি বিরাট চত্বর ঘুরে , বাস থামার সাথে সাথেই আমরা দূরদার করে নেমে দৌড় দিয়েছিলাম। কিন্তু ফেরার সময় তো কখনোই তিরিশ জন একসাথে ফিরছিলাম না। ম্যানেজার পবন ডাকাডাকি করে সকলকে বাসে ওঠার জন্য বললেও, জন তিনেক একটু দেরি করে আসছিলেন। বাস কিন্তু চলতে শুরু করে দিল। আবার সেই বড় চত্বর আস্তে আস্তে এক পাক ঘুরে সেই একই জায়গায় এসে বাকীদের তুলে নিয়েছিল। এখানে একটা খবর জানিয়ে রাখি। গত পরশু , শ্রদ্ধেয় ডক্টর উৎপল সান্যাল স্যার আমার বাড়ী এসেছিলেন, ওনার একটা বই (খুব সুন্দর সুন্দর সব প্যারোডি কবিতা আর গানের) আমাকে উপহার দিতে। ওনারা ২০১৪ সালে, আমাদের মত তের চোদ্দ দিনের ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন। ওনারা রাত্রে শ্যেন নদীতে নৌকা ভ্রমণ করতে গিয়ে এই স্পার্ক্লিং টাওয়ার দেখেছিলেন।

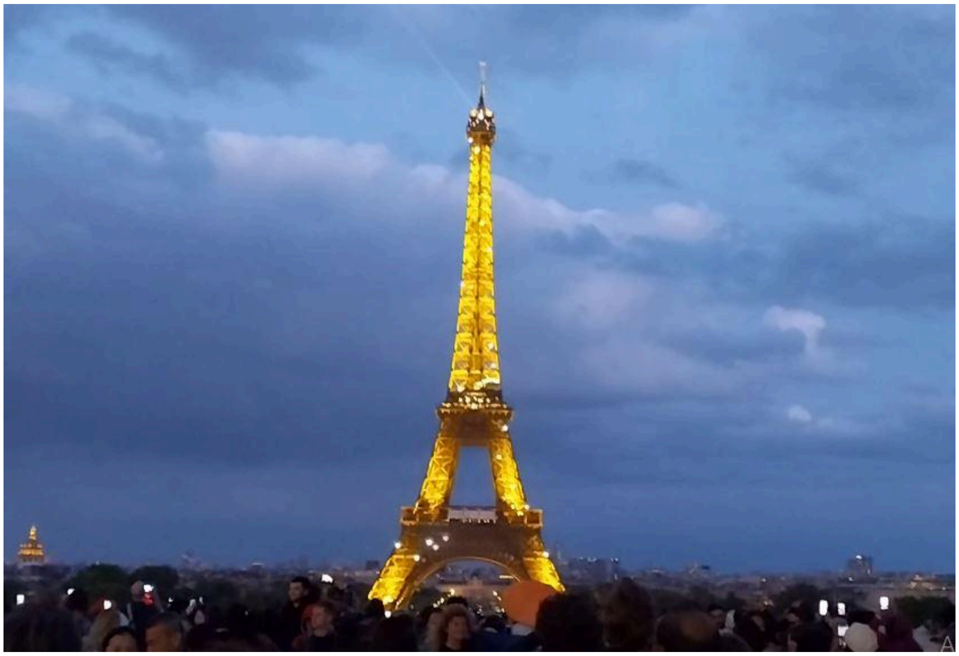

রাতের আইফেল

আমরা দিনের বেলা ঐ শ্যেন নদীতে ক্রুজ ভ্রমণ করেছিলাম। বলছি সে কথা। তার আগে আমাদের ঐ গাইড, দেবাঙ্গী একটি বিশেষ রাস্তা দিয়ে, বাসে করে নিয়ে যায়। নাম বলেছিল, " সঁজে লিজে।" আমি অবশ্য বাড়ী ফিরে, প্যারিস শহরে ঐ নামে কোন রাস্তার বিষয়ে খুঁজে পেলাম না, নেটে। ওর ঐ খাঁটি ফরাসী উচ্চারণ হয়ত আমি ভুল শুনেছি। গাইডের মতে, ঐ সঁজে লিজে নামের রাস্তাটি প্যারিস শহরের সব থেকে অভিজাত রাস্তা। এক কিমি মত লম্বা রাস্তায় সব ভীষণ দামি দামি দোকান পাট আর হোটেল রেস্তোরাঁ। মাত্র আঠারো জন মানুষ ঐ রাস্তার পাশের বাড়ির বাসিন্দা। এতোই দামি যে, লোকে ওখানে বাড়ী বা ফ্ল্যাট জাতীয় কিছু কেনার সাহস করে না। গোটা পৃথিবীর বিখ্যাত সব বড়লোকেরা ঐ রাস্তায় সময় কাটাতে আসে। এই সব শুনেই কি না জানি না, আমাদের বাস, রাত্রের আইফেল টাওয়ার দেখে ফেরার সময় একবার ঐ রাস্তা দিয়ে ঘুরে এল। একটা আলোকোজ্জ্বল শহরের রাস্তা। এ ছাড়া আর কিছুই আমার আলাদা মনে হয় নি।

দুপুরে আমাদের বাস শ্যেন নদীর পাড়ে নিয়ে গেল। বেশ ঝাঁ চকচকে লঞ্চঘাটা। আমরা গিয়েই দেখলাম, একটি বড় লঞ্চ বা ক্রুজ জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের থেকে মিনিট পনের কুড়ি আগে, নীল বাসে, গো কোম্পানির সাথে যাওয়া কোলকাতার অন্য দলটি পৌঁছে গেছে। ওরা ক্রুজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। আমাদের জন্য দুপুরের খাবারের অর্ডার ঠিক সময় মত, আমাদের ম্যানেজার পবন দিয়ে রেখেছিল। হয়তো কয়েক মিনিট আগে গেলে আমরা ঐ বার্গার এর প্যাকেট হাতে নিয়ে ক্রুজের উপর উঠে যেতাম। আমরা ডাঙায় দাঁড়িয়েই বার্গার

খেয়ে নিলাম। মিনিট দশেক পর আর একটা ক্রুজ এসে ঘাটে দাঁড়াল। ওটির যাত্রীরা নেমে গেলে আমরা লাইন দিয়ে উঠে গেলাম। খুব চোখ ধাঁধানো রোদ থাকলেও, আমরা সকলেই ছাদে উঠে বেঞ্চে বসে গেলাম। ক্রুজ ছাড়ার পর দেখলাম, ছাদেই আমরা অন্তত দেড় দুইশ লোক বসেছি। তাও বোধহয় পঞ্চাশ টি আসন খালি যাচ্ছে। অত্যন্ত পরিষ্কার নীলাভ জলের উপর দিয়ে ভেসে চলল ক্রুজ। পাশ দিয়ে, উল্টো দিকের থেকেও কয়েকটি ক্রুজ চলে গেল। সব ক্রুজেই অনেক যাত্রী। একটা আর একটাকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় দুই নৌকায় বসা যাত্রীরা হৈ হৈ করে উচ্ছাস প্রকাশ করে চলল। নদীর উপর দিয়ে বেশ কিছু সেতু। এক একটি সেতুর নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক বাচ্চার সমবেত কলরবে চারদিক আমোদিত হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের ক্রুজের ছাদে কিন্তু এত সংখ্যক বাচ্চা দেখা যাচ্ছিল না। ছবি আর ভিডিও তোলার ফাঁকে একবার উঁকি দিয়ে দেখলাম, নীচের তলার কাঁচের ঘরের দুই পাশে শ খানেক করে বাচ্চা বসেছে। সেতুর নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় ওরাই আনন্দে চিৎকার করছে। নদী হয়তো তিনশ মিটার মত চওড়া হবে। দুই পাড়ে শহরের বাড়ী ঘর, আর অনেক গাছপালা। ক্রুজ ছাড়ার সময় থেকেই, মাইকে কি সব বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল। মাইক কিন্তু আমাদের দেশের মত কান ঝালাপালা করে দেওয়ার মতো বিভৎস উচ্চ রবে বাজছিল না। কিন্তু ফরাসী ভাষায় বলার জন্য আমি একটি কথাও বুঝতে পারিনি। আমাদের প্যারিসের গাইড মেয়েটি নদীর পাড়ে আমাদের পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিয়েছিল। সে বলেছিল, শ্যেন নদীর উপর থেকেই আইফেল টাওয়ার সবথেকে ভালো দেখা যায়। ঠিকই বলেছিল। ক্রুজের উপর থেকে আমরা আইফেল টাওয়ার যত সুন্দর দেখেছি, বিকেলে টাওয়ার এর নিচে গিয়ে, বা টাওয়ার এর উপরে উঠে তেমন সুন্দর লাগেনি। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে, মিনিট পনের কুড়ি নৌকায় ভেসে আমরা নেমে এলাম।

শ্যেন নদী থেকে দেখা

এবার চললাম, আইফেল টাওয়ার ছুঁয়ে দেখে, তার দোতলা পর্যন্ত ওঠার জন্য। টাওয়ার এর কাছে বিশাল প্রান্তরের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের বাস দাঁড়াল। প্রান্তরের পাশে পাশে, মাঝের রাস্তার পাশে অনেক গাছ। সেই গাছগুলিও সুন্দর করে ছেঁটে সাজানো। শ দুই মিটার হেঁটে আমরা সিকিউরিটি চেক এর লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। কয়েকশ লোক দুটি লাইন দিয়েছে। আমার তো দেখে সবই ভারতীয় মনে হল। পরে অবশ্য টাওয়ার এর উপরে, লিফটের লাইনে কিছু তুর্কী আর আর্মেনিয় লোকের সাথে কথা হল। সিকিউরিটি চেক এর পর আরও অন্তত একশ মিটার হেঁটে, লিফটে ওঠার লাইন। মাঝে অনেকেই শৌচালয় এর দিকে গেল। কেউ কেউ ওখানেও বড় লাইন দেখে ফিরেও এল। প্রায় আধ ঘন্টা লাইন দিয়ে লিফটে ওঠার সুযোগ পেলাম। বেশ বড় লিফট। আমাদের দলের একত্রিশ জন ছাড়াও, আরও জন দশেক লোক একবারে উঠে গেলাম।

এখন আইফেল টাওয়ারের তিনতলা (ইংরেজী মতে সেকেন্ড ফ্লোর) পর্যন্ত উঠতে দেয়। একবার মধ্যমগ্রামে নতুন ফ্ল্যাটের খোঁজে গিয়ে , একটা দশ না এগারো তলায় উঠেছিলাম। নিচের সাধারণ বাড়ী ঘর, ইঁট ভাটা সবই সুন্দর লাগছিল। আমাদের সাথে থাকা ইঞ্জিনিয়ার ভাগ্নে বলেছিল, উপর থেকে সবই সুন্দর লাগে। টাওয়ারের উপর থেকে নিচের প্যারিস শহরের বাড়ী ঘর, খেলার মাঠ, শ্যেন নদীতে ক্রুজ এর আনাগোনা, সবই সুন্দর লাগছিল। উপরে সেই সময় প্রায় শ পাঁচেক লোক ছিলাম। সেই তিন তলাতে ও দুই একটা দোকান আছে। আমরা প্রায় এক ঘন্টা থেকে নেমে আসার জন্য, লিফটের সামনে লাইন দিলাম। কিন্তু কি একটা বিভ্রাটে একটি লিফ্ট ঠিক সেই সময় প্রায় মিনিট কুড়ি উপরে এল না। কর্মচারীরা সকলকে একটি লিফটের দিকে গিয়ে লাইন দিতে বলল। দুটি লিফটের লোক একটিতে নামার লাইন দেওয়ায় বেশ সময় লাগল। আমরা প্রায় চল্লিশ মিনিট পর নামার সুযোগ পেলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা না করে যারা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেছে, তারাই সম্ভবত আগে নেমেছে।

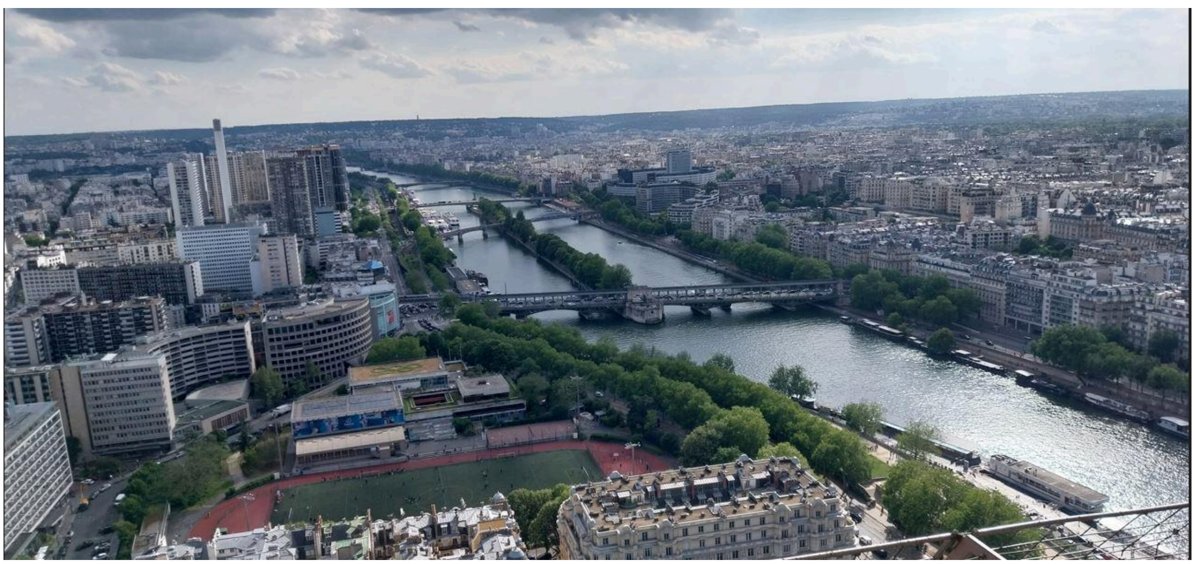

আইফেল টাওয়ার এর উপর থেকে দেখা

বাসে উঠে আমরা চললাম, ল্যুভ মিউজিয়ামের সামনের কাঁচের পিরামিডের সন্ধ্যার আলোক সজ্জা দেখতে। ভালো করে অন্ধকার না হওয়ায় সেরকম কিছু দর্শনীয় মনে হয়নি আমার। ওখান থেকে চললাম, তাড়াতাড়ি একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে, রাতের আইফেল টাওয়ার দেখার জন্য আসতে। রাত্রের আইফেল টাওয়ারের আলোক সজ্জা দেখার মত, সে বিষয়ে আগেই বলেছি। সেদিন রাতে আমরা আবার সেই ক্লারিওন হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে আমরা রওনা দেব, সুইজারল্যান্ড এর উদ্দেশ্যে।

ক্লারিওন হোটেলের সামনে

আজ শুভ রথযাত্রা। পুরীর জগন্নাথ মন্দির দেখে এসেছি। কিন্তু ভিড়ের ভয়েই কোনদিন পুরীর রথের সময় যাওয়ার কথা ভাবিনি। মাহেশের রথও দেখা হয়নি। প্রভুর কৃপা হলে, সামনের বছর হয়তো মাহেশেই ঠিকানা বদল করে চলে যাব। ২৭.৬.২৫.

বিদেশে ভ্রমণ ১৭

দুই রাত প্যারিসের বিমান বন্দর এর কাছের ক্ল্যারিওন হোটেলে থেকে, ২৩ মে সকালে আবার ট্রলি ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে হোটেল ছেড়ে দিলাম। মাত্র দুই রাত থেকেই এই হোটেলটির উপর কেমন একটা মায়া জন্মে গেছল। এদের প্রাতরাশের বিপুল আয়োজন সম্বন্ধে আগেই বলেছি। নিচে, হোটেলের লবিতে অপেক্ষা করার সময় দেখলাম, কয়েকশ মানুষ একসাথে আমরা লবিতে হাজির হয়েছি। একে একে ছটি বাসে সব ট্যুরিষ্ট পরের গন্তব্যের জন্য রওনা দিলাম। আজ আমাদের সুইজারল্যান্ডে চলে যাওয়ার কথা। আগের রাত্রে হোটেলে ঢোকার আগে বাসেই আমাদের ট্যুর ম্যানেজার পবন বলে দেয়, পরদিন সকালে কখন প্রাতরাশের জন্য নামতে হবে, কটায় লবিতে হাজির হতে হবে, বাস কটায় ছেড়ে যাবে, পরদিনের গন্তব্য কোথায় এইসব।

(আমার স্নেহভাজন, বাঁকুরার রাধানগরের শিক্ষক সৌম্য সেনগুপ্ত , আমাকে কদিন ধরে একটা নিজস্ব ওয়েব সাইট তৈরি করার জন্য বেশ চেপে ধরেছিল। ওর উৎসাহেই শেষ পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে, দিন তিনেক এর চেষ্টায়, আমার একটি ওয়েবসাইট খাড়া করা গেল। এই করতে গিয়ে আমার এই ভ্রমণ কাহিনী লেখা , একেবারেই বন্ধ রাখতে হয়েছিল। আজ সেই ওয়েবসাইট তৈরী করে, পরিচিত শ তিনেক মানুষের কাছে পাঠিয়ে, একটু চাপমুক্ত লাগছে। https://www.dayalbandhu.vip/new-page.html নতুন পুরনো সকল ভ্রমণ কাহিণী এখানে পাবেন)

সুন্দর ঝকঝকে সকালে , ঘণ নীল আকাশে কিছু কিছু পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ উড়তে দেখে, আমরা প্যারিস থেকে রওনা দিলাম। যে রাস্তা দিয়ে আগের দিন প্যারিসের দিকে গেছলাম, সেই রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে, শহরকে এড়িয়ে চলল আমাদের সেই সাদা বাস, যার গায়ে লেখা, “ র্যাফ ট্রান্স!” আজ সারাদিন ধরে শুধুই ছুটে চলা। মাঝে শৌচালয়-এর খোঁজ নিয়ে বার দুই তিন ছোটার বিরতি। আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা শহরের থেকে একেবারেই সবুজের সমারোহ ভরা প্রান্তরের মধ্যে চলে এলাম। ইংল্যান্ডে, গ্যাটউইক বিমান বন্দর থেকে লণ্ডন শহরের শহরতলীর রাস্তা দিয়ে ঘন্টাখানেক চলেছিলাম। সেই রাস্তার দুই পাশের দৃশ্যও নয়নাভিরাম ছিল। কিন্তু সেখানে মাঝে মাঝেই শহরতলীর বাড়িঘর দেখা যাচ্ছিল।আজ আমরা যেন শুধুই সবুজ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এদিককার হাই ওয়েতে গাড়ীর চাপও বেশ কম। আমাদের বাসের পাশে পাশে মাঝে মাঝে যে সব বড় বড় ট্রাক জাতীয় গাড়ী চলে যাচ্ছিল, সেগুলি সবই ঢাকা। পরে হিসেব পেয়েছি, আমরা এই কদিনে চার হাজার তিনশ কিমি মত রাস্তা বাসে করে

চলেছি। সব মিলে তিনটি খোলা ট্রাকও বোধহয় আমার চোখে পড়েনি। খোলা যে কিছু গাড়ী দেখেছি সেগুলি সবই ছোট গাড়ী বয়ে নিয়ে যেতে। এক একটি বড় গাড়ীতে ছটি করে গাড়ী নিয়ে চলেছে।

ফ্রান্সের গ্রাম

আর এই দীর্ঘ চার হাজার কিমি মত রাস্তা দিয়ে বাসে যাওয়া, আর গোটা দশ বারো শহরের মধ্যে দিয়ে চলে , আমি একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি; এসব দেশে কোন গাড়িতেই হর্ন বাজে না। আজই দুপুরে, আমার পায়ের প্লাস্টার কাটিয়ে রিক্সা করে ফিরছিলাম। দমদম স্টেশনের আন্ডার পাশে একটি ছোট গাড়ী খারাপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। একসাথে অন্তত গোটা পনের গাড়ী অনবরত হর্ন বাজিয়ে চলল। এমনকি আমাদের ব্যাটারী চালিত রিকশা, সেও সমানে হর্ন বাজিয়ে চলল। আমরা মিউনিখ শহরে এরকম একটা আন্ডার পাশে গাড়ীর জ্যাম দেখেছি। কেউ হর্ন বাজাল না। কারো কোন তাড়া নেই যেন। এই দিনের লম্বা বাস যাত্রায়, বিকেলের দিকে একটি বড় শপিং মলে ঢুকে, শৌচালয় এর খোঁজ করা হয়েছিল। বাস থেকে নেমে, ম্যানেজার পবন হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে, আমরা আরও জন দুই- তিন ওর পিছনে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য আমাদের বাসের ড্রাইভার, প্যাং করে একবার হর্ন বাজাল। পবন ফিরে তাকানোতে , ড্রাইভার আঙুলের ইশারায় জানাল, কোন দিকে যেতে হবে। এই

একবারেই যদি হর্ন না বাজত, আমরা তো দেশে ফিরে বলতেই পারতাম, ওদেশের বাসে হর্ন থাকেই না!

ফ্রান্সের হাই ওয়ের পাশের সবুজ প্রান্তর, চাষের মাঠ, দূরে দূরে দেখা দুই একটা গ্রামের বাড়ি, সবার উপরে চোখ ধাঁধানো নীল আকাশ, আকাশে সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘ; আমাদের বাস যাত্রাকে আনন্দময় করে তুলেছিল। একশ কিমি বেগে ছুটে চলা বাসের জানালা দিয়েই ছবি তোলা আর ভিডিও করার বিরাম নেই। এর মধ্যে সামনের দিকে বসা ডাক্তারবাবুর স্ত্রী অত্যন্ত সুরেলা কন্ঠে গান ধরলেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়-এর গাওয়া গান, একের পর এক গেয়ে চলেছেন। বাসের অতি সাধারণ মাইক্রো ফোনে, কোন সহযোগী বাজনা ছাড়া কী অপূর্ব সব গান গাইতে গাইতে চলেছেন। ওনাকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য দু'জন দিদিমণি সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। আমার পিছনে বসা দাসবাবু এবার উঠে গিয়ে, পুরনো দিনের হিন্দী সিনেমার গান গেয়ে শোনালেন কয়েকটি। অতি সুন্দর। আমাদের সাথে চলেছেন, আমার ভগ্নিপতি যোগেশের "মামা" । এই গম্ভীর প্রকৃতির প্রোফেসর মানুষটিকে আমি অন্তত পনের বছর-এর বেশী চিনি। সবথেকে বড় চমক দিলেন এই মামা। অন্যদের গান, কবিতা এসব শুনতে শুনতে, মামা উঠে গিয়ে মাইক ধরলেন।

আজকাল আমরা এই " মাইক ধরা" বললে যেরকম এক বিরক্তি উৎপন্ন করা ব্যাপার বুঝি, মামার মাইক কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। প্রথমে উনি একটু আধটু পুরনো বাংলা সিনেমার দৃশ্য উল্লেখ করে, মজার মজার ঘটনা বলে , একটু হাস্য রস পরিবেশন করা শুরু করলেন। কিন্তু ঐ সিনেমার দৃশ্য উল্লেখ করে যখন উনি গান গাইতে শুরু করলেন, সে এক বিশাল রোমাঞ্চকর ব্যাপার। অন্যরা ওনাকে এই তিনদিন দেখছেন। আমি আর যোগেশ, যারা বহু বছর ধরে ওনাকে চিনি, আমাদের কাছে ওনার ঐ খালি গলায় গাওয়া গান একেবারেই নতুন পাওনা। একের পর এক গানের দুই লাইন কি চার লাইন গেয়ে চলেছেন, আর আমরা ওনার ঐ নতুন আবিস্কৃত প্রতিভায় বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি। এই ভাবেই এক সময় আমাদের প্রথম বিশ্রামের জন্য বাস থামল।

একটি রাস্তার পাশের ধাবা বলা যায়। আসলে কিন্তু একটি পুরোপুরি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শপিং মল। সবাই গিয়ে ঢুকলাম। প্রথম উদ্দেশ্য বিনা ইউরো খরচ করে শৌচালয় ব্যবহার। এরপর অনেকে মেশিন থেকে ইউরো দিয়ে কফি বেরকরে খেল। আমিও আমার বোনের কাছে একটু নিয়ে, ইউরো দিয়ে কেনা কফি কেমন স্বাদের পরীক্ষা করে দেখলাম। এই সব দেশে কফির

থেকে চায়ের দাম বেশি, আগেই লিখেছি। এখানেই আমাদের বাস যেখানে রাখা ছিল, সেই বাঁধানো চাথালে , আমাদের দলের জন দশ বারো মহিলা হঠাৎ ঠিক করলেন, একটু নেচে নেবেন। এই দলে কিন্তু বছর পঁচিশ থেকে তিয়াত্তর বছর বয়সী মহিলাও ছিলেন। ওনারা একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক নেচে নিলেন। ওনারাই আমাদের দুই জনের হাতে ছবি তোলার ব্যবস্থা দেখে ছবি তুলে নিতে বলেন। আমি ছাড়া আর যিনি ছবি তুলছিলেন, তিনি ভিডিও তুলে নিলেন।

প্রমীলা বাহিনী

এই সব ছবি আর ভিডিও আমাদের এই ভ্রমণের গ্রুপে দেওয়া শুরু হল। আমরা কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার দিনই, গ্রুপ ম্যানেজার পবন এই হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপটি করে নিয়েছিল। কলকাতায় ফেরার পথে, সম্ভবত রোমেই আমরা কয়েকজন পবনকে বলেছিলাম, ঐ গ্রুপের এডমিন হিসেবে আমাদের জন দুইকে এডমিন করে দিতে। পবন তো কোলকাতা ফিরে দশদিন পরই আবার নতুন দল নিয়ে ইউরোপ চলে গেছল। আমরা কিন্তু আজও ঐ গ্রুপটি চলিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সহযাত্রী, আসানসোলের ঘোষবাবু আর তাঁর স্ত্রী রোম থেকে লন্ডনে মেয়ের কাছে চলে গেছেন, আগেই বলেছি। আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পরই , ওনাদের দেশে ফেরার বিমান-এর সময় পরিবর্তন ইত্যাদী নিয়ে আমরা বেশ উৎকন্ঠায় ছিলাম। ওনারা দিন তিনেক আগে দেশে ফিরেছেন। পবনও আমাদের পরের দল নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ করে ফিরে এসেছে। আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ঘোর গ্রীষ্মের মধ্যে। ফিরেও কদিন গরম পেয়েছি। এখন আমাদের রাজ্যে বর্ষা

এসে গেল। আমরা লন্ডনে নেমে ঝকঝকে পরিষ্কার আবহাওয়া পেয়েছি। প্যারিসের আবহাওয়াও খুবই সুন্দর ছিল। সুইজারল্যান্ডে বিকেলের দিকে ঢুকেছি। তাও বোধহয় ঘন্টা দুই পরিষ্কার নীল আকাশে সাদা মেঘ উড়তে দেখেছি। সন্ধ্যার আগে আগে , একটু একটু করে মেঘের রং কালো হতে শুরু করল। সেই মে মাসের ছয় তারিখ, কলকাতার জমায়েতে ম্যানেজার দু'জন আমাদের সকলকে ছাতা আর রেন কোট নিতে বলে দিয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের এংগেলবার্গ-এর হোটেলের বাইরে বাস থেকে নামার সময় ছাতা মাথায় দিতে হল না বটে, কিন্তু মিনিট চল্লিশ পরে, হোটেল থেকে বেরিয়ে, একশ মিটার হেঁটে অন্য হোটেলে খেতে যাওয়ার সময় টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

আজ পয়লা জুলাই। চিকিৎসক দিবস। সকাল থেকে অসংখ্য বার্তা এসে মোবাইলের মেমোরী ভর্তি করে দিচ্ছে। শেষে আর সকলকে আলাদা করে উত্তর দিতে পারব না বুঝে, আমিও সকলকে একটি বার্তা লেখা ছবি পাঠিয়ে দিলাম। ঐ ছবিটি আমার কন্যা, এই দিন বাসে প্যারিস থেকে সুইজারল্যান্ড যাওয়ার পথে, বাসে বসে তুলেছিল। এই একটি নমুনা দেখে কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারেন, কী অপূর্ব সুন্দর সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমার শত শত মাইল বাসে করে ঘুরেছি।

H + Hotel. Engelberg

এই ইউরোপ ভ্রমণ করে ফিরেই আমার ডান পায়ে যে প্লাস্টার করা হয়েছিল, আজ সেটা কাটা হল। দিন সাতেক তো লাগবেই, স্বাভাবিক হাঁটতে চলতে। বাড়িতে আটকা পড়ে কয়েকটি কাজ সেরে নিলাম। ইউরোপ ভ্রমণ এর সবকটা ভিডিও তৈরী করা গেল। লেখা এখনও অনেক

বাকী। শেষের দিকে দিন তিনেক, একটা ওয়েব সাইট তৈরি করার কাজে ব্যস্ত হয়ে ছিলাম। ঐ সাইটে আমার অনেক পুরনো লেখা আপাতত যোগ করা হয়েছে। এরপর একটু একটু করে বেশ কিছু লেখা যোগ করার ইচ্ছা আছে। আমার যে সকল সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমার এই নিবন্ধগুলো পড়ে, আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন, তাঁদের জন্যই পুরনো লেখাগুলি গুছিয়ে রাখার জন্য এই ওয়েব সাইট তৈরি। এতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কাজের ছবি ইত্যাদিও রাখা হয়েছে। সময় পেলে একটু দেখে নেবেন।

www.dayalbandhu.vip (২০২৫ -এর জুলাই মাসের মধ্যেই প্রায় সব লেখা যোগ হয়েছে)

পরের পর্বে সুইজারল্যান্ডের দুটি বরফে ঢাকা পাহাড়-এর উপর ওঠার অভিজ্ঞতা লিখব।

বিদেশ ভ্রমণ ১৮

সুইজারল্যান্ডের এঙ্গেলবার্গ শহরটি একটু পাহাড়ের উপর উঠে। প্যারিস থেকে সকাল নটা নাগাদ রওয়ানা দিয়ে সন্ধ্যে আটটা নাগাদ আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেলের নাম এইচ প্লাস। সাধারণত আমরা সারাদিন ঘুরে ফিরে , সন্ধ্যের পর কোন একটি রেস্টুরেন্টে খেয়ে, তারপর হোটেলে গিয়ে ঢুকেছি। এই এইচ প্লাস হোটেলে আমরা দুই রাত ছিলাম। দুই দিনই হোটেলে ফিরে, মুখ হাত ধুয়ে, তারপর একশ মিটার মত হেঁটে একটি রেস্টুরেন্টে খেতে যেতাম। প্রথমদিন আমাদের ছাতা নিয়ে বেরোতে হয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই ঝকঝকে পরিষ্কার আবহাওয়া। আমরা যেহেতু আমাদের মেয়ের সাথে একই রুমে থাকব বলেই দিয়েছিলাম, প্রায় সব হোটেলেই আমাদের জন্য একটা বড় ঘরে আর একটা অতিরিক্ত বিছানার ব্যবস্থা করে দিত। গোটা দুই হোটেলে , ঘর একটু ছোট হওয়ায় মেয়ের জন্য আলাদা রুমই দিয়েছে। আর স্টেনালাইন জাহাজে তো আমরা যে কেবিন পেয়েছি, সেটাতে চারটি বিছানা ছিল। এই এঙ্গেলবার্গের হোটেলে আমাদের একটি দুই রুমের বিশাল শ্যুট দিয়েছিল। খুবই সুন্দর ব্যবস্হা। বারান্দার দিকে বিশাল বড় বড় কাঁচের জানালা। দূরে দেখা যাচ্ছে মাথায় সাদা বরফ নিয়ে পাহাড়। সামনের ছোট পার্কের মত জায়গায় মাত্রই গোটা পাঁচ সাত গাছ। কয়েকটি গাছের পাতা উজ্জ্বল সবুজ। একটি গাছের পাতা ঘন তামাটে। এই তামাটে পাতার গাছ, আমরা যেখানেই সামান্য পার্ক বা বাগান দেখেছি, সব জায়গায় দুই একটা করে ছিল। পরে গুগুল দাদা জানিয়েছে, এই গাছের নাম, বেগুনী বিচ। এই লেখাগুলি ই বুক করে বের হওয়ার সময় নিশ্চয়ই ঐ গাছ বা পার্কের ছবি থাকবে।

এই হোটেলেও আমরা দল বেঁধে নিচে নামলাম প্রাতরাশের জন্য, ঠিক সকাল সাতটায়। এদের প্রাতরাশের হল একটু ছোট। প্যারিসের ক্লারিয়নে বোধহয় শ চারপাঁচ লোক একসাথে বসার জায়গা

ছিল; এখানে পঞ্চাশ জনের মত হবে। তবে কিনা, আমার মত লোকের জন্য যথেষ্ট বেশী খাদ্য পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। আগেই বলে দিয়েছিল, এইদিন আমরা ইউরোপের সর্বোচ্চ চূড়ায় ওঠার জন্য যাবো, ওখানে কোম্পানী থেকে দুপুরের খাবার দেওয়া হবে না। অতএব। এবং । এমনিতেই আমরা গো কোম্পানির পরামর্শ মত, সবদিনই পিঠের ব্যাগে কিছু শুকনো খাবার, সন্দেশ এসব নিয়েই বেরোচ্ছিলাম। আসলে আমাদের দেশের হিসেব মত, ওখানে সকাল সাতটায় প্রাতরাশ মানে, আমরা এগারোটার পর খাচ্ছিলাম। ওতেই দুপুরের খাওয়া হয়ে যাচ্ছিল। তবুও লম্বা লম্বা বাসের দৌড়ে, মাঝে মাঝে এটা ওটা মুখে দিয়ে সময় কাটছিল। আমার বন্ধু যোগেশ এর পেটের সমস্যার জন্য, আমার বোন প্রায় বারো দিনের খাবার দাবার ওর জন্য বয়ে নিয়ে গেছল। দিন চারেক পর থেকেই বোঝা যায়, সেই সব খাবারের বেশীর ভাগই দেশে ফিরে আসবে। বাসের মাঝের দরজার ঠিক পিছনেই আমরা পাঁচ জন বসছিলাম। প্রথম দিকে আমরা পাঁচজনই যোগেশ এর ব্যাগ থেকে বেরোনো খাদ্য বস্তু ভাগ করে নিচ্ছিলাম। সাত দিনের পর থেকেই, আমার বোন পাশাপাশি বসা জন দশেক সহ যাত্রীকেই বিতরণ করা শুরু করলো। আমরা হোটেলে প্রাতরাশ সেরেই, সামনের পার্কে ছবি তোলার জন্য চলে গেলাম। সবুজ ঘাসের গালিচা, রোদ ঠিকরে পড়ছে এমন সবুজ গাছ, আর ওই বেগুনী বিচ, দূরে দূরে পাহাড় চূড়ায় জমে থাকা সাদা বরফ। এই প্রেক্ষাপটে ছবি তুলে আর আশ মেটে না। দ্বিতীয় দিন একজন কম বয়সী বাবা , তাঁর ছোট্ট মোমের পুতুল এর মত ছেলেকে পারামবুলেটরে বসিয়ে, সাথে একটি অতি সুন্দর কুকুর নিয়ে পার্কে এসেছিল। কুকুরটিকে একটি আলোক স্তম্ভের সাথে বেঁধে রেখে ছেলেকে নিয়ে দোলনার দিকে চলে গেল। কোথাও কোন শব্দ নেই। না কুকুর, না বাচ্চা, না বাচ্চার বাবা; কারো মুখে কোন কথা নেই। প্রকৃতির ঐ বিপুল সৌন্দর্য বোধহয় ওদের নীরব করে দিয়েছে।

আমরা পৌনে নটা নাগাদ বাসে উঠে বসলাম। আধ ঘন্টার মত বাস চলল। রাস্তার পাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা আমার সামর্থের বাইরে। আমাদের দেশের কাশ্মীরের কিছু কিছু জায়গা আছে, ঐ রকম সুন্দর। আমাদের দলের একজন বারবার বলছিলেন, হিমাচল প্রদেশের বহু জায়গা দেখেছেন। তারপর আর কাশ্মীর যাওয়ার ইচ্ছা হয়নি। অবশ্যই ঠিক একমাস আগের পাহেলগাম কাণ্ড আরও বেশী মানুষকে কাশ্মীর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য করেছে। বাস থেকে নেমে আমরা ক্যেবলকার ষ্টেশন এ ঢুকলাম। আমরা যাকে রোপওয়ে বললেই ভালো চিনি। অবশ্য কাশ্মীরের গুলমার্গের এই রোপওয়ে " গন্ডোলা" নামে পরিচিত। কেবলকার কি করে গন্ডোলা হয়ে গেল, জানিনা। ভেনিসের আসল গন্ডোলা কিন্তু দাঁড় টানা ডিঙ্গি নৌকা। ভেনিসের গণ্ডলার কথা আমি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে শুনেছিলাম, আমার চোখের ডাক্তার দাদা, কলকাতার বিখ্যাত "বাবুলাল" দাদার কাছে। তখন কিন্তু দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে, আমিও একদিন ভেনিসে গিয়ে গন্ডোলায় চাপব। আসলে চল্লিশ বছর আমাদের মত ক্ষনজীবী মানুষের কাছে, বহু দিন।

ক্যেবলকার থেকে দেখা

এই ক্যেবল কার আর ট্রেনে যাওয়া আসা, লিফটে করে ওঠা ইত্যাদী সব মিলে , ইউরোপের ছাদ মাউন্ট জুংফ্রাউ দেখার জন্য, দুই শ পাউন্ডের টিকিট কেটে রাখতে হয়। আমাদের গো কোম্পানি আগেই সবার টিকিট কেটে রেখেছিল। ওরা একেবারে প্রথমেই যে খরচের হিসাব দিয়ে দেয়, সেখানে পরিষ্কার করে লেখা থাকে, এই জুংফ্রাউ পাহাড়ে ওঠার আর লণ্ডনের ‘লণ্ডন আই’ নাগর দোলায় চাপার টিকিট, দুটি মিলে প্রায় ২৮৫ ইউরো, ইচ্ছা করলে কেউ বাদ দিতে পারেন। আমাদের দলের কেউ বাদ দেয়নি। এই কেবলের স্টেশনটিও বেশ বড় , সাজানো গোছানো। একসাথে প্রায় চার-পাঁচ ‘শ লোক আমরা হাজির হয়েছিলাম। ওঠার আগে শ দেড়েক লোকের লাইন পড়ল। টিকিট কাটার সময়ই কটার সময় লাইন দিতে হবে, লেখা থাকে। আমরা আধ ঘন্টা আগে পৌঁছে গেছি। এদিক ওদিক বেশ কিছু বসার জায়গা করা আছে। আর আছে জরুরী সেই জিনিসটি; বিনামূল্যের শৌচালয়। আমরা শৌচালয় ব্যবহার করে এদিক ওদিক বসে গেলাম। একদিকে কাচের জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছিল, কেবলকার উঠে যাচ্ছে। ঐ সকল দেশে দেখেছি, যেখানেই এইরকম লোকজনের কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়, সেখানে দুই একটা দোকান আছে। এমনকি আইফেল টাওয়ারের তিন তলায়ও কয়েকটি দোকান দেখেছি। মিনিট দশেক লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা রোপ ওয়েতে ওঠার সুযোগ পেলাম। এক একটিতে দশজন করে বসার জায়গা। যে কোন ধরনের রোপ ওয়েতে ওঠার সময় বাইরের দৃশ্য সুন্দর লাগে। এখানে তো সব দিকই

সুন্দর। নিচের দিকে, পাহাড়ের গায়ে কিছু পাইন জাতীয় গাছ। কিছু সময় ওঠার পর চারিদিক বরফে সাদা। আমরা সবাই কালো চশমা চোখে দিয়েই বেরিয়েছি। সাদা রঙের পাহাড়ের গায়ে উজ্জ্বল রোদ পড়লে ব্যাপারটা যে চোখ অন্ধ করে দেওয়ার মতো বিপজ্জনক, সেই খবর চোখের ডাক্তারী পড়ার সময় পড়েছিলাম। আজ সেটা নিজেই বুঝলাম। এক জায়গায় দেখি নিচে, এক হাঁটু বরফের উপর দিয়ে দুজন মানুষ হেঁটে চলেছে। মানুষের ঐ সাহস দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। অবাক হওয়ার আরও অনেক কিছু উপরে অপেক্ষা করছিল, আমাদের জন্য।

রোপ ওয়েতে চড়ে পৌঁছলাম একটি রেল স্টেশনে। দুইজন কর্মচারি লাইন ঠিক করে দিচ্ছিল। প্ল্যাটফর্মে এ বি সি ডি এরকম এলাকা ভাগ করে করে আমাদের দাঁড়াতে বলল। আমরা সি এলাকায় দাঁড়ালাম। সুন্দর লাল রঙের ট্রেন এল। ভেতরের বসার আসনগুলিও বেশ ভালো। পঞ্চাশ মিটার মত চলার পর, ট্রেন মেট্রোর মত টানেলে ঢুকে গেল। মিনিট পনের কুড়ি চলার পর আমরা নামলাম। এরপর উপরে উঠতে হবে লিফটে করে। নিচেই একটি বড় বোর্ডে, লিফট থেকে বেরিয়ে কোথায় কোন দিকে যেতে হবে তার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গো কোম্পানির দুটি দলই একসাথে চলেছি। পবন ছাড়া আর একজন ম্যানেজার অন্য দলের জন্য ছিল, তার ডাক নাম, কারফা। এই করফা আমাদের সকলকে বুঝিয়ে দিল, উপরে উঠে পরপর কোথায় কোথায় যেতে হবে। সব শেষে আবার নেমে এসে কোথায়, কখন সবাই জমায়েত করতে হবে। লিফটে উঠে প্রথমেই আমরা মাউন্ট জুংফ্রাউ এর সবথেকে উঁচু জায়গায় পৌঁছলাম। সেখানেই লেখা আছে “ টপ অফ ইউরোপ!” আমাকে অনেকে সেই সময় লিখে জানিয়েছিলেন যে, ইউরোপের সর্বোচ্চ চূড়া ওটা নয়। আমি আর কোথাও তথ্য যাচাই করে দেখিনি। এই জায়গাটা খুব একটা বড় নয়। একটা ভলি বল খেলার মাঠের মত হবে। সবদিক সুন্দর ভাবে ঘেরা

আছে। সেই বেড়ার গায়ে গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট তালা লাগিয়ে গেছে লোকজন। এটা নাকি ওদের একটা কুসংস্কার। আমরা উওর ভারতের অনেক মন্দিরে হাজার হাজার, ছোট বড় পিতলের ঘন্টা ঝোলানো দেখেছি। গাছের গায়ে রঙিন সুতো জড়াতে দেখেছি। চাকদার রেল লাইন এর পাশে একটি গাছে, মানত করে পাথর ঝোলানো দেখেছি(আজগুবি তলা) ।

এখানেই আমি খেয়াল করলাম, আমাদের সাধারণ শীতের পোশাকে ঠাণ্ডা সেরকম লাগছিল না। কিন্তু ছবি তোলার জন্য গ্লাভস খুললে, আঙুল কেটে যাবে মনে হচ্ছিল। একটা যে শিরশিরে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল, সেটাই মারাত্মক। পরে লিফটের সামনে একটি মেসিনে দেখলাম, মাইনাস এগারো ডিগ্রী তাপমাত্রায় ঘুরে এলাম।

লিফটে এক তলা নেমে ঢুকলাম বরফের সুড়ঙ্গে। প্রায় আধ কিমি একটা বরফের টানেল। হালকা আলোয় হেঁটে ঘুরে আসতে মিনিট দশেক লাগল। ভেতরের সব কিছুই বরফের। রাস্তা, দেওয়াল, ছাদ, নানান ধরনের বরফের ভাষ্কর্য। কয়েকটি ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হল। ভেতরের তাপমাত্রা মাইনাস সাতাস ডিগ্রী করে রাখা। কিন্তু বাতাসের ঝাপটা না থাকায় সেরকম ঠাণ্ডা মনে হয় না। টানেল থেকে বেড়িয়ে গেলাম " প্লেটু" দেখতে। এটা একটা ফুটবল মাঠের মত উঁচু নিচু বরফের প্রান্তর। এটাতে ঢোকার মুখে লোকজনের পায়ের চাপে বরফ শক্ত হয়ে খুবই পিছল হয়ে আছে। ম্যানেজার দুজনে বারবার সাবধান করে দিয়েছে; দড়ি ধরে প্রান্তরের দিকে এগিয়ে গেলাম। এখানে আমাদের দলের পাঁচজন আছাড় খেয়ে পড়েছেন। এখানে যেন বরফ আরও সাদা। আমি ব্যাপারটা দেখার জন্য, সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য, কালো চশমা একটু তুলে দেখলাম। অসম্ভব। কালো চশমা ছাড়া দু' মিনিট থাকলে, চোখ অন্ধ হবেই। অনেক ছবি আর ভিডিও তুলে ফিরে এলাম।

বরফে ঢাকা প্লেটু

ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে একটি বেশ ছড়ানো বিশ্রামের জায়গা মত আছে। একটি খাদ্য পানীয়ের দোকান। অন্তত একশ লোক বসার মত চেয়ার বেঞ্চ আছে। আমরা যে যেখানে পারা যায় বসে , ব্যাগ থেকে শুকনো খাবার খেতে শুরু করলাম। দোকানে খুব একটা কেউ কিছু কিনছে বলে দেখলাম না। দুই একজন কফি কিনে নিয়ে বসেছে। দোকানের কর্মচারী ছেলেটি, ময়লা ফেলার পাত্রের থেকে বস্তা ভরে, আমাদের ফেলা কাগজের প্যাকেট, প্লাষ্টিক, ডিমের খোলা নিয়ে গেল।

সময় হলে ম্যানেজারের ডাকে সকলে প্ল্যাটফর্মের ঢোকার মুখে লাইন দিলাম। ঐ সময় যে ট্রেন এল তার থেকে একদল ধুতি পাঞ্জাবি পরা, হরিনামের ঝোলা গলায় লোক নেমে , আমরা যেই দিক থেকে ফিরেছি, সেই দিকে চলল। এক দুই জন করে, আমরা প্রায় সবাই ওদের দেখে, " হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" ধ্বনি দিতে থাকলাম। আবার সেই রকম কর্মচারীদের নির্দেশ মত সকলে ট্রেনে উঠে বসলাম। এই উপরে অনেকের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, এরকম বলে দিয়েছিল ম্যানেজারেরা। ট্রেন ছাড়ার পর একজনের শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বলায় তাঁকে কর্পূরের গন্ধ নিতে বলা হল। আমাদের দলেরই কেউ ছোট কৌটোয় কর্পুর নিয়ে গেছিলেন। একটু পরে আমাদের কন্যাও শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে বলল। সাথে সাথেই ম্যানেজার কারফা ছুটে এল। ওকে দেখে একজন মহিলা কর্মচারী ছুটে এসে আমার মেয়ের শীতের পোশাক খুলে দিতে বলল। তাঁর কাছে শক্ত কাগজের ঠোঙা ছিল; সেটা আমার কন্যার হাতে দিয়ে, বমী হলে সেই ঠোঙায় করতে বললেন। ওর বমি হল না। জানালার কাঁচ নামিয়ে বাতাসের দিকের আসনে বসতে বললেন। আমি উল্টো দিকের আসনে বসার একটু পরে আমারও একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ব্যপারটা আসলে শ্বাস কষ্ট নয়। ঐ রকমের মাইনাস এগারো ডিগ্রী থেকে নেমে, ট্রেনের টানেলে ঢুকে, মোশন সিকনেস হচ্ছিল। প্রকৃত শ্বাস কষ্ট হলে, কর্পূরের গন্ধ কোন কাজ করার কথা নয়। টানেল থেকে বেরিয়ে একটি স্টেশনে নেমে, অন্য একটি ট্রেনে চেপে , নীচে নেমে এলাম। এই স্টেশনেই খেয়াল করলাম, এই রেল লাইন দুটির মাঝে আর একটা বড় বড় দাঁতের লাইন আছে। এই লাইন ট্রেনকে পিছন দিকে গড়িয়ে নামা থেকে আটকায়।

দ্বিতীয় ট্রেন ও মাঝের দাঁতাল লাইন

দ্বিতীয় ট্রেন থেকে নেমেই আমাদের সাদা বাস পেয়ে গেলাম। নামার সময় আর রোপ ওয়েতে ওঠার ব্যাপার নেই। এবার একটু মেঘ করে এল। আমরা বাসে উঠে চললাম, ইন্টারলেকেন। এই জায়গাটা ভারতীয়দের কাছে একটা গর্বের জায়গা। সেসব কথা আগামী পর্বে লিখব।

এই পর্বটা লেখার মাঝে অন্য কয়েকটি কাজে হাত দিতে হল। আগেই বোধহয় বলেছি; আমার প্রিয় ভাই , বাঁকুড়ার শিক্ষক, সৌম্য সেনগুপ্ত আমাকে একটি ওয়েব সাইট তৈরি করার কাজে লাগিয়ে দিল। ওর মত এইরকম কয়েকজন ভ্রাতৃপ্রতীম " গুরু" আমাকে দিয়ে এইরকম অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছে। আমার নিজের উদ্যোগে ঐ সকল কাজ হয়তো করাই হত না। সৌম্য সেনগুপ্ত আমাদের সাপের কামড় এর প্রশিক্ষক দলের একজন। ওর অনেকগুলো যুগান্তকারী কাজ আছে। আমার ওয়েবসাইট www.dayalbandhu.vip এর "Our Trainers" পেজে গেলে ওর কাজের নমুনা পেয়ে যাবেন।

এছাড়া কোলকাতা দূরদর্শনের চঞ্চল বাবু প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ফোন করে, আগামী পরশু, নয় জুলাই বিকেলে , "সুস্বাস্থ্য" অনুষ্ঠানে সাপের নিয়ে বলার জন্য ডেকে রেখেছেন। আমার সাথে থাকবে, আমার প্রিয় ছাত্র, সুবক্তা ডা শুভেন্দু বাগ। ঐ টিভি অনুষ্ঠানের জন্য ছবি আর ভিডিও ক্লিপ গুছিয়ে নিতে, প্রায় দুই দিন গেল। সময় হলে, বুধবার বিকেল ছয়টায় টিভি খুলে, আমরা কি বলি শুনতে পারেন। ফোন করার সুযোগ থাকে; কিন্তু এত বেশী ফোন থাকে যে, সিকি ভাগও ওনারা নিতে পারেন না।

মাঝে আর একটা বড় লেখায় হাত দিতে হল। আমার নিজের জেলা মেদিনীপুরের এক সাংবাদিক বছর সাতেক আগে আলাপ হলেও, এখন জানলেন যে আমি আসলে মেদিনীপুরের ভূমি পুত্র। উনি আমার কাজ কর্ম নিয়ে একটা নিবন্ধ লিখতে চান, ওনাদের কাগজের জন্য। ফোনে বার পাঁচেকের চেষ্টায়, আধ ঘন্টা মত রেকর্ড করে, হাল ছেড়ে দিয়ে, আমাকেই লিখে দিতে বলেছেন। ৬৬ বছরের গল্প অন্তত একশ লাইনে লিখতে হল। ওদের বিখ্যাত কাগজ এত জায়গা দেবে না জানি। একটু একটু করে গুছিয়ে রাখার জন্য, লিখেই ফেললাম। পরে হয়তো আমার ওয়েব সাইটে দেওয়া হবে।

আজ সাতদিন হল পায়ের প্লাস্টার কাটা হয়েছে। টান এখনও আছে। দিন তিনেক হল সকালে হাঁটতে বেরোচ্ছি। আগের থেকে অর্ধেক রাস্তা হেঁটে আসতে, আগের থেকে বেশী সময় লাগছে। ভালো কথা, আজই বিকেলে আকাশবাণী কলকাতা থেকে ফোন করে, সামনের সোমবার রাত আটটায় একটা লাইভ প্রোগ্রাম এর জন্য যেতে নিমন্ত্রন করলেন। আমার গুরুদেব, ডা হিম্মত রাও বাভাসকর স্যার দুদিনের জন্য কলকাতায় আসছেন, এই সপ্তাহের শেষে। স্যারকে প্রণাম করতে যেতে চাই। কোথায় যাওয়া যাবে, এখনও জানি না। আজ ৭ই জুলাই, ২০২৫। কলকাতার এদিকে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে; সারাদিন তাই বাইরে বেরোতে পারিনি। সেই জন্যই এই পর্বটা শেষ করার সুযোগ পেলাম।

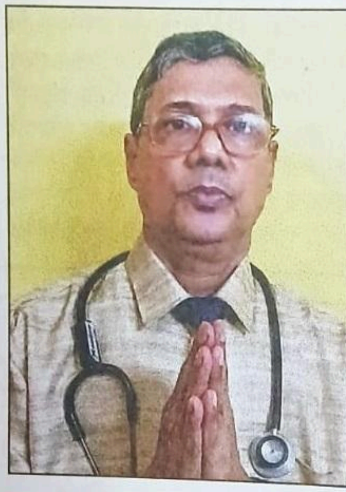

সাপের ছোবলের চিকিৎসা বিধি তৈরির কারিগর

সাপের ছোবলের চিকিৎসায় তাঁর নাম আসবেই। ডাক পেয়েছিলেন, জাতীয় চিকিৎসা বিধি-২০১৬ (সাপের ছোবল) তৈরির বিশেষ কমিটিতে। সাপ নিয়ে অজ্ঞতা দূর করে জীবন বাঁচানোর ব্রতী চিকিৎসক দয়ালবন্ধু মজুমদারের কাজের কথায় **আরিফ ইকবাল খান**

প্রশ্ন: সর্প দংশনের চিকিৎসা বিধি তৈরির সঙ্গে যুক্ত আপনি?

উত্তর: ২০১২ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সর্প দংশন চিকিৎসা বিধি প্রস্তুত কমিটির সদস্য। সেই চিকিৎসা বিধি, সামান্য পরিমার্জন করে, এখনও রাজ্যের সরকারি নির্দেশক (ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল) হিসেবে চলছে।

প্রশ্ন: আদতে আপনি চোখের ডাক্তার?

উত্তর: কী করে একজন চোখের ডাক্তার, প্রায় ২৫ বছর চোখের ডাক্তারি করার পর, সর্বভারতীয় স্তরের সাপের ছোবল থেকে রক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষক হয়ে গেল, সে এক

■ দয়ালবন্ধু মজুমদার। *নিজস্ব চিত্র*

দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যভবনের বড় বড় ক'জন আধিকারিককে ডেকে, সাপের কামড় নিয়ে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন তিনি। যথেষ্ট টাকা পয়সারও ব্যবস্থা করে দেন।

প্রশ্ন: সাপে কাটা চিকিৎসা বিধি কী?

উত্তর: সারা দেশের মধ্যে প্রথম, পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব, 'সাপে কাটার চিকিৎসা বিধি' তৈরি করা হয়, ২০১২ সালে। সামান্য মাজা ঘষা করে সেই বিধি আজও চলছে। এ রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে সাপের ছোবলের চিকিৎসা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সাপে কাটা রোগী

আনন্দবাজার (মেদিনীপুরের পাতা)

বিদেশ ভ্রমণ- ১৯

ইউরোপের সর্বোচ্চ চূড়া থেকে নেমে, দুবার ট্রেনে এসে আমাদের সাদা বাসে উঠে চললাম, ইন্টারলেকেন। একটি ফুটবল মাঠের মত বড় সিমেন্টের চত্বরে পৌঁছে বাস থেকে নামলাম। একটু হেঁটে একটি পার্কের মত জায়গায় পৌঁছলাম। ওখানে পৌঁছেই শুনতে পেলাম বেশ সুন্দর ইউরোপীয় বাজনা বাজছে। এই বৃন্দ বাদনের কিছুই আমি বুঝিনা। কিন্তু বাজনা শুনতে বেশ ভালো লাগছে। দেখলাম, পার্কের এক পাশে একটি কাঠের তৈরি, ঢালু ছাদ এর বেশ পুরনো ধাঁচের একটি বাড়ী। বড় বড় করে লেখা, ক্যাসিনো। আমাদের ম্যানেজার পবন বলল, ওটা ইউরোপের সবথেকে পুরনো ক্যাসিনো। ওরই সামনে, সামান্য একটা পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে তিনজন লোক ঐ বাজনা বাজিয়ে চলেছেন। পার্কের এক কোনায় একটি বাগান ঘড়ি, ঠিক সময় মত কাঁটা ঘুরে চলেছে। ঘড়ির ডায়াল সুন্দর সুন্দর ফুলের চারা দিয়ে তৈরী। ফুলগুলি অনেকটা আমাদের টাইম ফুলের মত দেখতে। বিকেলের দিকে বলে হয়তো সেরকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না। মেঘের জন্য আরও বেশী যেন সন্ধ্যা হয়ে আসছে মনে হচ্ছিল।

ঐ বাগান ঘড়ি থেকে কুড়ি মিটার মত দূরেই একটি সাত ফুট মত উঁচু মূর্তির কাছে সকলে জড়ো হয়ে গেছে দেখলাম। ঐ আমাদের গো কোম্পানির দুটি দলই। একজন দুজন করে মূর্তির সাথে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার প্রায় লাইন পড়ে গেল। ঐ মূর্তিটি ভারতীয় চিত্র নির্মাতা যশ

চোপড়ার। উনি ঐ ইন্টারলেকেনে কোন বিখ্যাত সিনেমা করে, জায়গাটিকে ভারতীয়দের কাছে বিখ্যাত করে দিয়েছেন।

আমি ছবি তোলার ওখানে না দাঁড়িয়ে, উল্টো দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনজন শিল্পী এক নাগাড়ে বাজনা বাজিয়ে চলেছেন।পিয়ানো, স্যাক্সোফোন আর স্প্যানিশ গিটার। আমি পার্কের ঘাসের উপর দিয়ে অনেকটা এগিয়ে, ওনাদের কাছে গিয়ে মিনিট দুই ভিডিও তুলে নিলাম। দুই মিনিট পর পিছন ফিরে দেখি আমাদের দলের কেউ নেই। মূর্তির পিছনের দিকে বেশ বড় একটা পার্কের মত দেখা যাচ্ছে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম। না, এদিকেও কেউ নেই। ফিরে এলাম। পার্কের পাশের বেঞ্চে আমাদের দলের এক দিদিমণি একা বসে আছেন। ওনাকে জিজ্ঞেস করে

জানতে পারলাম, আমাদের দলের সবাই কোন দিকে গিয়েছে। পার্কের এক কোনায় গাছ পালায় অন্ধকার হয়ে আছে। সেই ছায়া পথ ধরে এক দেড়শ মিটার এগিয়ে দেখলাম, দলের কয়েকজন দাঁড়িয়ে গল্প করছে। এগিয়ে গেলাম। একটা পরিষ্কার ঝকঝকে জলের নদী বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যোগেশ বলল, ওটা নদী নয়। ওটাই বোধহয় লেক। দুই একটা ছবি তুলে ফেরার পথ ধরলাম।

সেই পার্কের পাশে ওনাদের বাজনা চলছেই। যে কোনা দিয়ে পার্কে ঢুকেছিলাম, সেই কোনা দিয়েই ফিরলাম। ফেরার সময় দেখলাম, ওখানে একটি বেশ বড় , আধুনিক কাঁচে ঘেরা বাড়ী, লেখা আছে, অডিটোরিয়াম। বাসে ফিরে এলাম। পার্কের মধ্যে দাঁড়িয়েও দেখেছি, একটু দূরের পাহাড় থেকে প্যারাস্যুট নামছে। বাসে ফেরার সময়ও দেখলাম , সেই রকম প্যারাগ্লাইডিং চলছে। ফেরার সময় বেশ কয়েক মাইল, সেই নীল জলের নদী আমাদের পাশে পাশে চলল। সন্ধ্যার পর আমাদের হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে আধঘন্টা মত পরে চললাম সেই একশ মিটার দূরে খাওয়ার জায়গায়। আজ আমাদের দলকে ঢুকেই ডান দিকে, গোটা তিনেক সিঁড়ি উঠে একটি ঘরে বসে খেতে বলল। খাওয়ার আগের রাতের মতই সাজানো। মাছের ঝোল ভাত খেলাম। এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেশ করে জানলাম, মাছের নাম, পাঙ্গাস।

পরদিন সকালে এই এইচ প্লাস হোটেলে প্রাতরাশ সেরেই, হোটেল ছেড়ে বাসে উঠলাম। আজ আবার তল্পি তল্পা গুটিয়ে। আজ আমাদের সুইজারল্যান্ডে দ্বিতীয় পাহাড়ে ওঠার কথা। গতকাল সবথেকে উঁচু পাহাড়ে ওঠার আগে যেমন মনে মনে একটা রোমাঞ্চ ছিল, আজ সেরকম নেই। অনেকেই খুব বেশি শীতের পোশাকও নেয়নি। আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট মত বাসে চলে, পৌঁছে গেলাম মাউন্ট টিটলিস পাহাড়ে ওঠার, রোপওয়ের কাছে। বাস থেকে নেমে মনে হল, এখনই বৃষ্টি নামবে। খুব বেশী সময় অপেক্ষা করতে হল না; রোপওয়েতে চড়ে বসলাম। এর এক একটিতে আট জন করে বসার জায়গা। মিনিট চারেক ওঠার পর দেখলাম, কাঁচের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। দুই পাশে পাইন জাতীয় গাছ, প্রায় জঙ্গলের মত। মিনিট দশেক কি আর একটু বেশি উঠে, কেবল কার থেকে নামলাম। এখানে আর একটি কেবলকার ধরে , ডান দিকে, উপরে উঠতে হবে। উপর থেকে যে কেবল কার নেমে এলো সে যেন মেঘ ভেদ করে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। এই কার-এর মধ্যে বসার জায়গা নেই। একসাথে অন্তত চল্লিশ জন যাত্রী ঢুকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

চল্লিশ জন যাত্রী নেওয়ার কেবলকার

এই কেবল কার উপরে ওঠার সময়, একটু একটু করে ঘুরতে থাকে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রথমে পাহাড়ের যে দৃশ্য দেখতে দেখতে উঠছিলাম, ক্রমশ সেই দিকটি আমাদের পিছনের দিকে চলে গেল। এবার আমাদের কেবল কার বার দুই তিন মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেল। মিনিট দশ বারো ওঠার পর আমরা একটি ছাদ ঢাকা জায়গায় গিয়ে নামলাম। বেরোনোর দিকে এগিয়ে দেখি, সামনের চত্বর মেঘে ঢাকা। কয়েকজন সেই মেঘ ঠেলে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। কুড়ি পঁচিশ মিটার পর থেকেই আর তাদের দেখাই যাচ্ছে না। আমাদের দলের আমি, আমার কন্যা আর মাষ্টার মশাই, ঘোষালবাবু সেই মেঘ এর রাজ্যে ঢুকে গেলাম। সামনের লোকজন এগিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি তাঁদের কথা শুনে। সকলকে দেখতে পাচ্ছি না। গতকাল অসম্ভব চোখ ধাঁধানো সাদা

বরফ আর উপরে ঘন নীল আকাশ দেখতে পাচ্ছিলাম। আজ পায়ের নিচের প্রান্তর ঝুরঝুরে বরফে ঢেকে আছে, আকাশ দেখা যাচ্ছে না। আমাদের ঘিরে কুয়াশার মত মেঘ। তার মধ্যেই ভিডিও তুলে চলেছি। সামনের লোকজনের কথার শব্দ শুনে শুনে এগিয়ে চললাম। দুই একজন ফিয়েও আসছে। তারাই কেউ কেউ বলল, ফ্লাইং চেয়ার বন্ধ আছে।

বরফ পড়ছে

আসলে এই ফ্লাইং চেয়ার ব্যাপারটা কি, বা ঠিক করে এই নামটা আমি পরে জেনেছি। তার আগে তো কোনদিন ঐ ব্যাপারটি সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কয়েকশ মিটার ঝুরঝুরে বরফে ঢাকা মাঠে হেঁটে, আমি আর আমার কন্যা ভিডিও করতে করতে এগিয়ে গেলাম। আমাদের আগে আগে মাষ্টার মশাই ঘোষালবাবু। এক জায়গায় একটু ডান দিকে, মেঘের মধ্যে একটি উঁচু বাড়ী মনে হল। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, ওটা একটা দশ তলা হোটেল তৈরী করা হচ্ছে। আরও এগিয়ে এক জায়গায় গিয়ে মনে হল, একটি লোহার গেট আটকে আর আগে যেতে দিচ্ছে না। আমরা পাঁচ ছয় জন ঐ গেটের সামনে হাজির হতে, একজন কর্মচারী এসে গেট খুলে দিল। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। এই সময় একটি ফ্লাইং চেয়ার থেকে চার-পাঁচ জন নেমে এলেন। আস্তে আস্তে চলতে থাকা চেয়ারে আমাদের উঠে বসতে বলল। আমরা তিনজন ছাড়া মুম্বই থেকে আসা দুইজন, মোট পাঁচ জন একটি চেয়ারে বসে গেলাম। পাঁচ জনের বসা হয়ে গেলে একজন কর্মচারী সামনের মোটা রডের মত হাতল নামিয়ে আমাদের আটকে দিল। রোপ ওয়েতে যেমন

কাঁচে ঢাকা ঘরের মধ্যে বসে বা দাঁড়িয়ে উঠেছি, এটাতে খোলা লম্বা চেয়ারে পাঁচ জন বসে গেলাম। চেয়ার আস্তে আস্তে চলতে চলতে আমাদের নিয়ে মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল। সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

স্কাইং চেয়ার

মাষ্টার মশাই আনন্দে উত্তেজনায় হৈ হৈ করতে থাকলেন। এসময় মুম্বই এর মহিলা হিন্দিতে জানতে চাইলেন, এই লোকটা এত চেঁচামেচি করে কেন?! চেয়ার একবার মেঘে ঢুকে যায়, আবার বেরিয়ে আসে। সামনের চেয়ার প্রায় দেখাই যায় না। এইভাবে মিনিট দশেক লাগল এক পাক ঘুরে আসতে। কর্মচারি সামনের রডের মত বেড়া খুলে দিল, আমরা নেমে এলাম। আর একদল ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিল, তারা উঠে বসল। আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে, বাঁ দিকে আরও এগিয়ে গেলাম। মেঘের জন্য ভালো করে বোঝা যায় না। একটা লোহার শক্ত জালের সেতু মত দিয়ে একশ মিটার মত হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এলাম। লোহার জালের রাস্তায় আর দেওয়ালে পেঁজা তুলোর মত বরফ জমে আছে। দেওয়ালে পা দিয়ে আঘাত করলে, বরফ ঝুরঝুর করে পড়ল। হালকা তুলোর মত বরফ উড়ে এসে আমাদের পোশাকে আটকে যাচ্ছে। এক-দুই জন দেখি ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটছে । ফেরার সময়, মাঠের মধ্যে একজন মানুষ বরফে আছাড় খেয়ে পড়েছেন। তাঁকে জন দুই লোক আর এক মহিলা, টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। এক মিনিট পর দেখলাম, সেই মহিলা দৌড়ে আমাদের ছাড়িয়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। পরে শুনেছি, সেই ভদ্রলোক আর উঠে বসতে পারেননি। তাঁকে তুলে আনার জন্য কোন কর্মচারি বা হুইল চেয়ার জাতীয় কিছু নেওয়ার জন্য ঐ ভদ্র মহিলা ছুটে যাচ্ছিলেন।

আমরা প্রায় গেটের কাছে এসে দেখি, আমার বোন, আমার কন্যাকে ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করছে। পরে জেনেছি, ওর পিসেমশাই, ওখানে যে গোটা তিনেক ঘড়ির দোকান আছে তার থেকে একটি দামী ঘড়ি কিনতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে, তাই আমার কন্যার সাহায্যে, ঘড়ির দাম মেটানোর জন্য ডাকাডাকি। যোগেশের বিদেশী মুদ্রা বিনিময় কার্ডে কিছু সমস্যা হয়েছিল। ওটা তো মিটল। কিন্তু ওই যে ফেরার সময়, বোনের ডাকাডাকিতে এক সেকেন্ডের জন্য অন্য মনস্ক হয়েছিলাম, তাতেই ঘটল একটা বিপত্তি। সে এক বিরাট গল্প। পরে কখনও বলা যাবে। আজ আমরা আবার সেই দুটি কেবল কার ধরে নীচে নেমে এলাম। বাস ধরে চললাম, সুইজারল্যান্ডের আর এক শহর লুসার্নের উদ্দেশ্যে।

আজ ১২ ই জুলাই। মাস দেড়েক হয়ে গেল, বিদেশ ভ্রমণ করে ফিরে এলাম। কিন্তু মাঝে কয়েকটা বিশেষ কাজে এই লেখার কাজ আটকে গেল। দিন চারেকের দিন রাতের চেষ্টায়, আমার নিজের ওয়েবসাইট খাড়া করা হয়েছে। ওখানে আমার পুরোনো লেখাগুলি প্রতিদিন তিন-চারটি করে তুলে রাখছি। বছর খানেক পর আর একটা টিভি প্রোগ্রাম করলাম, তার জন্য ছবি ইত্যাদি গোছাতে দিন দুই গেল। গতকাল থেকেই, ঠিক আগের মত বাইরে কাজে বেরোনো শুরু করেছি। বই এর মনোজদার সাথে আবার যোগাযোগ হল, বছর ছয়েক পরে। ওনার চাপে এবার হয়তো এই ভ্রমণ কাহিনী লেখা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে।

বিদেশ ভ্রমণ -২০

টিটলিস পাহাড়ে ওঠার সময় টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু পাহাড়ের উপর স্নো ফল হলেও, প্রথম অর্থাৎ রোটেটিং কেবল কার থেকে নেমেই আর বৃষ্টি দেখিনি। বাসে লুসানের দিকে যাওয়ার সময় মেঘ ছায়া থাকলেও বৃষ্টি ছিল না। ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সে যেমন একেবারে শরৎ কালের মত সাদা মেঘ উড়তে দেখেছি, এদিকে সেই রকম আকাশ দেখা গেল না। মেঘ একটু জলে ভরা।

লুসার্ন পর্যন্ত যে রাস্তা দিয়ে বাস চলল তার পাশে পাশে মাঝে মাঝে রেল গাড়ি যেতে দেখেছি। এদিকে আর পাহাড়ী রাস্তা নেই। দূরে দূরে পাহাড়, আর পাহাড়ের চূড়ায় সাদা বরফ। শহরে ঢোকার পরই একটি স্বচ্ছ জলের নদী বা হ্রদের উপর দিয়ে সেতু পেরোলাম। এই কংক্রিটের সেতুর থেকে একশ মিটার মত দূরে আর একটি কাঠের ছাদ ঢাকা, কাঠের সেতু দেখতে পাচ্ছিলাম। নদীর ওপারে গিয়ে, বাঁ দিকে একটু চলেই, সেই কাঠের সেতুর কাছে গিয়ে আমাদের বাস দাঁড়াল। এই নদীর নাম জানলাম, রিউস নদী।

রিউস নদী ও চ্যাপেল ব্রীজ

এই কাঠের সেতু একটি বিখ্যাত দর্শনীয় জিনিস। যারাই সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে আসে , এই সেতু দেখতেই একবার এই শহরে আসে। এর নাম, চ্যাপেল ব্রীজ। প্রায় দেড় দুইশ মিটার লম্বা এই কাঠের সেতু প্রায় তিনশ বছর আগে তৈরী। ঢালু দোচালা কাঠের ছাদ ঢাকা। হাঁটার পাটাতনের

থেকে প্রায় দশ মিটার উপরে, ছাদের নিচে নিচে প্রতিটি তিন কোনা জায়গায়, কাঠের উপর বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকা। সম্ভবত বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনা আঁকা আছে। আমি যে কটার দিকে মুখ তুলে তাকালাম, সবকটি ছবির উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝে কোন এক সময়, আগুন লেগে এই সেতুর কিছু অংশ পুড়ে যায়। সেগুলি নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। বেশ বোঝা যায়, সেতুর উপর যে শ খানেক লোক হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবই আমাদের মত ট্যুরিষ্ট। আমাদের দলের অনেকে বোধহয় একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে এসেছে। আমি প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে, কিছু ছবি তুলে ফিরে এসেছি।

৩০০ বছরের পুরনো কাঠের সেতু

টিটলিস পাহাড়ে ফেরার সময় একটু অন্যমনস্কতার জন্য বরফে আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম। একজন ভদ্রলোক আমাকে হাত ধরে টেনে তোলার পর হেঁটে ভেতরে ঢুকলাম। আমার সাথে আমার কন্যাও পড়েছিল; আর ওকে তুলতে এসে ওর পিসিও। মেয়ের খুব শখের একটা সেল্ফি ডান্ডা ছিল। পড়ার সাথে সাথেই সেটার মাথা ভেঙ্গে মোবাইলটা আলাদা হয়ে গেল। সেই ডান্ডা একেবারেই অকেজো হয়ে গেল। আমাদের দলের পাঁচজন, আগের দিন মাউন্ট জাংফ্রাউ পাহাড়ে আছাড় খেয়ে পড়েছেন। সবমিলে আমাদের দলের তিরিশ জনের মধ্যে আটজন বরফে আছাড় খেয়েছি। আমার পায়ের গোড়ালির কাছে একটা চোট লেগেছিল, তখনই বুঝেছি। তারপর

একেবারে লুসার্ন শহরে এসে, বাস থেকে নেমে হাঁটাহাঁটি। ঐ চ্যাপেল ব্রীজ দেখতে হাঁটার সময় ডান পায়ে একটা টান লাগছিল। সেরকম ব্যথা ছিল না। দুপুরের খাবার খেয়ে একটা সাধারণ ব্যথার ওষুধ খেয়ে নিয়েছিলাম। একেবারে রাত্রে হোটেলে ঢুকে, মোজা খুলে দেখলাম গোড়ালী বেশ ফুলে আছে। যোগেশ এর কাছে বেশ কড়া ব্যথার ওষুধ ছিল, রাত্রে তাই একটি খেয়ে শুয়ে গেলাম। পরদিন সকালে ব্যথা প্রায় নেই। তাই ঐ চোট প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু হাঁটাহাঁটি করতে গেলে একটা টান থেকেই যাচ্ছিল।

বিদেশে যেতে গেলে , মেডিক্যাল আর ট্রাভেল ইন্সুরেন্স না থাকলে ভিসাই হবে না। আমাদেরও ছিল। কিন্তু বিদেশে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে বা পায়ের X-Ray করতে কি পরিমাণ সমস্যা হয়, সেটা আর দেখা হল না। একেবারে দেশে ফিরে, সাত - আট দিন পর ঐ সকল কান্ড করে, পায়ে প্লাস্টার নিয়ে একমাস ঘরে বন্দি থাকলাম। প্লাস্টার কাটা হয়েছে প্রায় তের দিন আগে। এখনও সম্পূর্ন স্বাভাবিক হাঁটতে পারছি না; একটু টান আছে। পা ভেঙ্গে একেবারেই দাঁড়াতে না পারলে, হয়তো সহ যাত্রীরা টেনে বাসে তুলে নিত। লুসার্নে হয়তো আমাদের ম্যানেজার পবন ডাক্তার খুঁজে বের করতে পারত। কিন্তু গোটা দলের কাছে ব্যাপারটা কি রকম একটা হুজ্জতির কাণ্ড হত, ভাবাই যায় না। এই প্রসঙ্গে একটা ঐতিহাসিক তথ্য জানিয়ে রাখি। লুসার্ন শহরে গেছলাম, ছবি বা ভিডিও দেখেই আমার প্রফেসর বন্ধু ডক্টর সেন জানিয়েছিলেন, ঐ লুসার্নের কোন স্যানাটোরিয়াম এ জহরলাল নেহেরুর পত্নী মারা যাওয়ার সময়, নেহেরুর সাথে আমাদের প্রাণের মনুষ, সুভাষ চন্দ্র বসুও উপস্থিত ছিলেন। তখনও উনি " নেতাজী" হন নি।

চ্যাপেল ব্রীজ দেখে নিয়ে আমরা দুপুরের খাবারের জন্য একটি দোতলার রেস্টুরেন্টে গিয়ে উঠলাম। সেই বার্গার, আলু ভাজা আর ঠাণ্ডা পানীয়। ওখানেই দেখলাম, একজন বিদেশিনী মা তাঁর দুই শিশু কন্যাকে নিয়ে, আমাদের মতোই বার্গার আর আলুভাজা খাচ্ছেন। নিচে নেমে আমরা সবাই দল বেঁধে একটি বড় দোকানে ঢুকলাম। এখানে সুইজারল্যান্ডের লোগো আঁকা নানান জিনিস বিক্রী হচ্ছিল। সকলেই কিছু না কিছু কিনছে দেখে আমিও একটি উলের টুপী কিনেছি। এখানে বিদেশে কেনা কাটার একটু খবর দিয়ে রাখি। আমাকে এর মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞেশ করেছেন, ট্যুর কোম্পানী যে প্রায় চার লাখ টাকা নিয়েছে, তার বাইরে আর কত কি খরচ। আমার মূল্যায়ন হল, এক টাকাও অতিরিক্ত খরচ না করে আপনি বারো দিনের ভ্রমণ করে ফিরে আসতে পারেন। আমার কন্যা আর তার পিসি, কত হাজার টাকার চকলেট কিনেছে,

আমি ভয়ে জানতে চাই নি। সুইজারল্যান্ডে গিয়ে ঘড়ি কিনেছে প্রায় সবাই। এক একটির দাম শুনে আমার মত , সাড়ে তিন শ টাকার ঘড়ি সাতাশ বছর ধরে পরার লোক যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাইনি সেটাই যথেষ্ট। আমাদের দলের এক ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রী গোটা পাঁচেক ট্রলি ব্যাগ ভরে এত জিনিস কিনেছেন যে, রোম বিমান বন্দরে , গোটা তিনেক ট্রলি ব্যাগ খুলে, মেঝেতে বসে, ওজন বন্টন করে নিচ্ছেন, দেখেছি। আমার কন্যা আর তার পিসি, লুসার্ন শহরে পৌঁছনোর আগে বাড়ীর সবার জন্য কিছু না কিছু কিনেছে, খেয়াল করেছি। আমার ভয় ছিল, আমার জন্যও না কয়েক হাজার টাকা খরচ করে ফেলে। তাই ঐ দোকানে নয় দশমিক আট ইউরো দাম দেখে , একটা টুপী কেনাই যায়, ঠিক করলাম। আসলে ঐ রকম একটি টুপী, আগের এক শহরে, আমাদের সহযাত্রী "রাজ্যপাল" মশাই ঊনত্রিশ ইউরো বা তারও বেশি দিয়ে কিনেছেন, জানতাম। আমাদের একেবারে প্রথম দিন, গো কোম্পানির আপিসে ট্যুর বুকিং করার সময়, ওদের এক বরিষ্ট কর্মকর্তা বলেছিলেন, হাত খরচের জন্য, সাত আট হাজার টাকা নগদে নিয়ে যাবেন। ওটা টাকা , না ইউরো কি বলেছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই। আমি তো ঐ সাড়ে নয় শ টাকায় টুপিটি মাত্র কিনেছি। আসলে, মাইনাস এগারো ডিগ্রী তাপমাত্রায় ঘুরে এলাম, একটা একশ টাকা দামের মঙ্কি ক্যাপ মাথায় দিয়ে। সাড়ে নয় শ টাকার টুপী মাথায় থাকলে, ওর দাম মনে পড়লেই, গা গরম হয়ে যাবে!

ঐ টুপী কেনার দোকান থেকে বেরিয়ে যেদিকে তাকাই, বড় বড় ঘড়ির দোকান। ওখান থেকে সকলে হেঁটে চললাম, এক দেড় কিমি দূরের , লায়ন মনুমেন্ট দেখতে। অত্যন্ত পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে, লুসার্ন শহরে একটু হেঁটে, পৌঁছালাম লায়ন মনুমেন্ট এর কাছে। ভালোই দর্শক হাজির হয়েছে। সকলেই পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা, তীর বিদ্ধ সিংহের মূর্তির সাথে সেলফি বা দলে দলে ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত। কয়েকটি ফলকে, ওদেশের ইতিহাসে বা উপকথায় ঐ সিংহ মূর্তি সম্বন্ধে লেখা দেখলাম। খুব একটা উৎসাহ পেলাম না, পড়ার। আসলে গোটা ইউরোপ ভ্রমণ এর মধ্যে, ঐ সিংহ পাহাড়ের সামনের জলাশয়টিকে সবথেকে নোংরা মনে হল আমার। অত্যন্ত অযত্নে পড়ে আছে।

পাহাড়ে খোদাই লায়ন মনুমেন্ট

লুসার্ন থেকে আমাদের বাস চলল, জুরিখের দিকে। আরও ঘন্টা দেড়েক চলে, বাস পৌঁছল, রাইন ফলস এর উপরে। এই একটি জায়গায় দেখলাম, গোটা দশেক ট্যুরিষ্ট বাস একসাথে হাজির হয়েছে, কিন্তু এত বেশী গাড়ী পার্কিং এর ভালো জায়গা নেই। একটু আগে নেমে, সকলে হেঁটে এগিয়ে, পঞ্চাশ ধাপ মত নেমে, নদীর পাড়ে চলে গেল। আমার পায়ের টানের জন্য আমি আর নামার চেষ্টা করলাম না। একটু এগিয়ে দেখি, উপর থেকে সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নদী, জলপ্রপাত, নদীতে ঘুরে বেড়ানো ডিঙ্গি নৌকা, সবই সুন্দর দেখা যায়। একটু পরে দেখলাম, আমাদের দলের আরও দুই তিন জন নীচে নামেনি। কেউ কেউ হয়তো নিজেরা টিকিট কেটে, নদীতে একটু নৌকা ভ্রমণ করে নিয়েছেন।

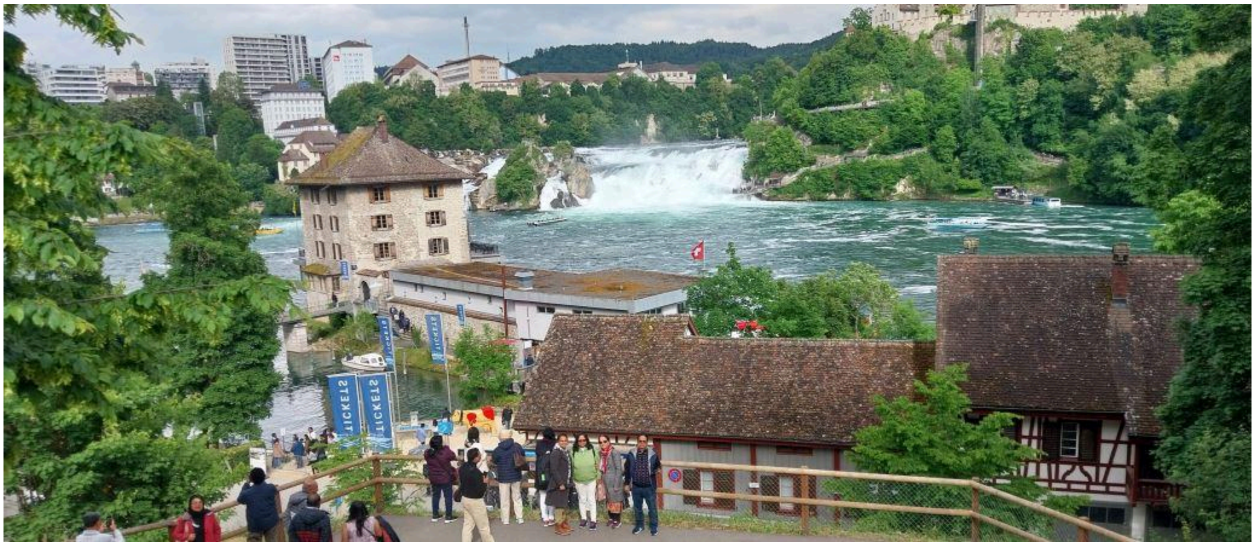

রাইন ফলস

সন্ধ্যার মুখে আমরা জুরিখ শহরের বাইরে একটি রেস্টুরেন্টে পৌঁছলাম, রাতের খাবার খেতে। বাইরে তখনও বেশ দিনের আলো। ভেতরে জায়গা খালি ছিল না। বাইরেও অনেক চেয়ার সোফা ইত্যাদি বসার জায়গা ছিল। তাছাড়া ছিল এক বড় জালা ভর্তি চা। আমাদের এখানকার অনুষ্ঠান বাড়িতে যেমন রাখা থাকে, সেই রকম কাগজের কাপ পাশে রাখা ছিল। সকলেই নিজে নিজে চা নিয়ে খেলাম। ব্যবহার করা কাপ ফেলার সুন্দর একটা পাত্র থাকলেও, প্রায় কেউই সেখানে কাপ ফেলার চেষ্টা করিনি। টেবিলে টেবিলে পড়ে রইল কাপগুলি। ভারতীয় ঘাঘরা পরিহিতা, মালকিন মহিলা নিজেই চটপট সেই সব কাপ তুলে , জায়গা মত ফেললেন। একটি বাঙালি দল বেরিয়ে এলে আমরা সবাই ঢুকলাম। রাতের খাবার দাবার সব হোটেলেই পর্যাপ্ত ছিল। এখানে আলাদা যা চোখে পড়ে সেটা হল, চকোলেট ফাউন্টেন। শেষ পাতে মিষ্টান্নের বদলে, এই তরল চকলেট। চামচে করে, ছোট ছোট বাটিতে নিজেরাই তুলে নিলাম।

আধ ঘন্টার মধ্যেই জুরিখ বিমান বন্দর এর পাশের হোটেলে গিয়ে পৌঁছলাম। এদের এবারের ইউরোপ ভ্রমণ এর বারো রাত্রে আমরা যে সব হোটেলে ছিলাম, সব কটিই বেশ ভালো। এইরকম দলকে দল ট্যুরিষ্ট রাখার জন্য সব হোটেলই মনে হল, একটু শহরের বাইরে। পরদিন সকালে উঠে, প্রাতরাশের হলে গিয়ে দেখলাম, হোটেল থেকে দেড় দু' শ মিটার দূরে রান ওয়ে। বেশ কয়েকটি বিমান উঠতেও দেখলাম। আমরা এই হোটেলে ঢোকার সময় টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সকালে বেরোনোর সময়ও আকাশ মেঘলা। জুরিখ থেকে আমাদের গন্তব্য অষ্ট্রিয়া। মাঝে পড়বে জার্মানীর মিউনিখ শহর। সেই গল্প পরের পর্বে।

আজ তেরই জুলাই। সকাল থেকে বৃষ্টি ছিল না। কিন্তু দুপুর বারোটার পর খুব মেঘের ডাকাডাকি শুরু হয়েছে।

লুসার্নে

বড় ঘড়ির দোকান

চকোলেট ফাউন্টেন

হোটেলের জানালার বাইরে জুরিখ বিমান বন্দর

বিদেশ ভ্রমণ ২১

জুরিখের হোটেলে সকালে প্রাতরাশের সময়, জানালা দিয়ে দূরে বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক বিমান , আর পর পর কয়েকটির আকাশে ওঠার দৃশ্য দেখছিলাম। একটি বিমান মাঠে ছোটা থেকে আকাশে ওঠার দৃশ্য ভিডিও রেকর্ড করে নিয়েছি। এই যে একটি ছেষট্টি বছর বয়সী, প্রথম শ্রেণীর সরকারী চাকরী থেকে অবসর নেওয়া, সরকারী মতে বরীষ্ঠ নাগরীক, সেও কিন্তু ঐ দৃশ্য দেখে আপ্লুত হয়ে ভিডিও তুলে নিল। এইরকম একটা সাম্প্রতিক ঘটনা মনে পড়ল কি? আমরা দেশে ফেরার কদিন পরেই, আমেদাবাদ বিমান বন্দরে ঘটল, সাম্প্রতিক কালের ভয়ংকরতম বিমাণ দুর্ঘটনা। একটি বালক, আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে, ছাদে উঠে, ঐ বিমান আকাশে ওঠার দৃশ্য ভিডিও তুলে রেখেছিল। আমরা গোটা পৃথিবীর মানুষ, এক বালকের স্বাভাবিক কৌতূহল থেকেই এক বিশাল তথ্য পেয়ে গেলাম।

আমরা আবার তল্পী তল্পা গুটিয়ে উঠে বসলাম, আমাদের প্রিয় সাদা বাসে। এদিন সকাল থেকেই আমাদের কন্যার একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব বাড়ল। আমরা " যে যার আপন বোঝা তোলো" মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই বিদেশ ভ্রমণ এর জন্য বেরিয়েছি। কিন্তু আমার পায়ে চোট থাকায়, জুরিখ থেকেই আমাকে ট্রলি ব্যাগ টানতে বারণ করছিল, আমার কন্যা। আমার অবশ্য সেরকম কোন কষ্ট হচ্ছিল না। কখনও কখনও মনে হচ্ছিল, ট্রলি ব্যাগ এর হাতলে ভর দিয়ে চলতেই সুবিধা পাচ্ছিলাম। মোটামুটি রাত্রে একটা করে ব্যথার ওষুধ খেয়ে চলিয়ে যাচ্ছিলাম।

সকাল নটা নাগাদ জুরিখ থেকে রওনা দিয়ে , ঘন্টা চারেক পর আমরা মিউনিখ শহরে পৌঁছেছি। মাঝে , বিনা পয়সার শৌচালয় এর জন্য একটি জায়গায় নামা হল। এখানে দুটি জার্মান পরিবারের সাথে দেখা হল। আমরা জন দুই এগিয়ে গিয়ে , জার্মান পুরুষ মানুষ দুজনের সাথে একটু

কথা বললাম। ওনারা গাড়ী চালিয়ে অন্য দেশে বেড়াতে চলেছেন। ওদের দেশের মনীষী দুজন, গ্যেটে আর ম্যাক্স মুলারের নাম জানেন। আমাদের কলকাতা শহরের নাম খুব ভালো জানেন বলে মনে হল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম হয়তো শুনেছেন কখনও; তবে কি না, মহাত্মা গান্ধী বলতেই চিনলেন। ওদিকে দুই মহিলার সাথে আমার বোন আলাপ জমিয়ে নিয়েছে। ওদের দুই জনের মাঝে দাঁড়িয়ে একটা ছবি তুলে দিতে বলল আমাকে। মহিলা দুইজন দেখলাম খুশী মনেই ছবি তুলে নিতে বলল। আমরা পরের পর দেশ দেখতে দেখতে চলেছি জেনে ওরা বেশ মজা পেল।

আমরা আজ জুরিখ থেকে রওনা দিলাম, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার কোন শহরে রাত্রে থাকার কথা, আমার ঠিক খেয়াল ছিল না। আপাতত মিউনিখ শহরে চলেছি, জানালাম। বাসে ওঠার সময় জানলাম, মহিলাদের শৌচালয় অত্যন্ত নোংরা ছিল। আমরা সম্ভবত তখন জার্মানীর এলাকায় ঢুকে গিয়েছি। এই ব্যাপারটি আগে লিখিনি। আমাদের ইউ কে আর সেনজেন দুই রকম ভিসা নিয়ে আসতে হয়েছে। লন্ডনে নেমে, আর জাহাজে ওঠার আগে আমাদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করে ছাপ দেওয়া হয়েছে। হল্যান্ডের বন্দরে নেমে , সেই এক খুব হাসিখুশি মানুষের দেখা পেয়েছিলাম, অভিবাসন আধিকারিক। আমাদের দলের একজনের সাথে উনি ছবি তোলার জন্য খোপ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। সেই যে হল্যান্ডে নামার সময় অভিবাসনের কাজ করতে হয়েছিল, তারপর বেলজিয়াম, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ঘুরে আমরা জার্মানিতে ঢুকে গেলাম। আর কোথাও কোন সীমানা আছে বলেই মনে হয়নি। যেন একটা দেশের মধ্যে দিয়েই, এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরতে ঘুরতে চলেছি।

শুধু সুইজারল্যান্ড এর সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশের একটা আপিসে ঢুকে , আমাদের দলের কয়েকজনকে একটা কাজ করে নিতে হয়েছে। মাত্রই কয়েক মিনিট-এর কাজ। ওদেশে যারা দামী ঘড়ি কিনেছে, তাদের ঐ ঘড়ি কেনার ক্যাশ মেমো জাতীয় কাগজে একটা ছাপ লাগিয়ে নিতে হয়েছে। ওদেশের নিয়ম মত ট্যাক্স দেওয়া হয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে। পরে যখন বাড়ী ফিরে, অনলাইনে কিছু তথ্য পাঠানো হয়, ঐ ট্যাক্সের কিছু টাকা ফেরতেরও কি সব বন্দোবস্ত আছে। আমি আদার ব্যাপারি, ওসবের খোঁজ আর নেওয়া হয়নি। সেনজেন ভিসার ব্যাপারটি এখানে শেষ করে দিই। ঐ যে ইংল্যান্ড ছাড়া বাকি দেশগুলিতে আমরা ঘুরেছি, সবার মিলে একটিই ভিসা, সেটাই এই সেনজেন। একেবারে রোম বিমান বন্দরে, ইউরোপ ভ্রমণ সেরে ফেরার সময় আবার পাসপোর্টে ছাপ দিয়ে, বিমানে ওঠার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। আর একটা খবর। ইংল্যান্ডে মিনিময় মুদ্রা হল পাউন্ড, আর বাকি দেশগুলিতে ইউরো।

আমরা দুপুরে মিউনিখ শহরে পৌঁছেছি। ইউরোপের অন্য শহরগুলির মতোই এই শহরও বেশ সবুজ। রাস্তার পাশে পাশে অনেক গাছ। দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। শহরে ঢোকার আগেই , সেই ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে ঘটে যাওয়া " ট্র্যাজেডি" নিয়ে আমরা কয়েকজন আলোচনা

করছিলাম। লিখেছি আগে। সেই অলিম্পিক স্টেডিয়াম বাইরে থেকে চোখে দেখলাম; পাশের রাস্তা দিয়ে আমাদের বাস এগিয়ে চলল। এই জীবনে কোনোদিন কোনো অলিম্পিক স্টেডিয়াম-এ বসে খেলা দেখতে পাবো, এমন দিবাস্বপ্ন দেখার সাহস আমার নেই। অন্তত একটা স্টেডিয়াম বাইরে থেকে দেখে চোখ সার্থক হল। আমাদের ট্যুর কোম্পানী কিন্তু কোথাও কখনও বলেনি বা লেখেনি যে, এই বারো দিনের ভ্রমণ এর মধ্যে এইরকম একটা জিনিষও আমরা, দূর থেকে হলেও দেখতে পাব।

অলিম্পিক ষ্টেডিয়াম, মিউনিখ

বাস থামল গিয়ে, বি এম ডব্লু মিউজিয়াম আর শো রুমের মাঝের রাস্তায়। পৃথিবী বিখ্যাত গাড়ী তৈরীর কোম্পানির মিউজিয়ামের বাড়িটি বাইরে থেকেই বেশ সুন্দর। ওকে পিছনে রেখে ছবি তুলে, শো রুমের দিকে চললাম। আমি একেবারেই ভেতো বাঙালী। বার তিনেক সস্তার মারুতি গাড়ী কিনে, আট বছরে দশ হাজার কিমি চালিয়ে বিক্রী করে দিয়েছি। ভাগ্যিস ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল, কোভিড অতিমারীর সময় মাস তিনেক নিজেই গাড়ী চলিয়ে হাসপতালে যেতে পেরেছি। নাতি পুতির কাছে সেই গল্প করা যাবে!!! কোটি কোটি টাকার গাড়ী চোখে দেখলাম। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে তেত্রিশ লাখ টাকার মোটর সাইকেলে উঠে ছবিও তোলা হয়েছে। ব্যাস, পয়সা উসুল। যেটা বেশ দেখার মত ছিল, সেটা ওদের শৌচালয়। আমরা ঐ বারো দিনে বহু জায়গায় বিনা পয়সার শৌচালয় ব্যবহার করেছি। শৌচালয় যে এমন চোখ ধাঁধানো সুন্দর হতে পারে, নিজে না দেখলে, আমি অন্তত বিশ্বাস করতাম না।

বি এম ডব্লিউ মিউজিয়াম

গাড়ীর শো রুম থেকে বেরিয়ে, এক দেড়শ মিটার হেঁটে একটি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। আলু ভাজা আর বার্গার এর বদলে এখানে পিজা খেলাম। খাদ্যটি আমার খুব প্রিয় খাদ্য বস্তু নয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ রকম ভালো পিজা কোথাও পাইনি। পিশার বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে খুব বাজে পিজা খেয়েছি, সেই কথা আগের কোন পর্বে লেখা হয়েছে।

মিউনিখের পিজা

এর পর আমরা একটি পুরোনো প্রসাদ দেখতে গেছলাম। সে কথা পরের পর্বে লেখা যাবে। আমার কোন কোন পাঠক বলেছেন, এক একটি পর্ব বেশ বড় হয়ে যাচ্ছে, একবারে পড়া শেষ করতে পারছেন না। তাই যতটা সম্ভব টেনে রাখছি নিজেকে। এই লেখার মাঝে সেই " হিজল ফুলের গন্ধ" এসে কিছুটা সময় নিয়েছে। আজ ১৫ ই জুলাই সকালেও সেই একই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, খুব মন দিয়ে, নাক টেনে দেখলাম। আজ আর সেই (মৈত্র কাকুর) দুঃখ জাগানিয়া গন্ধটা পেলাম না।

৩৩ লাখের বাইকে কাকু

কোটি টাকার গাড়ী ছুঁয়ে দেখা

মিউনিখের রাস্তায় সাইকেল

বিদেশ ভ্রমণ ২২

মিউনিখে ভালো পিজা খেয়ে আমরা ধীরে সুস্থে হেঁটে আমাদের বাসের দিকে চললাম। রাস্তার উল্টো দিকে, শ তিনেক মিটার দূরে অলিম্পিক স্টেডিয়াম এর মাথার ছাউনী দেখতে পাচ্ছিলাম। ঐ দিকেই একটি বেশ উঁচু টাওয়ার দেখা যাচ্ছিল। মাথার কাছে, কাঁচে ঘেরা একটি গোল ঘরের মত। ওখানে নিশ্চয়ই ওঠার ব্যবস্থা আছে। এইরকম একটা উঁচু লাইট হাউসে উঠেছিলাম, ধনুষ্কডি থেকে রমেশ্বরম ফেরার পথে। ওখানে উপরে উঠতে টাকা দিয়ে লিফটে ওঠা যায়। মিনিট পাঁচেক থাকা যায় উপরে। মিউনিখে এই টাওয়ার বা স্টেডিয়ামের কাছে যাওয়ার কোন পরিকল্পনা আমাদের এই ভ্রমণ দলের নেই। এই শহরেও বেশ চওড়া চওড়া রাস্তা। বেশ গতিতে গাড়ী চলে যাচ্ছে। একটা জায়গায় আমরা উপরের রাস্তা থেকে, নীচে আড়াআড়ি চলে যাওয়া ব্যস্ত রাস্তার ছবি তুলে নিলাম। বেশ চওড়া চওড়া ফুটপাথ। এক জায়গায় কয়েকটি বেশ ছাউনী দেওয়া স্কুটি রাখা হয়েছে। তাই দেখে আমাদের দুই একজন স্কুটিতে চড়ে বসে ছবিও তোলালেন। এক জায়গায় ডজন খানেক ব্যাটারী চালিত সাইকেল সাজানো রয়েছে দেখে আমরা কজন দাঁড়িয়ে গেলাম। ঐগুলি নিশ্চয়ই ভাড়া দেওয়া হয়। সেই সময় এক যুবক হেঁটে যাচ্ছিল। তাকেই থামিয়ে ঐ সাইকেলের ব্যপারটা কি জানতে চাইলে, সে বুঝিয়ে দিল যে, ঐ সাইকেল ঘন্টার হিসেবে ভাড়া নিয়ে চালানো যায়। তার জন্য অ্যাপ আছে। মোবাইলে কিউ আর কোড স্ক্যান করে, ভাড়া দিয়ে, লক খোলা যায়। একটি রাস্তার মোড়ে, আমাদের পাশেই এক ভদ্র মহিলা সাইকেলের পিছনে বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে এসে, সিগন্যাল-এর জন্য দাঁড়ালেন। আমরা যে শ দেড়েক মিটার হেঁটে বাসের কাছে ফিরে এলাম, এর মধ্যে ঐ এক যুবক আর এই সাইকেলে মা মেয়েকে দেখলাম। চওড়া ফুটপাতের একটি অংশ সাইকেল চালানোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। ইউরোপের প্রায় সব শহরেই ঐ রকম, সাইকেল চালানোর জন্য চিহ্নিত রাস্তা দেখেছি। আর ঐ রকম ব্যাটারী চালিত সাইকেল, এক এক জায়গায় পনের কুড়ি বা তার বেশিও সাজানো দেখেছি। লণ্ডন বা প্যারিসের রাস্তায়, এক রকম খেলনা সাইকেল মত দেখে আমাদের অধ্যাপক মামার খুবই পছন্দ হয়েছিল। সম্ভব হলে একটা উনি কিনেই আনতেন। দেখতে খেলনা মনে হলেও, বেশ লম্বা চওড়া যুবকেরা, কোথাও আবার এক সাইকেলে দুই জনও উঠে, বেশ গতিতে চলে যাচ্ছে, দেখেছি।

বাসে উঠে মিনিট পনের কুড়ি পরে আমরা পৌঁছলাম, মিউনিখ শহরেই মধ্যে, নিম্ফেনবার্গ প্যালেসে। বেশ ছড়ানো, টানা প্রায় তিন চারশ মিটার লম্বা, দুই তিন তলা প্রাসাদ। বাইরের কারুকার্য সেরকম দর্শনীয় কিছু নয়, তবে একটা পুরাতন গাম্ভীর্য আছে। কোন রাজা বা সম্রাটের আমলের প্রসাদ, বা কত দিনের ইতিহাস, সেসব কথা বলে দেবার মত কোন গাইড বা কোন ফলক দেখলাম না। পরে জেনেছি, ওখানে একটা মিউজিয়ামও আছে। আমরা বাইরের বিশাল পার্কের সামনে রাস্তায় নেমে একশ মিটার মত হেঁটে ঘুরে এলাম। পরিষ্কার টানা সোজা সোজা পরিখা মত আছে। তাতে কিছু রঙ্গিন রাজ হাঁসও দেখলাম। ওদের ছবি তোলা হল। মিনিট দশেক থেকে আমরা বাসে উঠে বসলাম।

বাস মিউনিখ শহরে আরও মিনিট পনের চলে, প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলল, অষ্ট্রিয়ার দিকে। আকাশ মেঘলা ছিল। তার মধ্যে একটি সাব ওয়েতে ঢুকে মনে হল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সব গাড়ীর পিছনের আর সামনের আলো জ্বলছে। এই সাবওয়েতে বেশ গাড়ীর জ্যামে আটকা পড়লাম। প্যারিস শহরের বাইরে একদিন সকালে গাড়ী একটু আস্তে চলেছিল। মিউনিখে একেবারে কলকাতার মত জ্যামে পড়ে গেল আমাদের বাস। তফাৎ একটাই, শত শত গাড়ী, যে যার লেনে দাঁড়িয়ে আছে। কারও কোন তাড়া নেই যেন। একটা গাড়িও একবারও হর্ন বাজাল না।

হাই ওয়েতে বাস ছুটে চলল। বৃষ্টি নেই; কিন্তু মেঘলা আবহাওয়া। এক সময় আমাদের বাম দিকে, মাঠের পারে, রামধনু দেখতে পেলাম। প্রায় মিনিট দশেক দেখা গেছে, কখনও গাছ পালার আড়ালে চলে যাচ্ছে, কখনও আমাদের বাস পাশের প্রান্তরের থেকে নিচু রাস্তা দিয়ে ছোটে। আর একটা ব্যাপার রামধনু দেখার বাধা হয়ে দাঁড়ায় মাঝে মাঝেই। সেটা শুধু এখানেই নয়। আমাদের চার হাজার কিমি বাস যাত্রায়, মাঝে মাঝেই দেখেছি। বড় রাস্তার পাশে পাশে সাত আট ফুট উঁচু বেড়া। কোথাও কোথাও হয়তো টানা পাঁচ দশ কিমি চলেছে। এই বেড়া ঠিক কি জন্য আমরা বুঝতে পারিনি। আমার মনে হয়েছে, পাশের ঝোপ জঙ্গলে থাকা বন্য প্রাণী, ছুটে গাড়ীর তলায় না চলে আসে, তার জন্য এই বেড়া। কিন্তু কোথাও কোথাও বেড়ার ওপাশে বাড়ী ঘর, গঞ্জ মতনও দেখেছি। পরে গুগল দাদার কাছে জেনেছি, ঐ বন্য প্রাণী বাঁচানো ছাড়াও, পাশের গঞ্জে শব্দ দূষণ কমানোর জন্যও ওরকম বেড়া দেয়া হয়।

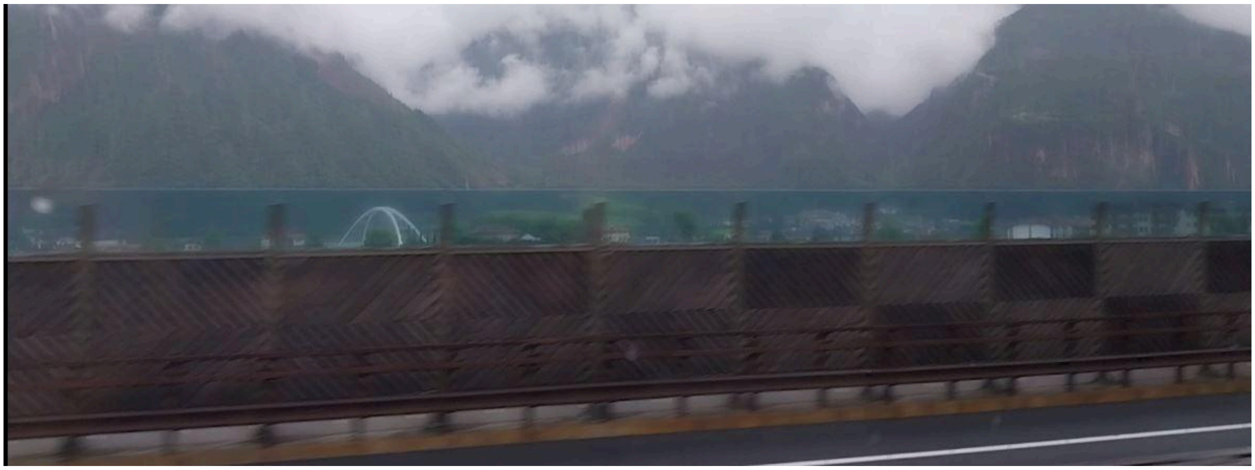

রাস্তার পাশে বেড়া

অষ্ট্রিয়ার ইনসব্রুক শহরে পৌঁছে আমরা যখন বাস থেকে নামার চেষ্টা করলাম, একটু একটু টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সবাই ছাতা নিয়ে বেরোলাম। কেউ কেউ রেন কোট গায়ে। একটা বেশ গাছ পালায় ভরা পার্কের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আমরা ইন্ নদীর উপর একটা সেতুতে পৌঁছলাম। ছাতা মাথায় না দিয়েও ঘোরা ফেরা যাচ্ছিল। সাধারণ একটা নদী, তার উপর সাধারণ গাড়ি, মানুষ সবই চলাচলের জন্য সাধারণ একটা কংক্রিটের সেতু। তার উপর দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হল। পিছনের দূরের সবুজ পাহাড়ের চূড়ায় মেঘেরা আটকে আছে। ঐ টুকই সৌন্দর্য। আর দেখার মত ছিল, সেতুর লোহার বেড়ায় আটকানো অসংখ্য ছোট ছোট তালা। কুসংস্কার ঐ সব উন্নত দেশেও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, বুঝলাম।

ইন্ নদীর উপর সেতু

আমাদের গো কোম্পানির দুটি দলই একসাথে ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। নদীর সেতু থেকে ফিরে কিছুটা হেঁটে আমরা পুরনো ইন্সব্রুক শহরে ঢুকলাম। রাস্তার পাশের বাড়িগুলি বেশ পুরনো ধাঁচের। কিন্তু ভাঙ্গা চোরা নয়। আমাদের ম্যানেজার পবন বলল, একটা পুরনো রাজাদের বাড়ী বা প্রাসাদ আছে। শহরের পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম সকলে। ঐ রাস্তায় গাড়ী চলে না। দুই পাশে বড় বড় দোকান। একটা দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ী, খটাখট করতে করতে চলে গেল। ঘোড়া দুটি সাদা; তাদের চেহারা দেখার মত। বেশ চওড়া পরিষ্কার রাস্তার পাশে চেয়ার টেবিল পেতে, রেষ্টুরেন্ট বসানো হয়েছে। এটা ইউরোপের অনেক শহরে দেখেছি। আসলে এটা ঠিক রাস্তা নয়; অনেকটা বড় বাজার এলাকার মাঝের উঠানের মত। যেই গোল্ডেন রুফের কথা ম্যানেজার পবন বলেছিল, সেটা হয়তো বেশ প্রাচীন, কিন্তু আহামরি কিছু নয়। ঠাস বুনন পরপর বাড়িগুলি। একটি বাড়ির তিন তলার একটি বারান্দার ঢালু ছাদ, সোনালী রঙের টালি দিয়ে সাজানো। হয়তো কয়েকশ বছর আগে তৈরী; তাই রং একটু অনুজ্জ্বল। কিন্তু লোকজন ওখানে বেশ যায় বোঝা যায়। একটু ডান দিকে সরে সেই রকম খোলা আকাশের নিচে চেয়ার টেবিল পেতে লোকজন বসেছে। ঠিক গোল্ডেন রুফের নিচে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একজন যুবক বেহালা বাজিয়ে চলেছেন। ঠিক ঐরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন যুবক বেহালা বাজিয়ে চলেছেন, কি জন্য বোঝা যায় না। ঠিক বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষা করেন, ভেবে নেওয়াটা কষ্টকর।

আমার কন্যার সেদিন ছিল জন্মদিন। কোন এক সংস্কার এর বসে, কাউকে একটা টাকা দিতে চেয়েছিল, ঐ দিন। কিন্তু সকাল থেকে জার্মানীর মত উন্নাসিক মানুষের দেশ ঘুরে এসে, সন্ধ্যা হয়ে গেল। এসব দেশে ভিখারী পাওয়ার কথা নয়। অবশ্য পরে আমরা এক পৃথিবী বিখ্যাত ক্ষুদ্র দেশেই দুই জন ভিখারিনী দেখেছি। যাই হোক, সম্ভবত ওনার সামনে একটি বাক্স মত রাখা ছিল, তাতে দুই একটা ইউরোও ছিল। তাই দেখে আমার কন্যা একটি ইউরো ঐ বাক্সে বিনম্র ভাবে রেখে দিলে, উনি কোন এক অপরিচিত ভাষায় " ধন্যবাদ" দিয়েছেন। আমরা কিন্তু এসবের কিছুই বুঝতে পারিনি। পরে হোটেলে ফিরে, আমি ঐ বেহালা বাদক শিল্পীর বাজনা কিছুটা মোবাইলে রেকর্ড করে এনেছি, এই সব কথা প্রসঙ্গে মেয়ে আমাদের কাছে ঐ কথাগুলি প্রকাশ করেছে। অবশ্য না বললেই আরো ভালো হত।

কোভিডের সময় থেকেই, বাড়ী বসে সময় কাটানোর জন্য, প্রতিদিন সকালে, মিশনের মহারাজ বা অন্য ভালো ভালো বক্তাদের পাঠ, ব্যাখ্যা, কথকতা শুনছি। এমনকি ভালো ভালো পাঠ, মোবাইলে জমিয়েও রাখি। এমনকি সেই সব ভয়ংকর দিনে, জামা প্যান্ট এর উপরে আর এক প্রস্থ জীবাণু প্রতিরোধ করার বিশেষ পোশাক পরে হাসপাতালে কাজ করার সময়ও, মোবাইলে হেডফোন লাগিয়ে, সাধু সঙ্গ করেছি। ওনারা বলেন, "দানই হল কলি যুগের শ্রেষ্ঠ তপস্যা!" অবশ্য নেতাদের মত, জনগণের টাকা জনগণকে " দান" করার জন্য, পাঁচ সাতজন টিভি সাংবাদিক সাক্ষী রেখে প্রচার করার মত , নিকৃষ্ট কাজের কথা ওনারা বলেন না। ওনারা বলেন, দান করুন " শ্রদ্ধার সঙ্গে" , নিজেকে দাতা ভেবে গর্বিত না হয়ে, গ্রহীতা আমার কাছে

কিছু গ্রহন করে, আমাকে ধন্য করলেন, এরমকম মানসিকতা নিয়ে দান করুন। আমি আমার সামান্য পারিবারিক সংস্কার বসে, যথা সম্ভব গোপনেই কাউকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি, গ্রহীতাও যেন আমাকে চিনতে না পারেন। উপকার করে, তার বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করি না। করাটাই পাপ। এমনকি ঈশ্বরের কাছেও কিছু প্রত্যাশা করি না। তাঁকে ধন্যবাদও দিই না।

Golden Roof

আজ ১৬ই জুলাই। আর ছয়দিন পর, বাইশ তারিখ থেকে টানা নয়দিন, স্বাস্থ্য ভবনের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে চলবে, টি ও টি, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষন। আমার মত অকিঞ্চিৎকর একজন অবসর নেওয়া ডাক্তারকে, সেই প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এখনও ওনারা ডাকছেন, এটাই তো প্রত্যাশার থেকে অনেক বেশি। এর জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেব? কিছু কিছু নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখতে চাই। তার প্রস্তুতির কাজ আজ সকালে সম্পূর্ন করতে পেরেছি। ভ্রাতৃপ্রতীম সৌম্য স্যার আবার একটা বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। এই ভ্রমণ কাহিনী লেখা শেষ করে, সেই কাজ ধরতে হবে।

বিদেশ ভ্রমণ ২৩

অস্ট্রিয়া দেশের ইন্সব্রুক শহরে আমরা বিকেলের দিকে পৌঁছেছিলাম। পুরনো শহরে ঘন্টা দুই ঘোরার পর আমরা হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। প্রায় সব শহরেই আমরা মূল শহরে না থেকে , একটু শহরতলীর দিকের হোটেলে থেকেছি। এখানেও একটু পুরনো শহরের বাইরে একটি হোটেলে উঠলাম। এই হোটেলের রাতের খাবার অন্য জায়গার মত হবেনা, বাসেই বলেছিল, ম্যানেজার পবন। এখানে আমরা হোটেলের ঘরে ব্যাগপত্র রেখে, মুখহাত ধুয়ে, নিচে খেতে নামলাম। অন্য হোটেলের মত এখানে বুফে ডিনার নেই। আমরা চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে যাওয়ার পর, টেবিলে টেবিলে খাদ্য বস্তু পোঁছে দিতে থাকলেন, জন তিনেক মহিলা কর্মচারি। আমার যেহেতু খাওয়ার নিয়ে বিশেষ চাহিদা কিছু নেই, তাই কোন অসুবিধা হয়নি। একটাই চাহিদা, লাল লংকার গুঁড়ো না দিলেই হল। এই বারো দিনে , একটি হোটেলেই, একটি ভারতীয় রান্না আমার ঝাল মনে হয়েছিল; সেটা সম্ভবত ভেনিসে। এখানে পরিবেশন করছিলেন যে মহিলারা, তারা ঠিক অন্য এগারোটি হোটেলের কর্মচারিদের মত মিষ্টভাসি ছিলেন না, একথা আমি আমাদের মহিলাদের কাছে শুনেছি। আর একটি নতুন কথা শিখলাম এখানে। আসলে কথাটা নতুন শুনলাম এরকম নয়; এই ভেতো বাঙালী ডাক্তারের ঐ পশ্চিমী আদব কায়দা নিজে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আগে হয়নি। ঐ যে, পরিবেষণকারী টেবিলে টেবিলে এসে খাওয়ার “সার্ভ” করে গেলেন, এর একটা গাল ভরা নাম বলেছিল, পবন; “ থ্রি কোর্স ডিনার।” আমার এক ডাক্তার ভাই প্রথম দিকেই বলেছিলেন, ঐ সকল দেশে ঘুরে, লোকজন, রাস্তাঘাট, খাদ্য পানীয়ের ব্যাপারে যেন বিস্তৃত লিখি। তাই এই সামান্য ব্যাপারটি নিয়ে আপনাদেরকে কয়েকটি কথা লিখে জানালাম।

ইন্সব্রুকের এই আল্ফ হোটেলে আর একটি কৌশল শেখা হলো। আমরা খেয়ে উঠে বেসিনে দাঁত মাজার সময়, আমাদের কন্যা কি করে যেন, বেসিন থেকে জল নামার মুখে লাগানো ঢাকনা বন্ধ করে দেয়। আর ওটা খোলা যাচ্ছিল না। আমার পায়ের ব্যথাটা বেশী থাকায় আমি একবার চেষ্টা করে শুয়ে পড়েছিলাম। কন্যা প্রথমে ওদের রিসেপশনে ফোন করে জানানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ওরা নাকি ওর ইংরেজি বুঝতে পারছিল না। দরজার কার্ড নিয়ে, নিচে নেমে ওদের সমস্যাটা বোঝানোর পর, ওরা বুঝিয়ে দেয়, কলের পিছনের একটি হুক মত জিনিস টেনে বা চেপে ঢাকনা খুলে নেওয়া যায়। কিন্তু সেটা করা গেল না। এবার ফোন করতে, একজন হোটেলের কর্মচারি এসে চাপাচাপি করে দেখল, হলো না। তখন নিচে গিয়ে, যন্ত্র পাতি এনে ওটাকে ঠিক করে দেয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখি, সুন্দর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কালো পাহাড়ের গায়ে সাদা মেঘ আটকে আছে। পাহাড় চূড়ায় একটু সাদা বরফও দেখা যাচ্ছে । এই পাড়ার বাড়িগুলি সবই আধুনিক, কিন্তু দুই তিন তলার বেশী উঁচু নয়। এই এলাকাটা ব্যাঙ্গালোরের বা হায়দরাবাদের কোন পাড়া বললেও ছবি দেখে লোকে মেনে নেবে। এদের এখান থেকে প্রাতরাশের পর তলপি গোটানো হল। এদের প্রাতরাশের ব্যবস্থাও আগের সব হোটেলের মতই। এখানে একটি ছবি তুলে রাখার মত জিনিস দেখলাম। গরম জল রাখার পাত্রটি অদ্ভুত সুন্দর। সম্ভবত স্টেইনলেস স্টিলের ; কিন্তু এত ঝকঝকে যে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। যেন আরব্য উপন্যাসের চরিত্র এই পাত্রটি।

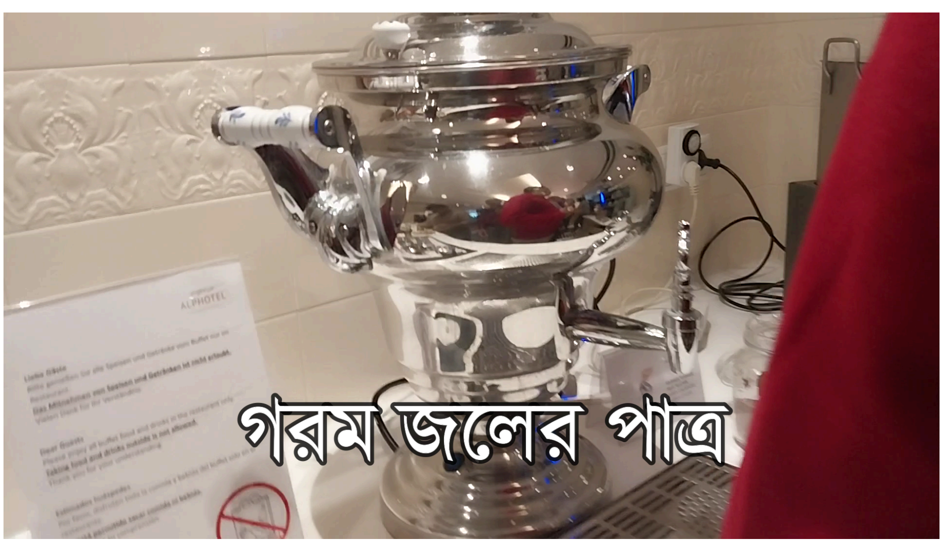

এই হোটেলের থেকে বেরিয়ে, মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে আমরা পৌঁছলাম , স্বরোভোস্কি ক্রিস্টাল মিউজিয়াম। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে, কী অপূর্ব সুন্দর, নয়নাভিরাম সব জিনিস তৈরী করেছে , তার বর্ণনা লেখা আমার অসাধ্য। আমার সামান্য মোবাইলে কিছু কিছু নমুনা তুলে এনেছি। আমার ইউ টিউব ভিডিও তে দেখলে কিছুটা আন্দাজ পেয়েছেন। ইউরোপ ভ্রমণ আট নং পর্বে রেখেছি। ঐ নিয়েই একটি গোটা পর্ব লিখতে হবে।

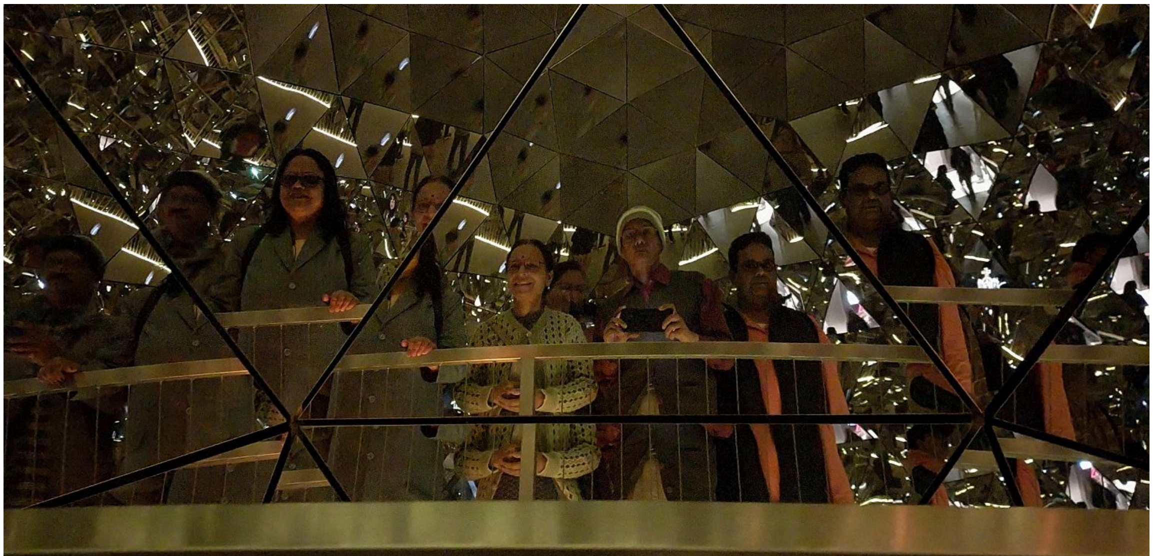

In Sworovski Cristal Museum, Austria, 27.5.2025.

এবার আমাদের গন্তব্য ইটালির ভেনিস শহর। আজও আমাদের বেশ লম্বা বাস যাত্রা। সকাল নটা থেকে বিকেল প্রায় চারটা বাজবে ভেনিসে পৌঁছতে। শুনতে কষ্টকর ব্যাপার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই। না, এইসব দেশের রাস্তা এতোই ভালো যে ঘন্টার পর ঘন্টা বাসে বসে চলতেও কোন কষ্ট হয় না। আমরা ঘন্টা দুই চলার পর, রাস্তার পাশের একটি শপিং মলে ঢুকে, বিনাপয়সায় শৌচালয় ব্যবহার করে নিলাম। তারপর ওদের পণ্য সম্ভার এর ভেতরে ভেতরে একটু ঘুরে দেখে এলাম। দুই চারজন কিছু কিছু কেনাকাটা করে নিলেন। এই মলে দুটি জিনিস আমার চোখে পড়েছে। এক, ওরা প্রায় কেউ ইংরেজি বলে না ; কোথাও ইংরেজী লেখাও নেই। লেখার ব্যাপারটা শৌচালয় ব্যবহার করতে গিয়েই দেখলাম। এরা মেল, ফিমেল, বা লেডিস - জেন্টস লেখেনি। লিখেছে উওমো আর ডোন্যা। পাশের ছবি দেখে বুঝে নিতে হল। আর একটা ছোট্ট কুকুর। এই প্রাণীটি আমার খুবই প্রিয়। বিদেশের রাস্তায়, মলে, জাহাজে, বরফ ঢাকা পাহাড় চূড়ায় পর্যন্ত ওদের নিয়ে ওদের মালিকেরা ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। এই ছোট্ট, ঝকঝকে কালচে বাদামী রঙের কুকুরটি আবার আমাদের অধ্যাপক মামাকে পেয়ে খুব খুশি। খুশীতে লেজ নাড়তে নাড়তে মামার হাঁটু পর্যন্ত দুই পা তুলে উঠে যাচ্ছিল।

দুপুরের খাবারের জন্য আবার একটি মলে ঢুকলাম। এখানে আবার টেবিলে টেবিলে বার্গার কিং লেখা মোটা কাগজের রঙ্গিন টুপী রাখা ছিল। সবাই একটা করে মাথায় নিয়ে ছবি তোলা হল। আমরা বুড়োরা শিং ভেঙ্গে বাছুর না হয়ে, টুপী মাথায় খোকা খুকু সেজে নিলাম। এই জায়গাটি আমার বিশেষ করে মনে থাকবে বহুদিন। ঐ টুপী মাথায় বসে বসে মোবাইলে ছেলের কাছ থেকে একটা ভালো খবর পেলাম। বিদেশে ভ্রমণ করতে যাওয়ার সময়, ওর জন্য একটা উদ্বেগ নিয়েই যেতে হয়েছিল। ওর ঐ বার্তা পেয়ে, মহাপুরুষদের একটা কথা আমার মনে হয়েছিল; " মৃগ নাভীর গন্ধ লুকিয়ে রাখা যায় না!" অনেকক্ষন ছেলের সাথে হোয়াটস অ্যাপ এ ভিডিও কল করে কথা বললাম। বাইরে বেরিয়ে দূরের নীল নীল পাহাড়গুলি ওকে দেখালাম। বিকেলে পৌঁছলাম ভেনিস।

আজ আমাদের ভেনিসের গন্ডোলা রাইড করার পরিকল্পনা আছে। আগেরদিনই ম্যানেজার পবন একটি মারাত্মক খবর দিয়েছে। দুদিন আগে এই গো কোম্পানির একটি দল ভেনিসে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে বিপদে পড়েছে। ঐ দলের দুজনের পাসপোর্ট চুরি হয়ে গেছে। বিদেশে সে যে কি সাংঘাতিক বিপদ, ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। ভেনিস যতোই সামনে এসে যায়, আমরা সকলে সকলকে সাবধান করে দিচ্ছি, " প্রাণ ভোমরা" ঠিক আছে তো? সাবধান! পাসপোর্ট সাবধান!

আজ ১৭ই জুলাই। সকালে অনেকদিন পর পাড়ার পুকুরে জল আনতে গেলাম। আমার একটি রঙিন মাছের একুয়ারিয়াম আছে। বছর খানেক থেকে ওটাতে পুকুরের জল দিয়ে দেখছি, মাছেরা ভালো

থাকছে। মাস দুই এর বেশী হল, সকালে ঐ রাস্তা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। ওখানে আমাদের পরিচিত একটি কালো কুকুর আছে। ভোরে হাঁটতে বেরনোর সময় ও ঐ রাস্তায় থাকে। আমাকে দেখলেই ছুটে এসে, খুশীতে গায়ে ওঠার চেষ্টা করে। বিস্কুট বা খাওয়ার দিয়েও দেখেছি; খাবার ফেলে আমার হাঁটুতে মাথা ঘষাতে ওর আগ্রহ বেশি। এই করতে গিয়ে, বেড়াতে যাওয়ার মাস খানেক আগে, আমার পায়ে জড়িয়ে রাস্তায় আছাড় খেয়ে, হাত আর হাঁটু ছড়ে গেছল। আজ জল নিয়ে ফেরার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসে গায়ে উঠল। বারবার ওর সেই পুরনো অভ্যাস মত, আমার হাঁটুতে মাথা ঘষতে থাকল। পিছন পিছন অনেকটা রাস্তা চলে এল। আজ থেকে একটা জরুরী কাজ শুরু করলাম। তাই পরে কখন আর এই লেখাগুলিতে ছবি যোগ করার সময় পাব জানিনা। আজ তাই এটিতে কয়েকটি ছবি যোগ করা হয়েছে।

বিকেলে আমার পুরনো আপিসের এক কর্মচারী হোয়াটস অ্যাপ -এ একটি নিমন্ত্রন পত্র পাঠিয়ে দিয়েছে। আগামী কাল সকালে দশটার মধ্যে, " নিধিরাম সর্দারকে আদালতে " সাক্ষী দিতে যেতে হবে। আমি প্রায় দেড় বছর আগে অবসর নিয়েছি। আজ যে রুগীকে দেখার জন্য আমার সাক্ষ্য গ্রহণ জরুরী মনে হচ্ছে, মহামান্য আদালতের , সেটি তিন বছর আগে দেখা। আজ বিকেল সাড়ে তিনটায় আমার পুরোনো আপিসে ঐ নিমন্ত্রন পত্র পৌঁছেছে। দেশের এত কিছু উন্নতি হয়েছে, এই ব্যাপারটি এখনও সেই মান্ধাতার আমলের মত থেকে গেল। আমি এই নিমন্ত্রণ নির্দিষ্ট তারিখের দশ -পনের দিন পরেও পেয়েছি। আমার মত, ওই মামলায় হয়তো সাত -দশ জন সাক্ষীকে ডাকা হবে। সবার জন্য দুই- তিন বার করে চিঠি যাবে। কাল গিয়ে দেখব, হয়তো কেউ একজন মারা যাওয়ার জন্য সব আদালত বন্ধ। কিংবা খুব বেশি গরম পড়ায়, আদালতে অঘোষিত ছুটি চলছে। নয়তো কোলকাতার রাস্তায় জল জমে সরকারী উকীল বাবু এসে হাজির হতে পারেন নি। প্রতিটি উদাহরণ আমার নিজের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কাল না হলে, আবার হয়তো সাড়ে তিন বছর পর একটা তারিখ পড়বে। ততদিনে এই রকম কত নিধিরাম সর্দার সাধনোচিত ধামে গমন করেছে। ধন্য আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা।

স্বরোভোস্কি ক্রিস্টাল মিউজিয়াম-এ ঢোকার পথ

বিদেশ ভ্রমণ ২৪

আমি আগেও কোথাও লিখেছি, অষ্ট্রিয়ার ইন্সব্রুক শহরের কাছে যে, স্বরোভস্কি ক্রিস্টাল মিউজিয়াম আছে, সেটাকে একশ নম্বর দিলে, লণ্ডনের মাদাম তুসোর খেলনা মিউজিয়ামকে আমি দশের বেশী দেব না। এই বিদেশী ভাষার কিছু কিছু শব্দের বাংলা উচ্চারণ নিয়ে সমস্যা আছে। বিশেষ করে ফরাসী বা রাশিয়ান ভাষার বাংলা উচ্চারণে বেশ ঝামেলা আছে। এই যে স্বরোভোস্কি কথাটির মাঝে ভি আছে, এটা অনেকে বাদ দিয়ে উচ্চারণ করে। আমাদের ম্যানেজার পবন এটা সরোস্কি উচ্চারণ করছিল। সে যাই নাম বলি না কেন, যাঁরা অস্ট্রিয়া যাবেন, চেষ্টা করবেন এই ক্রিস্টাল মিউজিয়ামটি দেখতে। বাসে যেতে যেতে পবন বলে দিয়েছিল, এত বেশী ছবি তোলার মত মনে হবে যে, এখানেই দেরী হয়ে যাবে। তার থেকে ভিডিও করে নিতে পারলে ভালো। পবন মজা করে আর একটা কথা বলে দিয়েছিল; এই একটি জায়গায় দাদারা তাড়া লাগায়, বৌ দিদিরা বের হতে চায় না।

(এখানে একটি কথা বলে নিই। গত পর্বে লিখেছিলাম; সকাল দশটায়, নিধিরাম সর্দারকে আদালতে যেতে হবে; এক মহান দায়িত্ব পালন করতে। আমি দশটা পাঁচ নাগাদ এই আদালত বাড়ীর নিচে এসে হাজির হলাম। আর যাই হোক, এটা আমাদের সাধের, এবং গর্বের মাতৃভূমি ; তিরিশ বছর একটা সরকারী চাকরী করে, অবসরের আগে মাথার প্রায় সব চুল পাকিয়ে নিয়েছি। তাই তিন তলায় ওঠার আগে, একটি দোকানে বসে চা খেয়ে নিলাম। তিনি তলায় ওঠার জন্য লিফ্ট পেয়ে গেছি; এর জন্য নিশ্চয়ই গর্ব করতে পারি। কুড়ি নম্বর কোর্ট এর ঘরে ঢুকে একজন কর্মচারীকে পেয়ে গেলাম, এর জন্য আমি এই রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে ধন্য। কিন্তু আমি কে, কি জন্য এসেছি বলার পর, উনি যা বললেন, তাতে একেবারেই নিশ্চিত হওয়া গেল যে, এটাই আমার গন্তব্য। উনি বললেন, এত সকালে এলেন কেন? উকিল বাবুরা এগারোটার আগে আসে না। বসুন কথাটি বলার মত পরিশ্রম করতে, ওনাদের কেউ বেশী বেতন দেবে না; এটা উনি যেমন জানেন, আমিও জানি, হাড়ে হাড়ে জানি। তখনও ঐ ঘরে আমরা এই দুটি মানুষ। গোটা তিনেক চেয়ার আর, একটি বেঞ্চ আছে দেখলাম। এক পাশের একটি চেয়ারে বসে গেলাম। সাড়ে দশটা নাগাদ পাশের দরজা দিয়ে, কালো জোব্বা পরিহিতা এক মহিলা হনহন করে হেঁটে সোজা বিচারকের আসনে বসতে চেষ্টা করছেন দেখলাম। সেই প্রথম কর্মচারি ওনার পিছন পিছন সেই উঁচুতে রাখা বিচারকের আসনের কাছে পৌঁছে, মুখে একটি মৃদু শব্দ করে, যেন আমার দিকে তাকালেন। একবার খুব বেকায়দায় পড়ে, ব্যাপারটি জানি, তাই উনি কি বলতে পারেন তার একটি ধারণা ছিল। তাই " হুজুর আসছেন বা এসেছেন" , ধরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মিনিট দশেক পর থেকে, এক এক করে অন্য কর্মচারি এলেন। কিন্তু বিচারকের চোখের সামনে বসে, মোবাইল ফোন বের করতে পারছিলাম না। এগারোটার পর থেকে এক এক করে কালো কোট গায়ে উকিল বাবুরা আসতে থাকলেন। আমি ঢুকেই, ঐ কর্মচারীকে আমার কেস নম্বর বলেছি; তাই উনি যা করেন, সেই ভরসায়

বসে বসে , বিচার প্রক্রিয়া দেখতে থাকলাম। বারোটা পর্যন্ত সময় ঐ ভাবেই কাটল। এত সময়ে ঘরের মধ্যে জন দশ বারো উকিল, আর জন পাঁচ -সাত অন্য লোকজন এসে গেছে। আমি বিচারক মহিলার চোখের আড়ালে চলে গেছি বুঝে, মোবাইল বের করলাম। এবার আমার সময় কাটানোর নিজস্ব উপায় কাজে লাগালাম। এই সব অঢেল অতিরিক্ত সময়ে, মোবাইলে লেখা, এই হল আমার নিজস্ব উপায়) । এখন একটা বেজে গেছে; এবার তাহলে অস্ট্রিয়ায় ফিরে চলুন।

বাসের থেকে নেমেই একটি বড় বাঁধানো চত্বরের মধ্যে, একটি জিনিস দেখে, তার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলাম। ওখানে একটি কৃষ্টালের বিরাট বড় মডেল রাখা আছে। পবন আমাদের তাড়া দিয়ে মিউজিয়ামের দিকে নিয়ে চলল। এসব যেহেতু ট্যুর কোম্পানী থেকেই ঠিক করে রাখা, তাই আমাদের নিজের নিজের টিকিট কাটার জন্য আর দাঁড়াতে হল না। একটু খোলা মাঠের পর , ঢোকার গেটটি বেশ দেখার মত। একটি সবুজ ঘাসে ঢাকা টিলার মত, মাঝখানে মানুষের মুখমণ্ডলের মত; চকচকে দুটি চোখ, মুখ দিয়ে জলের ধারার মত জিভ। টিলার তলা দিয়ে, সুড়ঙ্গের মত ঢোকার রাস্তা। মিউজিয়াম বাড়ীতে ঢুকে থেকেই চমক। হাজার রকমের কৃষ্টাল আর কৃত্রিম মণি মানিক্য দিয়ে নানান মূর্তি তৈরী করা হয়েছে। একের পর এক ঘরে ঢুকছি, আর চমকে চমকে উঠেছি। মণি মানিক্য ইত্যাদির ঝলক, আর আলোর বৈচিত্র আমাদের ঘন্টা দেড়েক একেবারে অন্য এক জগতে নিয়ে গেল। ছবি আর ভিডিও করতে করতে এগিয়ে গেলাম। যখন মনে হল চমক শেষ, তখন শুরু হল পবনের বলা সেই , "দাদাদের বিপদ।" বিরাট এলাকা জুড়ে অলঙ্কার এর প্রদর্শনী। হাজার রকমের কৃত্রিম মণি মানিক্য দিয়ে তৈরী সব অলঙ্কার। মহিলাদের তো দেখলেই কেনার ইচ্ছা হবেই। আমার কন্যা আর তার পিসি বেশ কিছু জিনিস কিনে নিল;নিজেদের জন্য, আত্মীয় স্বজনদের জন্যও। দামের ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা আর আমাদের গ্রামের বাড়ীতে গরু ছাগল যে দেখত সেই কানাই বুড়িকে লণ্ডনের মাদাম তুসোর মিউজিয়ামের বর্ণনা দিতে বলা, একই রকম হবে। এর পর আমরা চললাম ভেনিস শহর এর উদ্দেশ্যে। সেই ভেনিস, যেখানকার সওদাগরের গল্প আমরা স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ার সময়, ইংরেজিতে পড়েছি। আর চল্লিশ বছর আগে, আমার ডাক্তার দাদা, কোলকাতার বিখ্যাত বাবুলাল দাদার কাছে শুনেছি, এমন একটি শহর আছে, যেখানে রাস্তা নেই; তার বদলে আছে, অসংখ্য খাল। সেই খালে এক বিচিত্র নৌকো চলে; যার নাম " গন্ডোলা!" আমরাও সেই গন্ডোলায় চাপতে চলেছি।

আজ ১৮ই জুলাই , এখন একটা আটত্রিশ বাজে। দশটায় ডাকা হয়েছে আমাকে। দুটোর আগে কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। বেশ, আমি না হয় একটা অবসর নেওয়া বেকার লোক। কত কাজের মানুষ, ঘন্টার পর ঘন্টা এসে, চুপ চাপ বসে আছে। এই দেশের কোন উন্নতির আশা করাটাই আহাম্মকের মত কাজ হবে।

মিউজিয়ামের থেকে বেরনোর সময়

বিদেশ ভ্রমণ ২৫ (কিংবা কালো কোটের অসভ্যতা)

দুটো দশ পর্যন্ত জজ ম্যাডাম খেতে উঠতে পারেননি। উনি মাঝে মাঝেই সরকারী উকিল বাবুকে গালাগাল দিচ্ছেন। কোন রকম কাগজ পত্র দেখে আসার বালাই নেই। একজন করে সাক্ষীকে তুলছেন; কেন ডেকেছেন, কি জানতে চাইছিলেন, কিছুই জানেন না। তাই দশ মিনিট এর কাজে আধ ঘন্টা লাগছে। জাজ ম্যাডাম দুটো সতেরোয় বলে দিলেন যে উনি এখন যে মহিলার সাক্ষী নিচ্ছেন, তার পর খেতে নামবেন। অর্থাৎ আমরা সাড়ে তিন বা তার পর ডাক পাব। বেশ, বোকার মত বসে আর কি করা যায়; আজ ভেনিসের কথা লিখি বসে বসে। আমার সাথে একই কেসে আর একজন পুলিশ অফিসার এসে হাজির হয়েছেন, এগারোটা নাগাদ। উনি বসার জায়গা পাচ্ছেন না। আর একটি কেসে একজন সিনিয়ার পুলিশ অফিসার এসেছেন, তাই এ বেচারা বেঞ্চ খালি পেলেও বসতে পারছেন না। আমি ব্যাপার বুঝে, নিচে নেমে , ডিম টোস্ট আর চা খেয়ে নিলাম। ইউরোপে বারদিন তো দুপুরে বার্গার আর আলুভাজা খেয়েই চালিয়ে দিলাম।

ভেনিস যাওয়ার পথে, বার্গার কিং এর রঙ্গিন টুপী মাথায় ছবি তোলার কথা আগেই লিখেছি। ইটালির এলাকায় ঢুকে, একটু একটু করে রাস্তার পাশের দৃশ্য পাল্টাতে দেখলাম। সেই প্যারিস থেকে সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, তারপর অস্ট্রিয়ার প্রান্তরে গমের মত এক রকমের ফসলের ক্ষেত দেখতে দেখতে এলাম। ইটালিতে ঢোকার ঘন্টা খানেক পর থেকে , রাস্তার দুই পাশে অন্য রকমের কিছু ফসলের মাঠ দেখতে পেলাম। মাঠের পরে একটু উঁচু টিলার মত পাহাড়। প্রথম প্রায় পঞ্চাশ কিমি মত আমরা ওগুলি কিসের চাষ বুঝতেই পারছিলাম না। প্রথম, আমাদের দলের এক স্কুলের দিদিমণি বললেন, ওগুলি আঙুরের গাছ। আমি বাঁকুড়ার ফুলবেড়িয়া গ্রামে, পি কে সরকার স্যারের আঙুর বাগান দেখে এসেছি। সেই বাগানে মে মাসের শেষের দিকে বেশ আঙুর ধরে ছিল। কিছু গোল গোল আঙুর পেকে কালো হয়ে ছিল; আমরা খেয়ে দেখেছি। ইটালির এই মাঠের আঙুর লতাগুলি দেখে মনে হলো, আরও দেড় দুই মাস পর আঙুর ধরবে। যতোই ইটালির ভেতরের দিকে ঢুকতে থাকলাম, মাঠের আঙুর এর লতাগুলী লম্বা দেখতে থাকলাম। টানা লাইন করে লাগানো আঙুরের লতা, আমাদের এখানকার উচ্ছে বা পটলের মাচার মত ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়তো পাঁচ- ছয় শ’ কিমি রাস্তা, দুই পাশে আঙুর আর অন্য এক রকমের বেঁটে বেঁটে গাছের বিশাল বিশাল প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চলল।

আমাদের দলের আর এক ডাক্তারবাবু , যিনি পরে একাই ছুটে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জন্ম স্থান দেখতে চলে গেছলেন, তিনিই মোবাইলে খুঁজে বের করে বললেন, ওগুলি অলিভ এর চাষ। অলিভ মানে তো আমরা জলপাই জানি। জলপাই-এর গাছ আমি চিনি। সেই উত্তরবঙ্গের, ইটাহার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, আমার কোয়ার্টারের পিছনে একটি চারা লাগিয়ে এসেছিলাম; বছর পাঁচ-সাত পরে গিয়ে দেখি, সেই গাছ, তিন তলার সমান উঁচু হয়ে গেছে। এই ইটালির মাঠের অলিভ গাছ খুব বড় হলে, তিন-চার ফুটের বেশি হবে না। পরে অবশ্য কোন কোন মলে, এই অলিভ ফলের আচার, কাঁচের বয়ামে রাখা আছে, দেখেছি। আমাদের দেশী খেজুরের মত, একটু বেঁটে, হলদে সবুজ ফলগুলি।

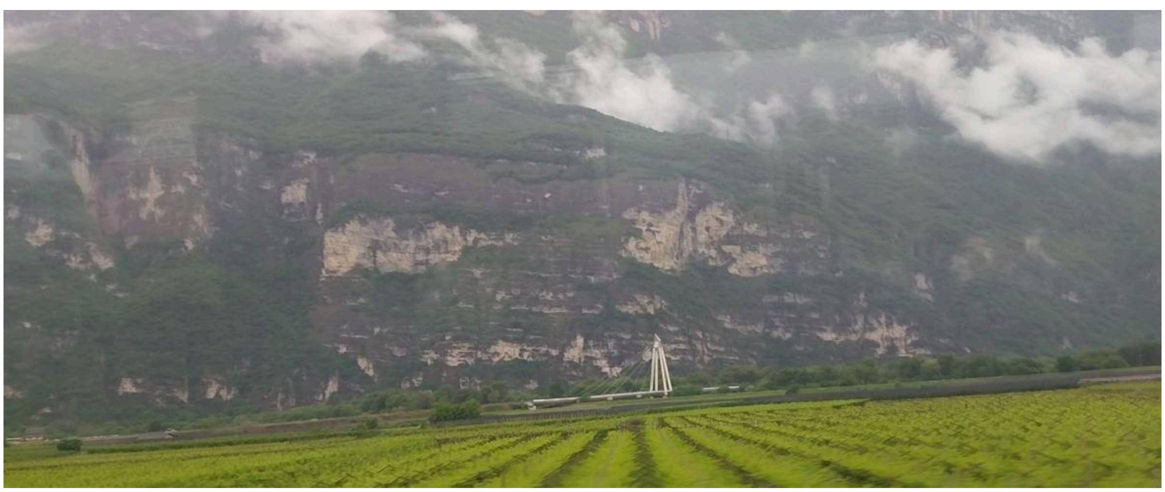

ইটালীর আঙ্গুর ক্ষেত

ইটালীর অলিভ ক্ষেত

বিকেলে ভেনিস শহর এর কাছে পৌঁছে দেখি, দুই দিকে দিগন্ত জোড়া জলার মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলেছে। একটি জায়গায় বাস থেকে নেমে, বাংলাদেশী লোকেদের বাজারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে একটি বেশ চওড়া নদী বা খালের পাড়ে পৌঁছলাম। পবন বলেছিল, এখান থেকে " এভাপোরেটর" চেপে, ভেনিস যেতে হবে। পর পর একতলা, দোতলা, মেশিন চালিত জলযান এসে, দলে দলে লোক নিয়ে, ঘাট থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা একটি ছোট, কাঁচে ঢাকা নৌকা পেলাম। এত ছোট জলযান দেখে আমাদের একটু মন খারাপ হয়ে গেল। ফেরার সময় অবশ্য দোতলা নৌকা পেয়েছি। এগুলিকে আসলে বলে, ওয়াটার বাস।

আমি ভেতরে ঢুকে না বসে, চালকের পাশে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করে গেলাম। একে একে আরও তিন চার জন এসে দুই পাশে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে গেলেন। চালককে জিজ্ঞেস করে জানলাম, যে জলপথ দিয়ে চলেছি, সেটার নাম, "ক্যানালি দা জুডেইকা"। ডান

দিকে যে শহর দেখা যায়, সেটার নাম, "জুডেইকা"। ঐ জলপথ বা ভেনিস শহর এর সব খালই, ভূমধ্য সাগরের সাথে যুক্ত। মিনিট পনের চলার পর ওদিকের ঘাটে দাঁড়াল আমাদের জলযান। ঐ খালের ডান পাড় ধরে, সকলে ম্যানেজার পবনের পিছু পিছু চললাম। আবার সেই, "সাবধান, সাবধান" রব উঠল। প্রায় মেলার মত লোক চলেছে। মাঝে গোটা তিনেক ছোট খালের উপর সেতু পেরিয়ে গেলাম। পবন বলেছিল, এক এক সময় ঐ সেতুগুলির উপর ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি হয়; পকেটমার তার কাজ করে। একটি সেতুর উপর দাঁড়িয়ে পবন, ডান দিকে, একশ দেড়শ ফুট দূরে একটি বাড়ী দেখিয়ে বলল, ওটি ছিল, জেলখানা। তার পরের সেতু থেকে একটি বাড়ীর তিন তলায় একটি জানালা দেখিয়ে বলল, ওটার নাম, " লাস্ট সাই!" জেলখানা থেকে মৃত্যু দণ্ডের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময়, ঐ জানালা দিয়ে, শেষ পৃথিবীর আলো দেখতে পেত , আসামী।

উপরে লাষ্ট সাই, নিচে খালে গন্ডোলা

(আমি কোর্টে সাক্ষী দিতে এসে ঠিক আসামীর মত ব্যাবহার পেলাম। দশটা পনের মিনিট নাগাদ ঢুকে, পাঁচটা পঞ্চাশ নাগাদ ছাড়া পেলাম। তারপর হেঁটে মেট্রো স্টেশনে এসে, চাঁদনী চক থেকে মেট্রোতে উঠেছি, সোয়া ছয়টা নাগাদ। মেট্রোতে বসে, কিছুটা লিখে, মনটাকে ঐ দিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছি।)

আমরা পবনের সাথে হেঁটে একটা বড় বাঁধানো চত্বরের মধ্যে গিয়ে থামলাম। এর নাম,'সেন্ট মার্কস স্কোয়ার', পবন ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি জিনিস দেখিয়ে দিল। খালের দিকে দুটি প্রায় তিন তলা উঁচু থাম দেখিয়ে বলল, ঐ দুই থামের থেকে , সম্ভবত ফাঁসী দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। ওদিকে তাকালে বাম দিকে যে চার তলা বাড়ী, তার অন্য তলার, অন্য সব থাম সাদা রঙের, কিন্তু তিন তলার মাঝের দুটি থাম হলদে গোলাপী রঙের। পবন বলেছিল, ঐ বিশেষ বারান্দা রাজা বা সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ওনারা ঐখানে বসে, ফাঁসী দেখতেন। ওর পাশের বড় প্রাসাদোপম বাড়ীতে উপরের দিকে দেওয়ালে কিছু ছবি অর্থাৎ পেন্টিং আছে। পুরনো হলেও বেশ পরিস্কার ছবি। ঐ একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কিছু একটা বাক্স খুলে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু অন্য রকম পোশাকের লোকেরা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পবন বলেছিল, এই ভেনিসের কোন ব্যবসায়ী অর্থাৎ সওদাগর, মিশরে গিয়ে মারা যায়। সেখান থেকে মৃত দেহ আনার নিয়ম ছিল না। তার সাথের লোকেরা, এক ফন্দি করে, বাক্স ভরে সেই মৃত দেহ দেশে ফিরিয়ে আনে। সেই মৃতদেহ এদের জন্য নিষিদ্ধ প্রানীর মাংসে ঢাকা ছিল।

ওখান থেকে একটু গলি পথে এগিয়ে, সেই পৃথিবী বিখ্যাত গন্ডোলা রাইড এর ঘাটে এসে হাজির হলাম। এক নৌকায় পাঁচ জন করে উঠতে দেবে। মাঝি একজনই; একটিই হাল বা দাঁড় I মিনিট দশেক লাইনে দাঁড়িয়ে নৌকায় উঠলাম। পরের পর গন্ডোলা নৌকা ঘাট থেকে ছেড়ে চলল। গোটা একটা শহর। খালের পরে খাল, ডাইনে বাঁয়ে খাল, এদিকে কোন রাস্তা নেই, অন্য

কোনো দিকে আছে হয়তো। মাঝে মাঝেই খালের উপর দিয়ে সেতু। সেই সেতু দিয়ে লোকজন যাওয়ার সময়, আমাদের দিকে হাত নাড়ছে।

আমরা পাঁচজন একই পরিবারের, তাই আমি আর যোগেশ মোবাইলে ভিডিও কল করে, আমাদের বাড়ীতে থাকা , ছেলে মেয়ে সকলকে ভেনিসের খাল, সেই খালে চলা গন্ডোলা নৌকা, পাশের ঘর বাড়ী সব দেখলাম। আমাদের নৌকার মাঝি ছেলেটি একটু কম কথা বলে। সম্ভবত ইংরেজী বলতে পারে না। অন্য নৌকার এক বয়স্ক মাঝি, যাত্রীদের সাথে বেশ রগড় করছে দেখলাম। ওকে দেখে আমার নর্মদা নদীর নৌকার মাঝির কথা মনে পড়ল। জব্বলপুরের কাছে বিখ্যাত মার্বেল রকের মধ্যে নৌকা ভ্রমণ বেশ বিখ্যাত। ওখানে নৌকাগুলি গন্ডোলার মত সুন্দর নয়, সাধারণ ডিঙ্গি নৌকা। মাঝিরা বেশ ছড়া কেটে কেটে সব কিছুর বর্ণনা দিতে থাকে। কাশ্মীরের ডাল লেকের শিকারা ভ্রমণও বেশ বিখ্যাত। আমরা আবার না জেনেই , কোজাগরী লক্ষী পূজার বিকেলে শিকারায় উঠেছিলাম। একটু পরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল। আমাদের ডাল লেকের শিকারা ভ্রমণ তাই নতুন মাত্রা পেয়ে গেল। ওখানেও শিকারা চালকেরা অনেক কথা বলে, বর্ণনা দিতে থাকে। কিন্তু সবসময় যেন কোন হাউস বোটের দোকানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। ডাল লেকের শিকারা নৌকার পাশে পাশে অনেক ফেরিওয়ালার ডিঙ্গি নৌকা চলতে থাকে, এটা ওটা

বিক্রীর জন্য পাশে এসে দাঁড়ায়। ভেনিসের খালে সেরকম কিছু নেই। মাত্রই মিনিট পনের কুড়ির নৌকা ভ্রমণ। কিন্তু একটা পৃথিবী বিখ্যাত ভ্রমণ স্থান। তাই এই ভ্রমণটি করে বেশ অন্য রকম এক অনুভূতি হল। একটা ব্যাপারে আমাদের কারো কারো একটু আপত্তি দেখলাম। ভেনিসের খালের জলে একটা কটু গন্ধ মাঝে মাঝে নাকে লাগছিল। তার মানে এটা নয় যে, জলে যত্রতত্র প্লাষ্টিক ভেসে বেড়াচ্ছে। ঐ সভ্যতা ধ্বংশ করা উৎপাত ঐ নটি দেশের কোথাও আমি দেখিনি।

ওয়াটার বাসে ফেরার সময় আমরা সবাই দোতলায় বসে এলাম। সূর্য তখন পশ্চিম দিকে প্রায় পাটে বসছেন; তাই বিশাল চওড়া খালের জলে অস্তাচলের সূর্যের কিরণ আমাদের ভেনিস ভ্রমণকে আরও মায়াময় করে দিয়েছিল। এপারের সেই বাংলাদেশীদের বাজারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ফেরার সময়, ওরা স্বাভাবিক ভাবেই ডাকাডাকি শুরু করলো। কেউ কেউ ওদের দোকানে ঢুকে দুই একটা মেমেন্টো কিনেছেন। কিন্তু আমরা ভারতীয় বাঙালি বোঝার পর ওদের যেন কেমন ব্যাজার মুখে তাকাতে দেখলাম। আমাদের বাসে চেপে মিনিট কুড়ি এসে , একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেতে ঢুকলাম। বাইরে বেরিয়ে অপেক্ষা করার সময় ওদের খাদ্য তালিকা দেখলাম, লম্বা বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা। ছবিও তোলা হল। দেখলাম, ভেজ বিরিয়ানি এক প্লেট ১৬ দশমিক ৫০ ইউরো। অর্থাৎ আমাদের দেশের টাকায় প্রায় ১৬০০ টাকা। ওখান থেকে বাসে চেপে, শহরের বাইরে একটি সুন্দর হোটেলে এসে রাত্রে থাকলাম। এই হোটেলের সেন্ট্রাল এ সি বোধহয় ঠিক ছিল না। আমার তো এ সি লাগেই না। তাই সমস্যাটা বুঝতেই পারিনি। যোগেশ আর আমার কন্যা অনেক কসরত করেও, ওদের ঘরের ঠাণ্ডা মেশিন চালাতে পারেনি। পরদিন সকালে শুনলাম, যোগেশ রাত্রে ঘুমাতে পারেনি। আমার চাষার মত জীবন যাপন, এই একটি নমুনা দেখে বুঝলাম, বেশী আধুনিক হওয়ার বিপদও আছে।

আজ ১৯ জুলাই। গতকাল সারাটা দিন এক কোর্টে সাক্ষী দিতে গিয়ে নষ্ট করে এলাম। সকাল নটা পাঁচ নাগাদ বাড়ী থেকে বেরিয়ে, সন্ধ্যা ছয়টা চল্লিশে বাড়ী ফিরে, আর লেখার মত মনের অবস্থা ছিল না। আমার জীবনে বহু বহু বার অদ্ভুত অদ্ভুত সমাপতন ঘটেছে। সরকারী ভাবে বরিষ্ঠ নাগরীক হয়েছি ছয় বছর পেরিয়ে গেছে। ইনকাম ট্যাক্স, ব্যাংকের কাজ বা ট্রেনের টিকিট কাটার সময়, জন্ম তারিখ থেকেই লোকটা সিনিয়র সিটিজেন বুঝে নেয়। কিছু কিছু আর্থিক সুবিধাও পাওয়া যায়। গত কালই আমার কন্টাক্ট লিষ্টে থাকা, আনন্দবাবু একটি বার্তা পাঠিয়েছেন। এই বাতিল (ভদ্র ভাবে যাদের বরিষ্ঠ নাগরীক বলে) মানুষদের সরকারী ভাবে কি কি সামাজিক সুবিধা দেওয়ার কথা তার তালিকা। আর কালই কোর্টে বসে বসে যেভাবে

মানসিক আর শারীরিক নির্যাতন পেয়েছি, আনন্দবাবু নেহাত বয়স্ক মানুষ বলেই একটা বাঙলা গালাগাল দিতে পারিনি। আমার বন্ধু স্থানীয় কেউ হলে, অবশ্যই গালাগালি খেয়ে যেত। এই বাঙালি সমাজের কাছে আমার বিন্দুমাত্র কোন পাওয়ার আশা নেই। যারা নিজেদের শিক্ষিত, ভদ্র, বরিষ্ঠ বা নেহাত " ডাক্তার" বলে এই সমাজের কাছে ভদ্র ব্যবহার আশা করেন এখনও, তাঁদের জন্য আমার করুণা ছাড়া অন্য কিছু দেওয়ার নেই।

কিন্তু কাল, এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি যে " ঘৃণার" মানসিকতা আমার চির দিনের জন্য মনের গভীরে ঢুকে গেল, সেটার থেকে বোধহয় আর মুক্তি নেই। কালই বিকেলে সেই ভেনিসের সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে, দেওয়ালের ছবিতে, মিশরের লোকেদের ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কথা লিখলাম। ঠিক সেই সময়ই মনে হল, কালো কোট গায়ে জনা দশেক প্রাণী আমার দিকে বন্য বরাহের মত দাঁত বের করে হাসছিল। আমি সকাল থেকে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখার কথা মহিলা বিচারককে জানালে, উনি সরকারী উকিলটিকে বেশ ধমক দিচ্ছিলেন। ঐ বন্য বরাহের মত প্রাণীগুলির কেউ কেউ আবার সেই অমানবিক সরকারী উকিলকেই সমর্থন করে টিপ্পনী কাটছিলেন। ডাক্তার হিসেবে কারো কাছে বিন্দু মাত্র সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করি না বহু বছর হল। একটা ছেষট্টি বছর বয়সী লোক, ছয় ঘন্টার উপর এক জায়গায়, বেঞ্চে বসে ছিল; জাজ মহিলা নিজেই বললেন, " ওনাকে তো আমি দশটা সতের থেকে বসে আছেন দেখেছি!" সেটা জানার পরও যে প্রাণীগুলি দাঁত বের করে মজা করে, তাঁদের দেখলেই তো এরপর থেকে মনে হবে, ড্রেন থেকে উঠে এল।

আমার সন্তান সম নতুন ডাক্তারদের বহু বহু বার বলেছি, একমাত্র মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া ছাড়া অন্য অপশন না থাকলে এই চাকরীতে এসো না। সারা চাকরী জীবন কেউ বিন্দুমাত্র সম্মান দেবে না। চাকরী থেকে অবসর নেওয়ার পর শুধু আমার মত হেনস্থা হতেই হবে, হতেই হবে। আমার কালকের দুর্দশার কথা শুনে, আমার এক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক লিখেছেন, " এইরকম প্রতি সপ্তাহেই ভুগছি, সত্তর বছর পেরিয়ে গেছে, সামনের সপ্তাহেই কোলকাতা থেকে দুই শ কিমি দূরে সাক্ষী দিতে যেতে হবে।" তাই সাধু সাবধান। বিন্দু মাত্র সুযোগ পেলে, এই "চোরের চাকরি" থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে হবে। আমার এক বন্ধু দুদিন আগে বলছিল, " যো ডর গিয়া ও মর গিয়া।" আমি বলছি, " যো ঘুস গয়া, ও ফাঁস গয়া!"

বিদেশ ভ্রমণ ২৬

ভেনিসের শহরের বাইরে পাদুয়া নামের এই জায়গাটি বেশ নিরিবিলি। আমাদের হোটেলটির চারপাশে অনেক বড় বড় গাছ। কিন্তু জঙ্গল নয়। হোটেলের ছয়-সাত তলা বাড়িটি দেখলে নতুনের মত লাগে। পাঁচ-সাত বছর এর মত আগের হতে পারে। কিন্তু বিশাল এলাকার মধ্যে যে সব গাছ আছে, এক একটির বয়স একশ বছর হলেও হতে পারে। আমরা অন্য দিনের মতই সকলে দল বেঁধে নেমে, দোতলার প্রাতরাশের হলে, সকালের কাজ সেরে নিলাম। এখানেই কফি মেশিনের মত বড় মেসিনে সবই ইটালিয়ান ভাষায় লেখা। কফির জন্য দুধ নিতে গিয়ে বিপদে পড়তে হল। কোন বোতামে চাপ দিতে হবে, আন্দাজে চেপে হয়তো দুধের বদলে গরম জল পড়তে শুরু করলো। এই সময় এক বিদেশিনী আমার পিছনে এসে কাপ হাতে দাঁড়িয়েছেন। ওনাকেই ইংরেজিতে বললাম, কোনটা দুধের বোতাম দেখিয়ে আমাকে সাহায্য করতে। উনিও ইটালিয়ান ছিলেন না। কিন্তু একটু ভেবে বললেন, এই " ল্যাটটে" লেখাটাই দুধের জন্য।

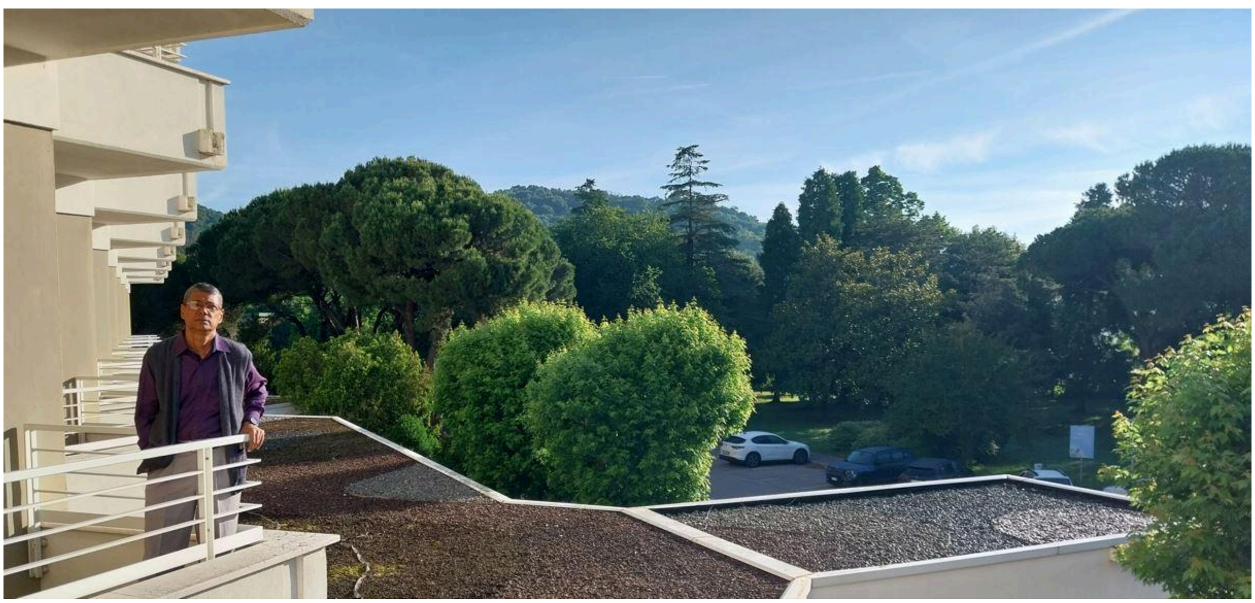

হোটেলের বাইরের গাছপালা

আমরা তল্পী গুটিয়ে বাসে উঠে বসলাম। আজ গন্তব্য, ঐতিহাসিক পিসার হেলানো টাওয়ার।

আমাদের ট্যুর ম্যানেজার পবন বলে দিয়েছিল, পিশা পৌঁছতে ঘন্টা তিনেক লাগবে। সেই একই রকম চওড়া, ঝকঝকে রাস্তা দিয়ে ছুটল আমাদের বাস। পিসার হেলানো টাওয়ার এর ছবি, আমার মনে হয় আমি ক্লাশ থ্রি বা ফোরেই দেখেছি। এটিকে পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য জিনিসের একটি বলা হয়। আমাদের দেশের তাজমহল ঐ সাতের মধ্যে একটি। এখানে আমার একটি,

অপ্রিয় সত্য কথা বলতে ইচ্ছা হল। আমি সেই ১৯৮৪ সালে প্রথম দেখি, তাজমহল। ভালো লাগেনি। সামনের বাগানের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। বাগানের জলাশয়ে জল ছিল না। দিল্লির লাল কেল্লার ভেতরের অবস্থাও তাই। অথচ তখনকার শাসক পরিবারের সবার নামে নামে একটি করে ভ্রমণ স্থান করে নিয়েছে; সেগুলি বেশ টাকা পয়সা খরচ করে, ভালো করে রাখা ছিল। সেসব দেখে আমার সাথে দিল্লী যাওয়া, আমার বন্ধু সন্দীপ বেশ কড়া সমালোচনা করেছিল। আমরা বাস থেকে নেমে, একটা বেশ বড় বাঁধানো চত্বর থেকে , ট্রামে উঠলাম। এই ট্রাম কিন্তু ওপরে টিকি বিদ্যুতে চালিত না। অনেকটা খেলনা ট্রেন এর মত,দুই কামরার, সাধারণ চাকার গাড়ী। মিনিট পাঁচেক পর আমরা ট্রাম থেকে নামলাম। এই পিসাতে ট্রামে চড়া , রাতের আইফেল টাওয়ার দেখা, আর ভেনিসের গন্ডোলা রাইড, এই তিনটির জন্য , যারা যারা যেতে চায়, তাদের আলাদা করে টাকা দিতে হয়েছিল। এখানে না হয় ট্রামে না উঠে কেউ দুই কিমি হেঁটেই যেতে পারে; কিন্তু ভেনিসে গণ্ডলায় না চাপলে লোকে কি জন্য ভেনিসে যাবে? এটা গো কোম্পানি, প্রথমেই একসাথে টাকা নিয়ে নিতেই পারত।

পিশার ট্রাম

ট্রাম থেকে নেমে, একটু গলি পথে হেঁটে, বাংলাদেশী হকারদের বাজারের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। একটি বড়, প্রায় দুটি ফুটবল মাঠের মত চত্বরে ওপাশে সেই পৃথিবী বিখ্যাত হেলানো টাওয়ার দেখতে পেলাম। বাঁ হাতে ঘাসের মাঠ রেখে, ডান দিকের পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম। গোটা পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষ এই চত্বরে হাজির হয়েছে। সবাই হেলানো টাওয়ার পিছনে রেখে ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত। ঘাসের মাঠের অন্য দিকে গোটা দুই তিন বিশাল বড় বড় অট্টালিকা আছে। গীর্জা, তার আনুষঙ্গিক আর কি কি যেন ঐ সকল বাড়ী। পবন একবার বলেছিল, কিন্তু সেসব শুনে মনে রাখার চেষ্টাও করিনি। সবাই ঐ হেলানো

টাওয়ার এর দিকেই তাকিয়ে, ক্রমশ এগিয়ে গেলাম। একশ ফুট মত দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, কিছু মানুষ টাওয়ারের উপর উঠেছে।

এটাতে ওঠা যায়, এটাতো জানতাম না। একথা শুনে পবন বলেছিল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে, পারলে উঠে যান। আট তলা উঁচুতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা সেরকম কিছু কষ্টকর ব্যাপার নয়। পরে মনে হল, আমি পা টেনে হাঁটছি দেখে কি পবন ঐ রকম বলল? কিন্তু টাওয়ারের একেবারে কাছে গিয়ে দেখলাম, টিকিট কেটে ওঠার জন্য বেশ লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকশ লোক। টাওয়ারের গায়ে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ নেই। আমরা তিন-চার জন হেঁটে, টাওয়ারের একেবারে উল্টো দিকে এগিয়ে গেলাম। ওদিকে পাথুরে রাস্তার পাশে পাশে দোকানপাট আছে। গোটা কয়েক ঘোড়ার গাড়িও দাঁড়িয়ে ছিল। ঐ দিকে দুটি সুন্দর ঝাউ গাছ এমন করে লাগানো হয়েছে যে, তাদের মাঝের জায়গাটা দিয়ে তাকালে , টাওয়ার এক দিকে চার ডিগ্রী হেলে আছে, পরিষ্কার বোঝা যায়। আবার ঐ দুই ঝাউ গাছের মাঝে দাঁড়িয়ে, টাওয়ার পিছনে রেখে, একপ্রস্থ ছবি তোলা হল।

তারপর ফেরার রাস্তা ধরলাম। সেই বাংলাদেশী হকারদের বাজারের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে একটি বাংলাদেশী দোকানে পিজা খেতে বসা হল। ইটালিতে গিয়ে পিজা খেতে কেমন লাগে, সেই রকম একটা বিশেষ কৌতুহল ছিল। কিন্তু খুবই হতাশ হতে হল। বাস্তবে এত বাজে পিজা আমি আর কোথাও খাইনি। পিজার দোকান থেকে, গো কোম্পানির দুটি দলই একসাথে হেঁটে, ট্রাম ধরার জন্য এগিয়ে গেলাম। রাস্তার পাশে মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হল। এখানেই আমাদের দলের ডা ভট্টাচার্য , রাস্তার উল্টো দিকে দৌড়ে গিয়ে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জন্ম স্থান দেখে এসেছিলেন। এই ব্যাপারটি জানার পর, এটা গো কোম্পানির একটি বিরাট ভুল মনে হয়েছে আমার। যেটুকু সময় আমরা ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তার থেকে হয়তো আর পাঁচ মিনিট বেশী সময় লাগত। কিন্তু এত বড় একটা তীর্থের একশ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট কাটিয়ে

দিলাম, এটা ভেবে নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। ভেবে দেখুন, ইটালির কোন পর্যটক কলকাতায় ঘুরতে এসেছেন, উনি চিতপুর ট্রাম লাইনে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট কাটিয়ে চলে গেলেন; কেউ ওনাকে বোললোই না, একশ মিটার দূরে থেকে গেল, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জন্মস্থান এই গলিতে

আমরা ট্রাম ধরে আমাদের বাসের কাছে ফিরে এলাম। এবার বাস চলল, ফ্লোরেন্স শহরে। ঘন্টা খানেকেই পৌঁছে গেলাম, ফ্লোরেন্স। একটা নদীর বাঁধানো পারের উপরে, রাস্তার পাশে দাঁড়াল বাস। নদীর পাড়ে একটা বড় বাগান মত জায়গায় আমরা ঢুকে গেলাম। কয়েক মিনিট পর একজন স্থানীয় গাইড এসে হাজির হলেন। এদের সাথে ট্যুর কোম্পানী আগে থেকেই যোগাযোগ করে রাখে। উনি আমাদের সকলকে একটি করে ছোট, গলায় ঝোলানো মেশিন দিলেন। এই মেশিনের সাথে, এক কানে লাগানোর জন্য একটি করে হেডফোন। এই মেশিন হল একটি এফ এম রেডিও সেট। গাইডের পিছনে পিছনে আমরা তিরিশ জন চললাম, ফ্লোরেন্স শহরে হেঁটে ঘুরে দেখতে। উনি রেডিওতে বলে চলেছেন, আমরা কেউ কেউ ওনার সাথেই চলেছি, কেউ কেউ হয়তো পঞ্চাশ ফুট মত পিছিয়ে পড়েছেন। ওনার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু উচ্চারণ পরিষ্কার নয়; খুব ভালো বুঝতে পারিনি আমি। স্থানীয় গাইড নিয়েও আমরা ফ্লোরেন্সের আসল জিনিস না দেখেই ফিরে এসেছি। পরে সেটা জেনে খুবই আফশোস হয়েছে।

গলায় ঝোলানো এফ এম রেডিয়ো

আজ জুলাই মাসের কুড়ি তারিখ। চারিদিকে একটা সাজো সাজো রব। কলকাতায় কাল বড় রাজনৈতিক সমাবেশ আছে। আমার কাল কলকাতায় কোন কাজ নেই। যাদের আছে, তারা বেশ ঝামেলায় পড়তে পারে। বাইশ তারিখ থেকে পরপর নয় দিন, স্বাস্থ্য ভবনের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষন দিতে যেতে হবে। সাধারণত মাসে এক আধ দিন যেতে হলে, মোবাইলে একটা ট্রেনের রিটার্ন টিকিট কেটে চলে যাই। এইরকম পরপর নয় দিন যেতে হবে, রোজ রোজ টিকিট কাটার হ্যাপা না করে একটা মান্থলি কেটে নিলাম, আজ সকালে। টিকিট আছে বলেই, গাছের চারা আর গোবর সার কিনতে শিয়ালদা চলে গেলাম। সাধারনত বাসে শ্যামবাজারের পাখীর হাটে চলে যাই, দুই এক রবিবার ছাড়া। শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রীটের বাজারের মত দামেই চারা পেলাম, বি আর সিং হাসপাতালের পাশের রাস্তায়।

এই দামের কথায় মনে পড়ল , গত পর্বে একটা ভুল লিখেছি। ভেনিসের রেস্টুরেন্টে ভেজ বিরিয়ানি ১৬৫০ ইউরো লেখা হয়েছে। ওটা ১৬ দশমিক ৫০ হবে। শিয়ালদা ষ্টেশন চত্বরে বেরিয়ে দেখি সরকারী বেসরকারি বাসের মেলা বসে গেছে। বাসের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা খুঁজে বি আর সিং হাসপাতালের দিকে যেতে হল। দুটি বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। একটির দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার সেই বছর পনের আগের মত, কয়েকজন ডাক্তার গলায় আলা ঝুলিয়ে বসে আছে। মেদিনীপুরের গ্রামের বাড়িতে থাকার সময়, বহু বছর আগে, আমরা ছেলেরা পাড়ার লোকেদের পুকুর পাড়ে , কয়েতবেল কুড়াতে যেতাম। পাশেই ছিল একটা বাঁশের ঝাড়। ওখানেই সকলে পায়খানা করার জন্য যেত। ওটাকে ওরা বলত, “গু বন!” সেই সময় কিন্তু আমাদের সেই বেল কুড়ানোর

নেশায়, গু বন, বাঁশ বন, তুলসী বন, বিছুটি বন কিছুই আলাদা করে বোঝার ক্ষমতা ছিল না। এখন চিন্তা করলে , গা ঘিন ঘিন করে। পনের বছর আগে, আমরাও ডাক্তার নেতা, দাদাদের পিছু পিছু দল বেঁধে গিয়ে, মঞ্চে বসে ঘন্টা তিন চার কাটিয়ে আসতাম। একবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে, আমাদের এক বিভাগীয় প্রধান, প্রফেসার ম্যাডামের সাথে বসে, " ডিম্ভাত" খেয়ে নিলাম। তখনও অবশ্য এই " ডিম্ভাত" কথাটা একটা একশ শতাংশ রাজনৈতিক কথা হয়ে যায়নি। ঠিক সেই গুছাইত বাড়ীর "গু বনে " ঘুরে আসার কথা মনে পড়ে এখন, এদের দেখে। সেই ম্যাডামও আমার থেকে বছর তিনেক আগে অবসর নিয়েছেন। আর দেখা হয়নি। দেখা হলে জানার আগ্রহ আছে, ওনারও এখন, পিছনে তাকিয়ে, গা ঘিন ঘিন করে কি না।

বিদেশ ভ্রমণ ২৭

আমরা আর্নো নদীর পাড় থেকে ক্রমশ ডান দিকে, ফ্লোরেন্স শহরে ঢুকে গেলাম। এই ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে দুইজন পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ জন্মেছেন। একজনের নামই তো শহরের নামে। আমার নিজেরই একটু দ্বিধা ছিল যে, মহামানবী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আদৌ এই শহরে জন্মেছিলেন কি না। পরে জেনেছি, ওনার জন্ম ওখানে হলেও, ওনার ব্রিটিশ নাগরীক বাবা মা ওনাকে, এক বছর বয়সেই ইংলণ্ডে নিয়ে চলে আসেন। কিন্তু দুঃখের কথা, আমাদের দলের কেউ কেউ, সেই গাইডকে মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এর কথা জানতে চাইলেন; কিন্তু গাইড আমাদের সেই তীর্থে নিয়ে গেলেন না। ইটালির গাইড সেই তীর্থের খবর জানেন না, এটা আমি মানতে নারাজ। উনি আর একটি বিখ্যাত জায়গা আমাদের দেখালেন না। পরে সেকথা জেনে , আমার বিশ্ব পর্যটক ডাক্তার দাদা প্রায় আমাকে চড় থাপ্পড় মারতে চেয়েছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর, মাইকেল এঞ্জেলো এই শহরের কোথাও বসেই, ডেভিড মূর্তি খোদাই করেছিলেন। সেই জায়গায়ই, পৃথিবীর সুন্দরতম পুরুষ মূর্তি ডেভিড এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা সেই জায়গার হয়তো একশ ফুট দূর থেকে চলে এসেছি। পরে অবশ্য প্রফেসর সান্যাল স্যার বলেছেন যে, আসল ডেভিড মূর্তি এখন মিলানের মিউজিয়াম এ আছে। তাতে আমার আফশোস কম হওয়ার কোন যুক্তিই নেই।

ফ্লোরেন্স শহরে ডেভিডের নকল মূর্তি

আমরা ঐ বয়স্ক গাইডের পিছন পিছন দল বেঁধে এগিয়ে চললাম। এই ফ্লোরেন্স শহরও ইউরোপের অন্য শহরগুলির মতোই পরিষ্কার। এখানে রাস্তায় একটু বেশী মানুষ হেঁটে চলেছে। জানিনা, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আমাদের মত পর্যটক হয়তো। আমরা যে সব এলাকায় ঢুকে

গেলাম, সেখানে পাথর বাঁধানো রাস্তা। কিন্তু গাড়ী চলে না। একটু পুরনো ধাঁচের বাড়িগুলি। একটু দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, বেশ বড়, উঁচু একটি গীর্জার চূড়া। গাইড বলেছিল, ওটিই ওখানকার সবথেকে বড় গীর্জা। আস্তে আস্তে আমরা একেবারে ঐ গীর্জার পাশ দিয়ে ঘুরে, অন্য পাশের বড় চত্বরে পৌঁছে গেলাম। একটা বড় ফুটবল মাঠের মত বড়, পাথর বাঁধানো চত্বর। গীর্জার চূড়া এত উঁচু যে, গোটা গীর্জার ছবি তোলা যাচ্ছিল না। চত্বরের উল্টো দিকে একটি গীর্জার মত বাড়ীর বিশাল সোনালী রঙের দরজা। ওটি দেখতে বন্ধ দরজার মত; কিন্তু আসলে ওটা কোনোদিনই সম্ভবত খোলা হয় না। এই দরজা ব্রোঞ্জের তৈরী। এই বিশাল দরজায় দশটি চৌকো ভাগে, বাইবেলের দশটি কাহিনী খোদাই বা ঢালাই করা হয়েছে। পাঁচ-ছয় শ' বছর আগে তৈরী ঐ শিল্প কর্মগুলি এখনও বেশ উজ্জ্বল। লোহার শক্ত বেড়া দিয়ে ঐ দরজা ভালো করে ঘেরা আছে। পরে জেনেছি, ঐ রকমের চারটি দরজা ঐ বাড়ীর চার দিকে আছে; আমরা পুর্ব দিকের দরজাটি দেখেছি। এই দরজাগুলির নাম, ডোরস অফ প্যারাডাইস।বেড়ার ফাঁকে মোবাইল রেখে ছবি তোলা গেল।

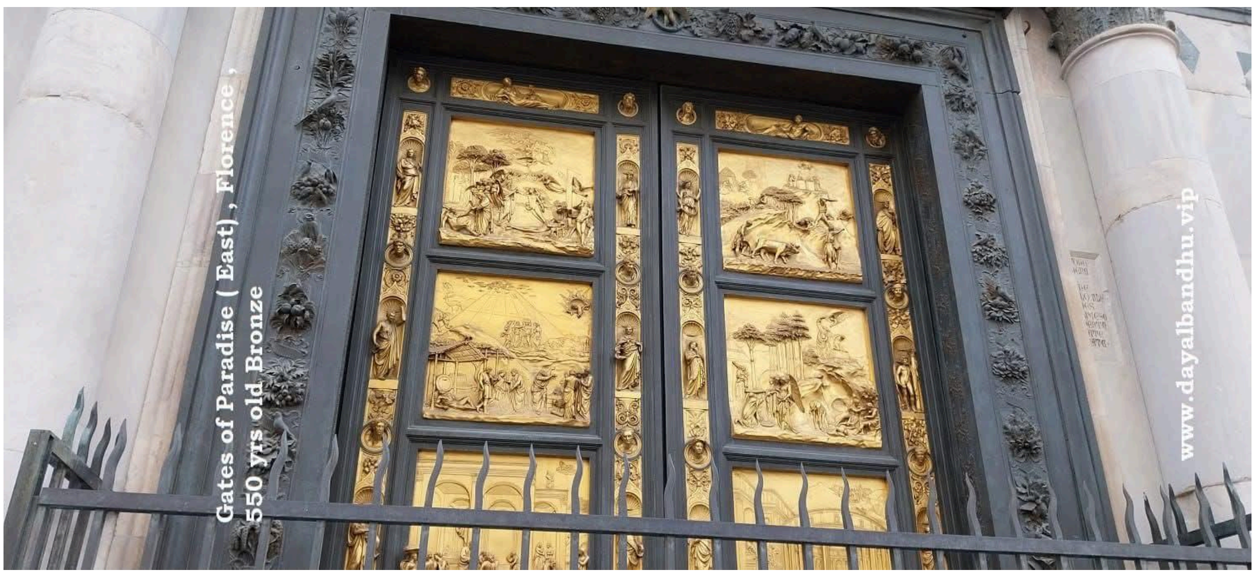

এইসব ছবি আমার ইউরোপ ভ্রমণ এর ভিডিওগুলিতে দিয়েছি। ঐসব গীর্জা ইত্যাদির অনেক বর্ণনা আমাদের গাইড দিয়েছিল; কিন্তু ঐ সব ইতিহাস শোনার মত ধৈর্য আমার ছিল না। ঐ চত্বর থেকে একটা পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে আমরা পাঁচ সাতশ মিটার মত দূরে আর একটি বড় বাঁধানো চত্বরের মধ্যে গিয়ে থামলাম। এই চত্বরটি বেশ বড়; দুই তিনটি ফুটবল মাঠের মত হবে। গাইড বলেছিল, আগেরটিকে রিলিজিয়াস স্কয়ার আর এইটিকে পলিটিক্যাল

স্কয়ার বলা হয়। অবশ্য আমার সেই বিশ্ব পর্যটক ডাক্তার দাদা বলছিলেন, এরকম কোন নাম হয় না। ঐগুলির নির্দিষ্ট কিছু নাম আছে। আসলে গাইড যেটিকে পলিটিক্যাল স্কয়ার বলেছিল, সেটি একটি ভাস্কর্যের বাগান। এটি সম্রাট বা রাজার ইচ্ছায়, স্বয়ং মাইকেল এঞ্জেলো সাজিয়েছিলেন।(আমার ডাক্তার দাদার কাছেই শোনা)

পিছনে, আমাদের দলের রাজ্যপালের মাথার উপর ডেভিড মূর্তি

আমাদের গাইডের বলা সেই পলিটিক্যাল স্কয়ার নামের বিশাল চত্বরে পৌঁছেই আমরা শুনতে পেলাম, দূরে কোথাও হরে কৃষ্ণ কীর্তন হচ্ছে। মাঠের একেবারে অন্য দিক দিয়ে একদল লোক খোল কর্তাল বাজিয়ে চলেছেন। মাঠের মাঝখানে একটি মহিলার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া মাঠের পাশে পাশে বেশ কিছু মূর্তি আছে। আমি শুনেছিলাম এই ফ্লোরেন্স শহরে কোথাও ডেভিড মূর্তি আছে। কিন্তু যে কটা মূর্তি দেখলাম, সবই প্রাচীন হলেও ডেভিড মূর্তি খুঁজে পেলাম না।(বাড়ী ফিরে আড়াই মাস পরে , ই-বুকে ছবি দিতে গিয়ে দেখি, আমার তোলা ছবিতে , ডেভিড মূর্তি দেখা যাচ্ছে! মাঠের এক কোন দিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। সামান্য কিছু এগিয়ে একটা ছোট্ট পাথর বাঁধানো উঠান মত। একপাশে একজন বয়স্ক মানুষ, গোটা কুড়ি পঁচিশ হাতে আঁকা ছবি নিয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে মনে হল, একজন মানুষ বসে , নিজের একটি ছবি আঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। আমাদের দেশের মেলা বা ঐরকম কিছু জায়গায়, এই ধরনের কিছু ছবি আঁকিয়ে পয়সা রোজগারের মানুষ দেখেছি। এরা সাধারণত গরিব শিল্পী। ঐ রকম একটা শিল্পের তীর্থেও সেরকম, গরীব শিল্পী, পথের ধারে বসে, ছবি এঁকে রোজগার করছেন, ভাবতেই কষ্ট হয়। এই জায়গার থেকে একশ হাতের মধ্যে, পৃথিবীর সর্ব কালের, সর্ব শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, মাইকেল এঞ্জেলো

একদিন ডেভিড মূর্তি খোদাই করেছিলেন। আমাদের গাইড সেই কথা বললই না! ঐ বাঁধানো চত্বরের থেকে কুড়ি পঁচিশ মিটার দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর্নো নদী। গাইড ঐ নদীর পাড়ে আমাদের পৌঁছে দিয়েই, তাঁর দেওয়া, গলায় ঝোলানো মেশিন ফেরৎ নিলেন। আমরা নদীর পাড়ে পাড়ে হেঁটে বাসের কাছে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা প্রায় এসে গেল। আমরা এবার হোটেলের দিকে চললাম।যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা গাইডের দেওয়া এএফ এম রেডিও ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম, সেখান থেকে পঞ্চাশ মিটার মত দূরে যে সেতু দেখা যাচ্ছিল, সেটিও একটি ঐতিহাসিক সেতু। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় , জার্মান সেনা আর্নো নদীর উপর অন্য সব সেতু ভেঙ্গে দিলেও, এটিকে রেখে দেয়। এই সেতুর নাম, " পন্টি ভ্যাচ্চিও। আমার সেই ডাক্তার দাদা জানিয়েছেন, আসল ডেভিড মূর্তি এখন ফ্লোরেন্সেই আছে, একাডেমিয়া নামের মিউজিয়ামের ভেতরে।

পন্টি ভ্যাচ্চিও

আজ ২৪ শেষ জুলাই। আমরা মে মাসের ২৯ তারিখ ঐ ফ্লোরেন্স শহরে হেঁটে এসেছি। শুরুর দিকে ভেবেছিলাম, বাড়ী ফিরে, এক মাসের মধ্যে এই ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনী লেখা শেষ করে ফেলব। হল না। আরও অন্তত দুই তিন পর্ব লিখতে হবে। এসে থেকে একমাস বাড়ি বসে থেকেও সব লেখা শেষ হল না। তার কারন মাঝে অনেক কটি অন্য কাজ নিতে হয়েছে। ভ্রমণের ভিডিও ইউটিউবে দিয়েছি, সবকটাই। লেখাও পর পর আমাদের নতুন ওয়েব সাইটে তুলে রাখছি। গতকাল সন্ধ্যায় আমার এক সহৃদয় পাঠক বললেন, সবকটা লেখা একসাথে কোথাও রাখুন, টানা সব পড়ে শেষ করতে পারিনি। আমি আগেও বলেছি, আজও লিখলাম; আমাদের ওয়েব সাইটে, আমার সব লেখা পেয়ে যাবেন। www.dayalbandhu.vip এই লিঙ্কে গিয়ে, " ভ্রমণ কাহিনী" পেজে, ভ্রমণ নিয়ে সব লেখাই পাবেন।

বিদেশ ভ্রমণ ২৮

ফ্লোরেন্সের আর্নো নদীর পাড়ে আমাদের সাদা বাস দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দলের সকলে এক এক করে হেঁটে এসে বাসে উঠে বসতে মিনিট পনের লাগল। গত পর্বে লিখেছিলাম,নদীর পাড়ে একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়ে, ফ্লোরেন্সের গাইড বিদায় নিয়েছিল। ওখান থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে নদীর উপর একটা সেতু দেখতে পাচ্ছিলাম। এইরকম সেতু, এই দশ এগারো দিন ইউরোপে ঘুরে অন্তত পঞ্চাশটি দেখেছি। কিন্তু ঐ সাধারণ একটি সেতুর যে এত ঐতিহাসিক গুরুত্ব ওআছে, আজই আমার সেই ডাক্তার দাদা বলেছেন। আর আমার আফশোস বেড়ে গেছে। ঐ সেতুর নাম পন্টে ভাচ্চিও। হাজার বছর এর পুরনো এই সেতুকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ও ধ্বংশ করা হয়নি। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝে, গাইডের অবশ্যই উচিত ছিল ওটা আমাদের দেখানো।

আমাদের জমায়েত, পিছনে সেই ঐতিহাসিক সেতু

আমি এই ফ্লোরেন্স শহরে দুইজন পৃথিবী বিখ্যাত মহা মানব জন্মেছেন লিখেছি। দাদা জানালেন, ব্রুনো, গ্যালিলিও এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া এই ফ্লোরেন্সেই দা ভিঞ্চির যাবতীয় কর্মকাণ্ড। ইউরোপের নবজাগরণের আঁতুর ঘর এই ফ্লোরেন্স শহরে আমরা হেঁটে এসেছি, এটাই সারা জীবন মনে থাকবে। দাদা আর একটা কথা বলেছেন, আসল ডেভিড মূর্তি

অন্য কোনো শহরে নয়, এই ফ্লোরেন্স শহরে, একাডেমিয়া নামের সংগ্রহশালায় আছে; খুব সম্ভবত টিকিট কেটে, লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে দেখা যায়। আমরা মাত্রই ঘন্টা তিনেক এই ঐতিহাসিক শহরে ছিলাম। আমার ডাক্তার দাদা বলছিলেন, অন্তত তিনদিন থাকতে হয় ফ্লোরেন্সে।

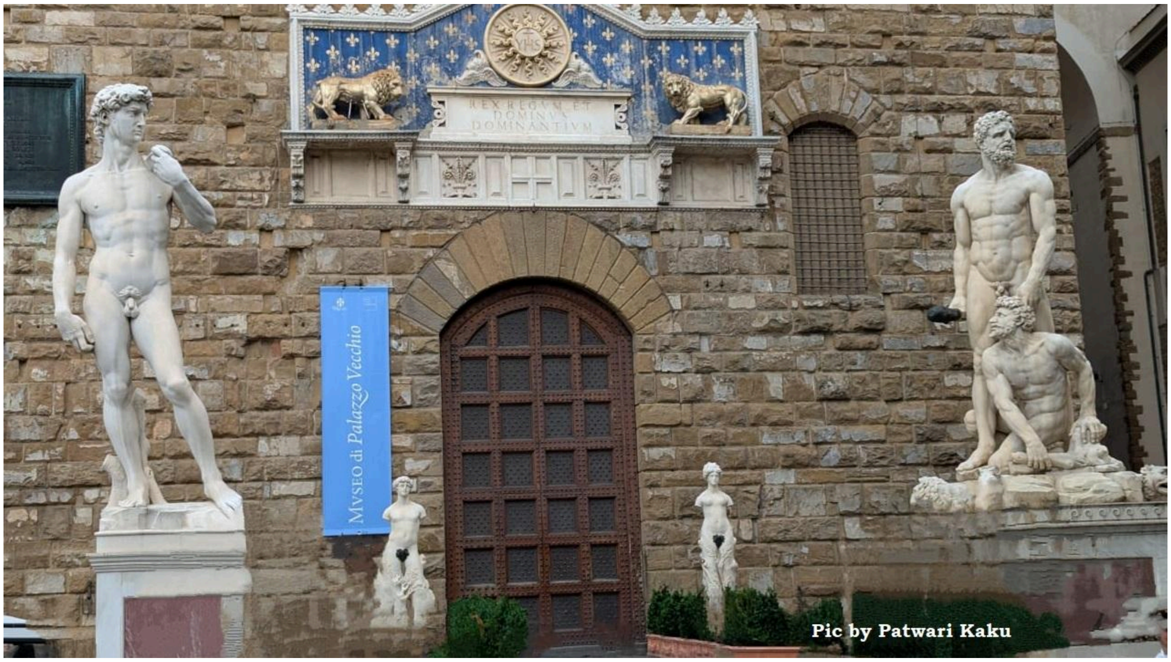

পাটোয়ারী কাকুর তোলা ছবি

ফ্লোরেন্স থেকে ঘন্টা দেড়েক বাসে চলে, অনেকটা রোমের দিকে এগিয়ে, একটা শহরতলীর হোটেলে উঠলাম। এই জায়গার নাম আরিজো। পরদিন সকালে আগের সব দিনের মত হোটেলে প্রাতরাশ সেরেই তল্পী গুটিয়ে বাসে উঠলাম। আসলে এই ২৯ শে মে আমাদের এবারের ইউরোপ ভ্রমণ এর শেষ দিন। বাসে ওঠার সময় মনে পড়ল, একবার দাদার সাথে কথা বলি। হোটেলের ওয়াই ফাই বাসের কাছে পর্যন্ত ভালো কাজ করছিল। দাদাকে ভিডিও কল করে কথা বলতে শুরু করলাম। উনি তো আমাদের ফ্লোরেন্সে ফাঁকিবাজির কথা শুনে রেগেই গেলেন। আজ ভ্যাটিকান সিটি আর রোমে যাচ্ছি জেনে উনি আমাদের কি কি দেখা উচিত একটু বলে দিলেন।

ঘন্টা দেড়েক চলে বাস রোম শহরে ঢুকে গেল। সেই একই রকম সুন্দর শহর। বড় বড় রাস্তা। টাইবার নদীর উপর দুটি সেতু দু'বার করে পেরিয়ে একটু ঘুরপাক খেতে হল, সম্ভবত আমাদের বাসের ড্রাইভার রাস্তাটি একটু ভুল করে ফেলেছিল।

রোমের টাইবার নদীর পাড়ে, আমাদের মামার পছন্দের সেই সাইকেল

ঐ সময় দূর থেকেই একটি বিশাল প্রাসাদের মত বাড়ীর উপরের অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম। পরে ভ্যাটিকান সিটির মধ্যে ঢুকে দেখলাম, ওটিই ভ্যাটিকানের প্রধান গীর্জা অর্থাৎ সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার চূড়া। আমাদের বাস একটি মাটির নিচের পার্কিং এর জায়গায় নিয়ে গেল আমাদের। ওখানে নেমে, আমরা সবাই দল বেঁধে ম্যানেজার পবন এর সাথে হেঁটে চললাম। একটু সরু রাস্তা দিয়ে মিনিট পাঁচেক হেঁটেই পৌঁছে গেলাম ভ্যাটিকান সিটি। একটি বিরাট বাঁধানো চত্বর; গোটা দুই ফুটবল মাঠের মত হবে চত্বরটা। মাঠের উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে, বিরাট উঁচু, প্রাসাদোপম সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা। ব্যসিলিকার সামনে প্রায় একটি ফুটবল মাঠের মত জায়গা জুড়ে সারিবদ্ধ ভাবে কয়েক হাজার চেয়ার পাতা আছে। ওদিকটা বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আমরা বেড়ার এই পাশে দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুলে, ডান দিকে এগিয়ে গেলাম।

গোটা চত্বরের চার দিক ঘিরে তিন- চার তলা সব বাড়ী। ডান দিকে আমরা যেখানে লাইনে দাঁড়িয়ে, ভেতরে ঢুকে একেবারে ব্যসিলিকার সামনের মাঠে পৌঁছনোর চেষ্টা করছিলাম, সেদিকে শ খানেক বিরাট মোটা মোটা, প্রায় তিরিশ চল্লিশ ফুট উঁচু থামের উপর ছাদ। ছাদের নিচে প্রায় দশ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে, আমাদের কোলকাতার দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে ঢোকার মত ভিড় ঠেলে, সিকিউরিটি চেক করতে হল। দুটি লাইন সেই সময় চলছিল। পাশে আরও গোটা দুই তিন স্ক্যানিং মেশিন এর ব্যবস্থা ছিল।

সিকিউরিটি চেক করতে

সিকিউরিটির পর আমরা সবাই হেঁটে এগিয়ে গেলাম সেই বিরাট প্রাসাদের সামনের চওড়া বারান্দার দিকে। গোটা দশেক সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হল। বারন্দায় দাঁড়িয়েও কিছু ছবি তোলা হল। তারপর প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফুট উঁচু সিংহ দরজা দিয়ে আমরা ব্যাসিলিকায় ঢুকলাম। ভেতরের হল

ঘরটিও প্রায় একটা ফুটবল মাঠের মত হবে। মাঝের জায়গাটা হাজার খানেক ফাইবারের চেয়ার দিয়ে সাজানো। ঐ চেয়ার এর সারির দুই পাশে প্রায় তিরিশ ফুট করে জায়গা রাখা হয়েছে; লোকজন দুই দিক দিয়ে যাচ্ছে আসছে। ঐ সময় হয়তো হাজার পাঁচেক লোক ব্যসিলিকার ভেতরে ছিলাম। বিশাল উঁচু গম্বুজের মত ছাদের দিকে তাকাতে গেলে ঘাড় ধরে যায়। এত মানুষের কথার শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনি করে ভেতরটা গম গম করছে। গোটা পৃথিবীর কোটি কোটি ক্যথলিক ধর্মাবলম্বী মানুষের পিঠস্থান এই বাসিলিকা। আমাদের হিসেবে, মন্দির। কিন্তু এখানে জুতো খুলে ঢোকার ব্যাপার নেই। যে যার মত ছবি আর ভিডিও তুলে নিলাম। আমাদের দেশে কোন ছোটখাট মন্দিরেও আজকাল মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকা যায় না।

ব্যসিলিকার ভেতরে

ভেতরের প্রতিটা দেওয়ালে অসংখ্য মূর্তি আর ছবি। ছাদের গম্বুজ সবই ছবি দিয়ে সাজানো। আমি ছবি বা মূর্তি কিছুই বুঝি না। স্থান মাহাত্ম আর ঐ সব শিল্প কর্মের বিপুল গাম্ভীর্য আপনাকে স্তব্ধ করে দেবে। আমার সেই বিশ্ব পর্যটক ডাক্তার দাদা কোন কোন মূর্তি বা ছবি বিশেষ করে দেখে নিতে বলেছেন, তাও ভুলে গেছি। এমনকি ভিডিও তোলার সময় যে দুই একবার ঐ ব্যসিলিকার নাম বলেছি, তাও ভুল বলা হয়েছে। এক ঘন্টার উপর ঐ মন্দিরের ভেতরে ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। কেউ একবারও বলেনি, ভিড় বাড়ছে, এগিয়ে যান।

শুধু ঐ মাঝের হল নয়, দুই পাশে দুটি লম্বা গলি রাস্তা মত আছে; তাদের পাশে পাশে একই রকম ছবি আর মূর্তির সমাহার। এ ছাড়া পাশে পাশে কয়েক ডজন খোপ করে , সম্ভবত আগের আগের সব পোপেদের সমাধী করে রাখা হয়েছে। সবই বিস্তৃত লেখা আছে; এত পড়ে দেখার সময় আমাদের ছিল না। ভেতরের সব দেওয়াল আর ছাদের শিল্প সামগ্রী দেখে আমরা বেরিয়ে আসার রাস্তা ধরলাম। বেরোনোর আগে একটি বড় দোকানের মত জায়গায়, বিভিন্ন স্মৃতি চিহ্ন বিক্রী হচ্ছিল, আমাদের অনেকেই কিছু না কিছু কিনেছে। উপরে বারান্দার চাথাল থেকে নেমে , ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দুই জন, লাল ঝলমলে পোশাক পরে যেন গেট পাহারা দিচ্ছে। বোঝা গেল মহামান্য পোপ ঐ পথের ভেতরে কোথাও থাকেন। (ইউ টিউবে আমার ইউরোপ ভ্রমনের ভিডিও পর্ব -১১ তে ভ্যাটিকান দেখুন)

মহামান্য পোপ এর প্রহরী

মাঠের যে দিক দিয়ে ঢুকেছি তার উল্টো দিকের অট্টালিকাগুলির সামনে দিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম। একটি বাড়ীর নীচে দেখলাম, ভ্যাটিকান পোস্ট আপিস লেখা। তারপর শৌচালয়। সেখানে লম্বা লাইনে দাড়িয়ে গেল আমাদের কেউ কেউ। একটিই লাইন ছিল। মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে গেছে দেখে কর্মচারীরা পুরুষদের অন্য লাইনে এগিয়ে যেতে বলল। আমরা ডান দিকে ঢোকার জন্য এগোনোর সময়, ম্যানেজার বলে দিয়েছিল, বাঁ দিকে কোন বাড়ীর সামনে এসে সকলকে হাজির হতে হবে। আমরা এসে দেখি, আমাদের দলের অনেকেই এসে গেছে। তারা পাশের বাড়ীর সামনে পৈঠায় বসে বসে দুপুরের খাবারের প্যাকেট খুলে খেতে শুরু করেছে। একটি বড় কাগজের পেটি মত বাক্সে আমাদের দলের সবার খাবার রাখা ছিল। আমরা আমাদের বরাদ্দ প্যাকেট নিয়ে, জায়গা খুঁজে বসে গেলাম। খাদ্য সেই বার্গার আর আলুভাজা। আমাদের দেশে যেমন রাস্তার কুকুর বা কাক এসে যায়, ওখানে কয়েকটা কালো পায়রা এসে খাওয়ার খুঁটে খুঁটে খেতে থাকল। একটু করে আলু ভাজা ফেলে দিলে পায়রা এসে ঠুকরে খেতে থাকল। ঐ সময় একটি পুলিশের গাড়ী সামনের চত্বরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ীর গায়ে লেখা, ভ্যাটিকান পুলিশ। মনে পড়ল, এই বিশাল চত্বরটি একটি আলাদা দেশ। সম্ভবত পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দেশ। কিন্তু আমাদের খাওয়া শেষ হতেই একজন ভিখারিনী এসে হাজির। তার মূর্তি দেখে ভিখারিণী না

ভেবে, পাগলিনী ভেবেই শান্তনা দিলাম নিজেকে যে, এসব দেশে ভিখারিনী কেন থাকবে! কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙতে মিনিট দশেক লাগল। সেই গলি পথে বাসের কাছে ফিরে আসার সময়, আর একজন ভিখরিণী এসে আমাদের কাছে হাত পাতল।

পোপের দেশ থেকে বেরিয়ে, বাসে চেপে চললাম, রোমের এক ঐতিহাসিক সৌধ দেখতে। এবার আমাদের গন্তব্য কলোসিয়াম।

আজ ২৬ শ জুলাই। দুপুরে জোর এক পশলা বৃষ্টির পর আর বৃষ্টি হচ্ছে না। গতকাল ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে টের পেলাম জোর বৃষ্টি হচ্ছে। সকালে বেরোতেই পারলাম না। দুপুরে স্বাস্থ্য ভবনের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষন দিতে বেরোতেই হল। দুপুরের অন্ধকারে ছাতা মাথায় দিয়ে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু ক্লাশের অবস্থা দেখে হতাশ হতে হল। পঞ্চাশ জনের হল ঘরে তের জন বসে আছেন। কিছু বলবার উৎসাহই পেলাম না। কিন্তু ওনাদের কাছে যে খবর পেলাম, সেটা আমার জন্য তুলনামূলক ভাবে কম অপমানের মনে হলেও, সার্বিক মেডিক্যাল এডুকেশন সিস্টেম এর জন্য খুবই হতাশার। ঐ তের জন সকলেই কোন না কোন মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষক। আমি তো পঞ্চাশ এর জায়গায় তের জন পেয়েছি, সম্ভবত দুর্যোগের কারণে। ওনারা দেড়শ জনের ক্লাশে " তিন জন" ছাত্র ছাত্রী পাচ্ছেন আজকাল। অলমতি বিস্তারেন ।

বিদেশ ভ্রমণ ২৯ (শেষ পর্ব)

ভ্যাটিকান সিটি রোম শহরের মধ্যে একটা বড় পাড়া বলা যায়। সেখান থেকে শহরের মধ্যে আর এক দিকে কলোসিয়াম। আমাদের বাসে যেতে বেশী সময় লাগল না। কলোসিয়াম একটু রাস্তা থেকে নিচু জায়গায়। বড় রাস্তা থেকে গোটা দশেক সিঁড়ি নেমে, বিশাল চক্রাকার সৌধকে প্রায় অর্ধেক পাক দিয়ে আমরা একটু ছায়ার দিকে দাঁড়ালাম। এখানেও আমাদের জন্য একজন স্থানীয় গাইড ঠিক করা হয়েছে। এই মহিলাও আমাদের একটি করে গলায় ঝোলানো মেশিন আর এক কানে লাগানোর হেডফোন দিয়েছে।

চারতলা উঁচু কলোসিয়াম এর ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা গাইডের বলা কথাগুলি হেডফোন শুনতে থাকলাম। উনি আধ ঘন্টার বেশী সময় ধরে এই দুই হাজার বছর আগে তৈরী সৌধটি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিয়েছেন। এত বড় একটি পাথরের সৌধ , দুই হাজার বছর আগে কি করে তৈরী করা হয়েছে, ভাবাই যায় না। তখন তো সিমেন্ট ছিল না; পাথরগুলো কি করে জোড়া হয়েছে বুঝলাম না। সম্ভবত কোন ভূমিকম্পে একটা দিকের উপরের দুটি তলা ভেঙে পড়ে। ছবিতে যেমন দেখা যায়, সৌধটি একটু দূর থেকে দেখলে চক্রাকারে সাজানো অনেক বড় বড় অলিন্দ বা জানালা দেখা যায়, প্রতিটি তলায়। একেবারে নিচের তলার প্রতিটি অলিন্দ বা দরজা আমরা বেশ সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম। এক একটি দরজা দিয়ে বড় বড় হাতি অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। নিচের সব দরজা মোটা মোটা লোহার বেড়া দিয়ে পুরোটাই ঘেরা। নির্দিষ্ট জায়গায় ছাড়া, মানুষ ঢোকার ফাঁক নেই। উপরের তলার অলিন্দগুলিও প্রায় চার ফুট উচুঁ বেড়া দেওয়া। যারা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে, উপরে উঠেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ সব জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে নিচে দেখছে। কয়েকটি জায়গা থেকে ভেতরের দৃশ্য দেখতে পাওয়া

যায়। ভেতরে কয়েক হাজার লোক ঢুকেছে মনে হল। টিকিট কেটে বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, অন্তত তিন-চারশ লোক। আমাদের ভেতরে ঢোকার পরিকল্পনা ছিল না। ওখানে ঘন্টাখানেক কাটিয়ে বাসের কাছে ফিরে এলাম।

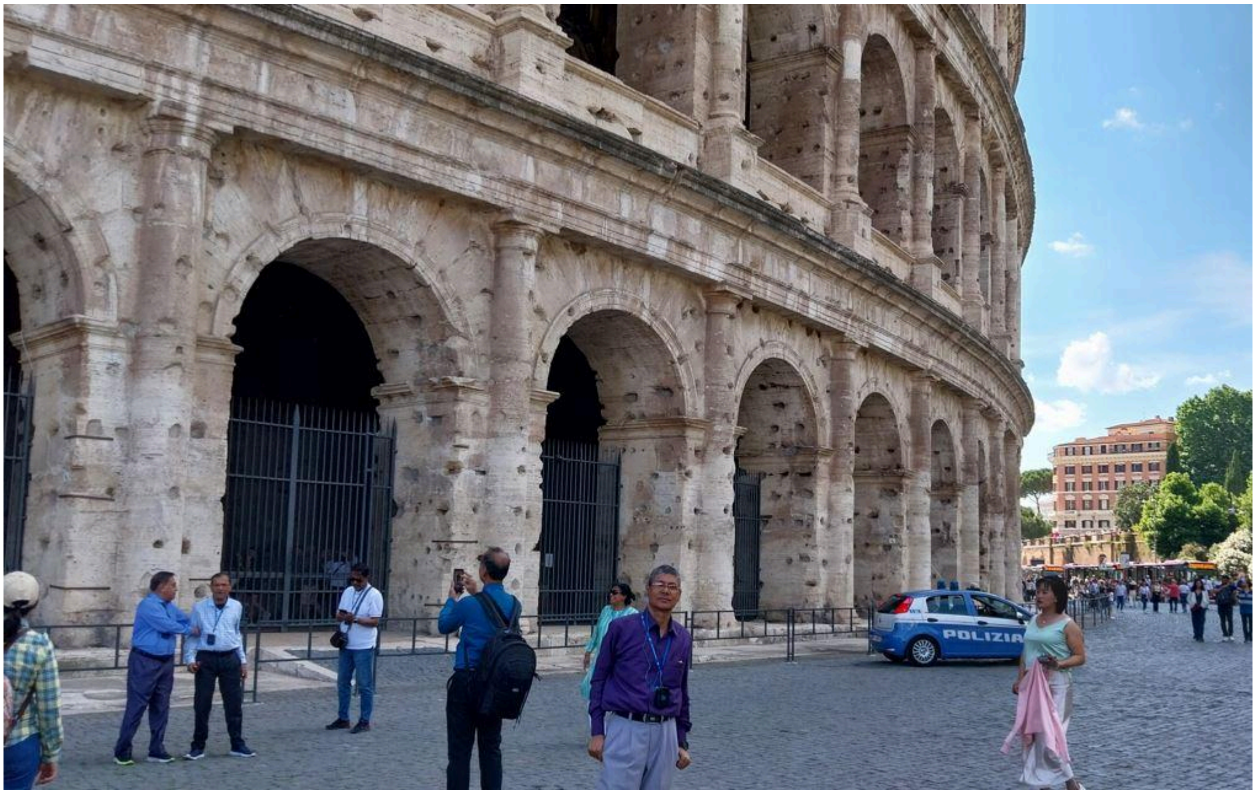

আমাদের সাদা বাস রোম শহরে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াল প্রায় এক ঘন্টা। আমরা আর একপ্রান্তে , বিখ্যাত " ট্রেভী ফাউন্টেন" দেখার জন্য একটি জায়গায় নেমে, এক দেড় কিমি হেঁটে গেলাম। রোম শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘোরার সময়, সেই মহিলা গাইড কিছু কিছু জিনিস আমাদের দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিচ্ছিল। শহরের রাস্তাঘাট চওড়া আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কয়েকটি মহল্লায় দেওয়ালে দেওয়ালে বেশ বিশ্রী ভাবেই কি সব আঁকি বুঁকি দিয়ে রেখেছে। গাইড বলল, এগুলি সবই আফ্রিকা থেকে আসা রিফিউজিদের কাজ। বেশ কয়েকটি জায়গায় দেখলাম, খুব পুরোনো পাঁচিল; কিন্তু তার পিছনে আধুনিক বাড়ী ঘর। অর্থাৎ ওরা শহরের উন্নতির জন্য প্রাচীন ইতিহাসের চিহ্ন মুছে ফেলতে চায়না। রোম শহরের মধ্যে ট্রামও চলতে দেখেছি। শহরের ফুটপাথে মাঝারি আকারের বেশ কিছু ঝাঁকড়া গাছ দেখেছি, কি গাছ , বাসের জানালা দিয়ে দেখে চিনতে পারিনি।এক জায়গায় দেখি পরপর কুড়িটা মত গাছে, মাল্টা কমলা লেবু পেকে আছে।

পুরনো পাঁচিলের ভেতরে নতুন শহর

ট্রেভী ফাউন্টেন দেখার জন্য আমরা অনেকটা রাস্তা, একটু চওড়া গলির মত রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলাম। একটি বিরাট বড় চৌবাচ্চার একদিকের দেওয়াল দোতলা বাড়ীর মত উঁচু। ঐ দিকে বেশ কিছু মূর্তি সাজানো হয়েছে। ঐ দিক থেকে কৃত্রিম ঝরনা নেমে এসেছে। বড় জলাশয় বা চৌবাচ্চার বাকী তিনদিক ঘিরে রাস্তা। বেশ চওড়া রাস্তা হলেও গাড়ী চলার কোন সুযোগ নেই। কয়েক হাজার পর্যটক হাজির হয়েছে। সকলেই ঝর্নার ছবি বা ঝর্ণার সাথে সেল্ফি তোলার জন্য একটু জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই ভিড়েও চোর পকেটমার অনেক আছে, জানলাম। দুই একটা জায়গা থেকে চৌবাচ্চার জলের দিকে নামার সিঁড়ি আছে। কয়েশ লোক জলের কাছেই নেমে গেছে। এই জলেও পয়সা ছোঁড়ার কুসংস্কার আছে, জানলাম। আমাদের দলের সকলে যেখানে ফিরে দাঁড়ানোর কথা, সেখানে ফিরে কয়েকজনকে দেখলাম। শুনলাম আমার কন্যা, দুই তিনটি দোকানের পরে একটা দোকানে ঢুকেছে। ওর খোঁজে গিয়ে দেখি, আইসক্রিম কিনছে।

ইটালির এক বিখ্যাত আইসক্রিম, জিলাটিনো। বেশ দাম দিয়ে কিনেছে। আমরা পাঁচজনই একটু করে খেয়ে দেখলাম। বিশেষ পার্থক্য আমি বুঝলাম না। সম্ভবত ক্যালোরি কম থাকে।

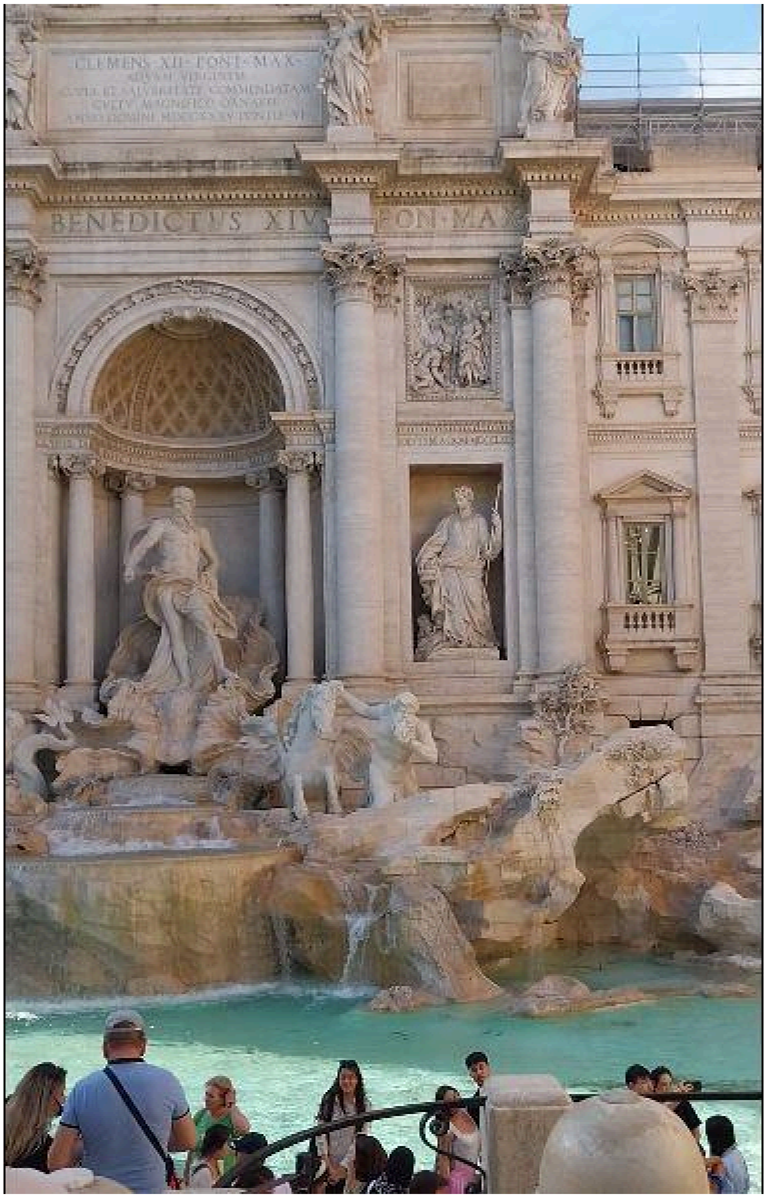

ট্রেভী ফাউন্টেন

ট্রেভী ফাউন্টেন দেখার পর আমরা হেঁটে চললাম আর এক দর্শনীয় স্থান দেখতে। স্প্যানিশ স্টেপস। এটাও রোমের একটা বেশ বিখ্যাত জায়গা। সেই সময় এটার কি ইতিহাস, বা কি মাহাত্ম বলার মত কেউ ছিল না। পরে জেনেছি ওটা তিনশ বছর আগে তৈরী এক স্থাপত্য। একটি ফোয়ারা ঘিরে শহরের রাস্তা। এক পাশের বাড়ি গুলির মাঝে একটা বেশ চওড়া সোপান শ্রেণী উঠে গেছে। পরে জেনেছি, একশ আটত্রিশটি সিঁড়ি। আমার যেন মনে হচ্ছিল এইরকম সিঁড়ি আমাদের কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে আছে। মেডিক্যাল কলেজের ঐতিহ্যবাহী মূল বাড়ীর

সিঁড়ি যেন আরও বেশী চওড়া। সিঁড়ির সংখ্যা চল্লিশের বেশী হবে না। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের বাড়ীর মোটা মোটা থামগুলি জায়গাটিকে অনেক বেশি সুন্দর করেছে। আমরা একটু সময় বেশী থাকলে হয়তো কয়েকজন কিছুটা সিঁড়িতে উঠে ছবি তোলার চেষ্টা করতাম। ঠিক সেই সময়, সম্ভবত পবনের মোবাইলে একটি ফোন এসে সব গণ্ডগোল করে দেয়।

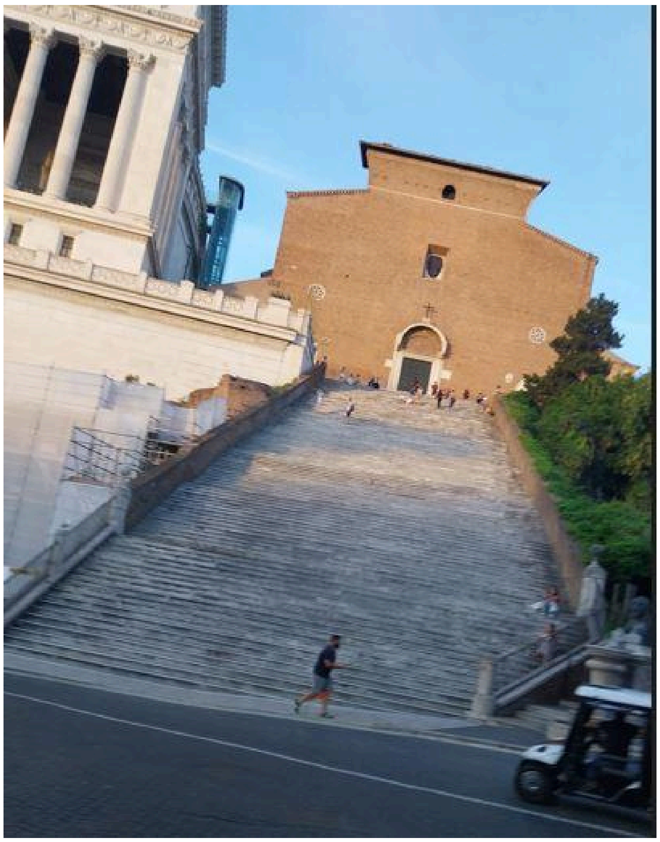
স্প্যানিশ স্টেপস

আমাদের দলের জন তিনেক মহিলা বাসেই বসে ছিলেন। যাতায়াতে তিন চার কিমি হাঁটতে হবে বলে ওনারা বাসেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাস কোম্পানী এই শেষ সময় একটা বাজে কাজ করে, আমাদের চাপে ফেলে দেয়। বোধহয় ওদের একটা বাস খারাপ হয়ে যাওয়ায়, অন্য একটি দলকে আমাদের সাদা বাস দিয়ে, আমাদের জন্য অন্য বাস পাঠায়। আমাদের সাদা বাসের প্রথম ড্রাইভার, যার সাথে আমাদের একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সে সকালেই আর আসেনি। নতুন দুই ড্রাইভার কোম্পানির নির্দেশে, তড়িঘড়ি করে আমাদের বড় ট্রলি ব্যাগ ইত্যাদী নতুন বাসের পেটে চালান করে দেয়। তারপর আমাদের যে ছোট ব্যাগগুলি বাসের ব্যাংকে ছিল, সেগুলি নামিয়ে নিতে বলে। আমাদের দলের যে কজন মহিলা বাসে বসে ছিলেন, তাঁরা রাজী হননি। ওদিকে নতুন দলের লোকেরা বাসে উঠে পড়তে

চায়। বিপদ বুঝে আমাদের দলের কেউ একজন ম্যানেজার পবনকে মোবাইলে ফোন করে জানায়। আমরা তখন দেড় -দুই কিমি দূরে। তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে ফিরতে হল। আমরা ফিরেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিজের নিজের ছোট ব্যগগুলি বাস থেকে নিয়ে, নতুন বাসে উঠে বসলাম। কয়েকজন এই অশান্তির জন্য বেশ উত্তেজিত হয়ে যায়। কেউ কেউ গো কোম্পানির কর্তাদের ফোন করতে থাকেন। ওখানে ঠিক সন্ধ্যা হলেও, কলকাতায় তো তখন রাত প্রায় এগারোটা। কেউ ফোন ধরেনি। পবন বেচারা এগারোদিন এত সুন্দর করে আমাদের ঘুরিয়ে, শেষ দিনে খুবই বিব্রত হয়ে গেল। ওর হাতে কিছুই ছিল না। বাস পাল্টানোর খবরটা ওকে অন্তত একবার জানানো উচিত ছিল। যাইহোক, আমরা একটু মন খারাপ নিয়ে, শেষ রাতটি থাকার হোটেলে গিয়ে উঠলাম। তার আগে অবশ্য রোম রেল স্টেশন-এর উল্টোদিকে একটি ছোট রেস্টুরেন্টে আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। ওখানের একটি জিনিস উল্লেখ করা দরকার। আমরা খাওয়ার পর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। মিনিট পাঁচেক এর মধ্যে বাস এলো না। একজন কর্মচারী বেরিয়ে এসে আমাদের আবার ভেতরে ঢুকে বসতে বলল। সম্ভবত ওদেশে ঐ ভাবে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে জটলা করা নিষিদ্ধ। সম্ভবত একই কারণে, একেবারে প্রথম দিন রাত্রে, লণ্ডনের একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে আমরা বাইরে জটলা করায়, রেষ্টুরেন্ট মালিক বেরিয়ে এসে, আমাদের রাস্তা থেকে উঠে দাঁড়াতে বলেছিলেন।

শেষ রাতের হোটেল রোমের শহরতলীতে, রোম বিমান বন্দরের কাছে। বেশ ছড়ানো ছিটানো জায়গা নিয়ে হোটেল। আমাদের বাস প্রথমে যে বাড়ীর সামনে দাঁড়াল, পবন নেমে জেনে এসে বলল, ওটাতে নয়, আমাদের রাতের আশ্রয় অন্য বাড়ীতে। বাস প্রায় দশ মিনিট পর আমাদের নির্দিষ্ট হোটেলে পৌঁছে দিল।

শেষ হোটেলের পিছনে, পুলের পাড়ে

পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে আমাদের ফেরার প্লেন ধরতে, রোম বিমান বন্দরে যেতে হবে; তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। ভোর থেকে বাইরে প্রচুর পাখির কিচির মিচির শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রায় সূর্য ওঠার আগে আমরা রুম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। লম্বা বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসার সময় পাশের গাছগুলি থেকে অসংখ্য পাখীর কলতান শুনতে পেলাম। রিসেপশনে আমার ট্রলি রেখেই, তাড়াতাড়ি ফিরে গেলাম, সুইমিং পুলের পাশের গাছে গাছে উড়ে বেড়ানো পাখীদের ডাক, মোবাইলে রেকর্ড করতে। রিসেপশনে ইতস্তত ঘোরার সময় একটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ল। আগে যে গোটা দশেক হোটেলে থেকেছি, কোথাও খেয়াল করিনি। আমরা যারা ডাক্তার, বা রেডক্রস, সেন্টজন্স এর মত সংস্থায় কাজ করা লোকেরা এতদিন বইতে পড়েছি এর কথা। হঠাৎ কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে, হার্ট স্তব্ধ হয়ে গেলে,' সি পি আর' নামের পদ্ধতিতে বুকে চাপ দিয়ে আবার হার্ট চালু করা যায়। তার সাথে এক রকম ইলেকট্রিক শক দিয়ে হার্টের কিছু গণ্ডগোল ঠিক করা যায়। সেই মেশিন হোটেল, বড় বড় শপিং মল, বিমান বন্দরে, সিনেমা হলে রাখার কথা আমরা পড়েছি। এই ইউরোপ ভ্রমণ করে ফিরে আসার ঠিক আগে সেই জিনিস দেখে নিলাম। আমাদের দলের ডা ভট্টাচার্য ওটা নিয়ে একটু বুঝিয়েও দিলেন। শান্ত সকালের স্নিগ্ধ আলোর মধ্যে আমরা হোটেল ছেড়ে রওনা দিলাম।

রোম বিমান বন্দরে যথা সময়ে পৌঁছে, দেশে ফেরার নিয়ম মত পাসপোর্টে ছাপ দিয়ে বিমানে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এই সময় আমাদের দলের ছোট কাকু তাঁর বোর্ডিং পাস হারিয়ে

ফেলেন। শেষ পর্যন্ত পবনের প্রবল উৎকন্ঠা বাড়িয়ে, নতুন করে বোর্ডিং পাস তৈরী করে, আমরা কাতার এয়ারওয়েজ এর প্লেনে চড়ে বসলাম। যাওয়া আসা দুই বারই আমাদের এই কাতার এয়ারওয়েজ। দোহার অতি সুন্দর বিমান বন্দরে ঘন্টা দুই অপেক্ষা করে, একই কোম্পানির অন্য বিমানে চড়ে আসতে হল। প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রা আমার কাছে বেশ উপভোগ্য হল। যদিও আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা চোট থাকায়, একটু অস্বস্তি ছিল। কিন্তু প্রায় ছয় ছয় বারো ঘন্টার বিমান যাত্রা, এটা ওটা খেয়ে, কখনও কানে হেড ফোন ব্যাবহার করে গান শুনে, কেউ কেউ, বিমানের আসনের সাথে লাগানো ছোট্ট টিভিতে সিনেমা দেখে বেশ কাটিয়ে দিলাম। কলকাতা বিমান বন্দরে নামলাম রাত দুটোর পর। অভিবাসন ইত্যাদী কাজ সেরে একেবারে ট্যাক্সিতে উঠে বসতে এক ঘন্টা মত লাগল। মে মাসের একত্রিশ তারিখ, ভোর রাত্রে আমরা বাড়ী ফিরে এলাম।

দোহা বিমান বন্দরের ভেতরে (৩০ শে মে, ২০২৫ বিকেলে)

আজ ২৮ শে জুলাই। বাড়ী ফিরে প্রায় দুই মাস লাগল, আমার প্রথম বিদেশ ভ্রমণ এর গল্প লিখে শেষ করতে। এই ২৯ পর্বের ভ্রমণ কাহিনী, ছবি যোগ করে, একটা ই-বুক করতে আরও দিন দশেক তো লাগবেই। আজই বই প্রকাশ-এর মনোজ দাদা জানালেন, আমার অন্য বিচিত্র

বিষয় নিয়ে লেখা তিনশ পাতার একটি বাংলা বই সাজিয়ে রাখার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। একদিন ওনার ওখানে গিয়ে দেখে আসতে বললেন। পাঁচই সেপ্টেম্বর হিমাচল প্রদেশে দুই সপ্তাহের জন্য বেড়াতে যাব। ট্রেনের টিকিট হয়ে গেছে। তার আগে মনোজ দাদা বইটি ছেপে দেবেন আশা করছি। প্রথম দিকে অনেক বেশি মন্তব্য পেতাম। সম্ভবত বেশ সময় লেগে গেল, এই ঊনত্রিশ পর্ব লিখতে; তাই আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাও ধৈর্য্য ধরে রাখতে পারছেন না। পড়ে মন্তব্য করুন। শুধু এইটুকু তো আশা করি।